পঙ্কজকুমার মল্লিক

আমার যুগ আমার গান

: অনুলিখন :

অরুণাভ সেনগুপ্ত

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১২

আমার ছোট্ট দাদুভাই
শ্রীমান্ রাজীবকে—

'...আপনারে দীপ করি জ্বালো,
দুর্গম সংসারপথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো,
সত্যলক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন করি দূর,
জীবনের বীণাতন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর—
দুঃখেরে স্বীকার করি, অনিত্যের যত আবর্জন।
পূজার প্রাঙ্গণ হতে নিরালস্যে করিবে মার্জনা
প্রতিক্ষণে সাবধানে, এই মন্ত্র বাজুক নিয়ত
চিন্তায় বচনে কর্মে তব—উত্তিষ্ঠত নিবোধত।'

১

কবিগুরু তাঁর একটি অনুপম গীতিকবিতায় বলেছেন—

তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে,
যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।

আমার সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সঙ্গীতসাধনায় এই কথাটি বার বার অনুভব করেছি যে নব নব সংগীতের কিছু কুসুম হয়তো আমি ফোটাতে পেরেছি আমার কণ্ঠে, কিন্তু কণ্ঠে আমি যা পেরেছি লেখনীতে তা তো পারব না সহজে। এ-কাজও যে পারে সে আপনি পারে।

তবু অনুরোধ আসে নানা জনের কাছ থেকে—আমার স্মৃতির চিত্রশালা থেকে যেন পুরানো ছবিগুলিকে ঝেড়েমুছে ছাপার অক্ষরে মেলে ধরি।

কিন্তু বড়ো কঠিন এই অনুরোধ। আমার লেখনী অপটু বলেই শুধু কঠিন নয়। আমার জীবনে একটা বীজ-মন্ত্র ছিল। সে-বীজ উপ্ত হয়েছিল যাঁরা আমার শিক্ষাগুরু তাঁদের হাতেই। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার পিতৃদেব ৺মণিমোহন মল্লিক, আমার পরমারাধ্যা জননী ৺মনোমোহিনী মল্লিক এবং আমার যাঁরা সংগীতগুরু ছিলেন, তাঁরা। সর্বোপরি ছিলেন আমার জীবনের ধ্রুবতারা, যিনি গেয়েছিলেন—আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে / সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে—সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই আপনা থেকেই প্রতিজ্ঞা গড়ে উঠেছিল মনে, নিজের কথা ঘটা করে যেন কখনো না প্রচার করি। আমার পরিচয়টুকু কেবল রণিত হয়ে থাক আমার কণ্ঠে। 'পঙ্কজ মল্লিক' এই নাম-রূপটুকুর মধ্যেই আমার সারাজীবনের খ্যাতি-অখ্যাতি, মন্দ-ভালো, মান-অপমান সব সীমাবদ্ধ হয়ে থাক। লোকে শুধু জানুক, এই একজন অনাড়ম্বর মানুষ জীবনের সুদীর্ঘ প্রায় ষাট বৎসর ধরে সঙ্গীতের সেবা করেছে, "নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি"র চরণাশ্রিত হবার বাসনায়

মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ কবির সংগীত-রস-ধারাকে তৃষিত মানুষের পাত্রে পরিবেশন করার প্রয়াস পেয়েছে। তার কোনো তত্ত্বকথা ছিল না, বৈদগ্ধ্যের আড়ম্বর ছিল না, সে প্রধানত একটি ব্রতই পালন করেছে—তা হচ্ছে, সংগীত-পরিশীলনের সর্বোত্তম উদাহরণ যে রবীন্দ্রসংগীত, তারই অনবরুদ্ধ প্রচার।

এর বেশি মোহ আমার কোনদিন ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সংগীত-সাগর-সৈকতে সদ্যকৈশোরোত্তীর্ণ আমি একদিন যাঁর বলিষ্ঠ হাত ধরে এসে দাঁড়াতে সাহস করেছিলাম, সেই পরমপূজ্যপাদ শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও তো এই শিক্ষাই পেয়েছিলাম। কবিগুরুর সকল গানের ভাণ্ডারী ও সকল সুরের কাণ্ডারীর জীবনচর্যাতেও তো এই শিক্ষাই ছিল যে আসক্তিহীনতাই শিল্পী-জীবনের পরম বৈভব।

বন্ধুরা তবু বলেন—নিরাসক্ত হয়েও তো স্মৃতিগুলিকে লিপিবদ্ধ করা যায়। উত্তরকালের সাংস্কৃতিক এষণা তো সেসব কথা জানার অধিকার রাখে!

অতএব অনিচ্ছুক আমিও আজ বসেছি কাগজকলম নিয়ে। বাগ্‌দেবীর পরম করুণায় মুনিবরের শোক শ্লোকে পরিণত হয়েছিল। যা ছিল একের, তা হয়েছিল সর্বজনের, সর্বযুগের। সেই আশিসধারার কণামাত্রও কি তিনি আমার লেখনীতে সিঞ্চন করবেন? আমার রচনা কি আমার অহং ও মোহাবেশকে অতিক্রম করে সকলের সমাদরের বস্তু হয়ে উঠবে? হবে কি তা সহৃদয়ের হৃদয়-সংবাদী?

* * *

বিশ্বকবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি' তে লিখেছেন—"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না, কিন্তু যে-ই আঁকুক সে ছবিই আঁকে।...বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।"

কবির এই উক্তি শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, আমাদের ক্ষুদ্র জীবনেও তা বড়ো বেশি সত্য। আজ আমার তিয়াত্তর বছরের সুদীর্ঘ জীবনে যখন পিছন ফিরে তাকাই, তখন দেখি কতো অকিঞ্চিৎকর অতি পুরাতন স্মৃতিকে নিজের অজ্ঞাতেই কতো যত্নে লালন করেছি, আবার কতো বড়ো বড়ো ব্যাপার জড়িয়ে আছে এমন অনেক ঘটনা স্মৃতির পটে নিঃশব্দে ধূলি-মলিন হয়ে গেছে। কেন হয় তার উত্তর আমার জানা নেই।

আমার ক্ষুদ্র স্মৃতি-কথার ভূমিকা রচনা করতে গিয়ে সেই বিশ্ব-বন্দিত মহামানবের স্মৃতি-কথার উল্লেখকে যদি কেউ ধৃষ্টতা মনে করেন তো বলি, দুর্গা-নাম স্মরণ করেই তো আমরা পত্র-রচনা আরম্ভ করি। 'রাম'-নাম স্মরণ করেই তো দস্যু-কবি রামায়ণ রচনা করতে পেরেছিলেন, তা সে রাম-নাম তিনি যে ভাবেই উচ্চারণ করুন না কেন।

কবি গেয়েছিলেন —সখি, ওই বুঝি বাঁশি বাজে/বনমাঝে কি মনোমাঝে।

বাঁশি বনেও বাজে, আবার মনেও বাজে। এই দুই বেজে-ওঠা যখন এক পর্দায় বাঁধা পড়ে যায়, তখনি হয় অভিসারের সূচনা। অনির্দেশ্য এক বাঁশির ডাকেই বোধকরি সব শিল্পীরই জীবনে অভিসারযাত্রার সূচনা হয় আপন আপন সাধনার পথে। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে একটি বালক বুঝি এমনি এক বাঁশির ডাক শুনেছিল। জীবনভোর গানে-গানেই বিভোর হয়ে যাবার একটি সংগোপন বাসনা তাকে ব্যাকুল করে দিয়েছিল।

কিন্তু তখনকার দিনগুলিতে এ-ধরণের ইচ্ছাকে মোটেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখা হতো না। সেই বালকের জীবনের প্রারম্ভিক ইচ্ছাগুলি তাই বার বার অবরুদ্ধ হয়েছিল। বাল্যের সে-স্মৃতি বড়ই বেদনাবহ।

আজকের সংগীত-শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের সে-অবরোধের মুখে পড়তে হয় না। তাই সে-যুগের কিশোর-চিত্তের বিড়ম্বনাকে আজ তারা কিছুতেই অনুভব করতে পারবে না। তবু গানের টান যে কী করে আমায় অমন টেনেছিল, সে-রহস্য আজও আমার অজ্ঞাত। কে আমায় কণ্ঠ দিয়েছিল, কেন দিয়েছিল, আর সেই কণ্ঠই বা কেন আমায় সারাজীবন ধরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালো, তা তো জানি না। শুধু জানি, সংগীতই আমায় বিদ্যা দিয়েছে, ভাষা দিয়েছে, রুচি দিয়েছে। ষাট বছর ধরে আমার শিরায় শিরায় বাসা বেঁধেছে সে, আমার রক্তধারাকে দুর্মর টানে টেনে এনেছে সেই পরম চরিতার্থতার কাছাকাছি যা সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি সব কিছুকেই সদানন্দময় করে তোলে।

* * *

"আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।

কত যে গিরি, কত যে নদী-তীরে
বেড়ালে বহি ছোট এ-বাঁশিটিরে…"

এই ছোট বাঁশিটির সংজ্ঞা কে দিতে পারবেন জানি না। শুধু জানি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বদেবতার কাছে নিজেকে ছোট বাঁশি বলে আত্মনিবেদন করেছেন মহৎ-জনোচিত বিনয়ে। কিন্তু আমার মতো মানুষ যদি ওই শব্দ দুটি নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি তা মোটেই বিনয় হবে না। মহাকবির এই অনুভূতির ব্যাপ্তি ও গভীরতা আমাদের পরিমাপের অতীত, কিন্তু আমাদের এই অপরিসর, অনতিব্যাপ্ত জীবনে এই বিস্ময়াপন্ন প্রশ্ন অবান্তর নয়—কে তুমি, এত "দীর্ঘ বরষ মাস"-ব্যাপী এই দেহমনের বেণুটিকে এত যত্নসহকারে বহন করে বেড়ালে?

জন্মান্তরের কোন রহস্য এর মধ্যে গুপ্ত ছিল? পারিবারিক জীবনে সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের অনস্তিত্ব সত্ত্বেও কেমন করে সঙ্গীতকেই জীবন-সর্বস্ব হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম? গানের ভিতর দিয়ে ভুবনখানিকে দেখার এই সাধনা যে মূলত সঙ্গীত-সুধা-পারাবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে, এটাই বা কেমন করে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল!

আমার নিকটতম দেবতা, আমার আত্মার পরমাত্মীয়, সভয়ে যাঁর সান্নিধ্যে একদিন পৌঁছে গিছলাম শ্রদ্ধাভাজন, অগ্রজপ্রতিম, মনস্বী, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে, সেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বুঝি ছিল আমার জন্মান্তরের সম্পর্ক। তাঁর সঙ্গে আমার এই সম্পর্ককে যেদিন প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম, সে-দিনের কথা মনে পড়লে আজও রোমাঞ্চিত হই।

২

আগেই বলেছি, আমাদের পরিবারে সংগীতচর্চার কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না। কিন্তু আমার পিতৃদেব-আয়োজিত পূজাপার্বণের অনুষ্ঠানগুলি এক হিসাবে সংগীতচর্চার পক্ষে অনুকূল ছিল। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। তাঁর আয়োজিত এই সব অনুষ্ঠানে নামী গায়কদের আমন্ত্রণ করে আমাদের গৃহে গানের আসর বসতো। এমনই এক সংগীত অনুষ্ঠানে আমার পিসতুতো দাদা এনেছিলেন এক সংগীতজ্ঞকে, নাম তাঁর দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ সংগীতগুরু বিশ্বনাথ রাও মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন তিনি। পুরোদস্তুর সংগীতশিক্ষা করার সুযোগ তো তখনকার ছেলেমেয়েদের ছিল না, তাই আমাকে তখন লুকিয়ে-চুরিয়ে গান গাইতে হতো। আমার অবস্থা দেখে বিধাতা বোধ-হয় একটু ঘুর-পথে গানকে আমাদের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন কৃপাপরবশ হয়ে।

বাড়িতে রথযাত্রা উপলক্ষে অষ্টাহব্যাপী উৎসব চলতো। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বাড়িতে বসতো নানাধরণের গানের আসর—কীর্তন, শ্যামাসংগীত, রামপ্রসাদী, নিধুবাবুর টপ্পা প্রভৃতি। এমনই এক অনুষ্ঠানে দুর্গাদাসবাবু এসেছিলেন এবং সেই সন্ধ্যায় গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। কেমন করে তখন রটে গিয়েছিল যে আমি একটু-আধটু গান গাই। সুতরাং সেই আসরেই সকলের ইচ্ছায় আমাকেও গান গেয়ে শোনাতে হলো। গান শুনে দুর্গাদাসবাবু আমার অশিক্ষিতপটু কণ্ঠের খুব তারিফ করতে লাগলেন এবং অবশেষে আমার পিসতুতো দাদার ও বাবার কাছে প্রস্তাব রাখলেন যে তিনি আমাকে নিয়মিত সংগীত শিক্ষাদান করতে চান। তাঁর নিজস্ব একটি সংগীত বিদ্যালয় ছিল, "ক্ষেত্রমোহন সংগীত বিদ্যালয়"—তাঁর পিতৃদেবের নামাঙ্কিত। তিনি বলেছিলেন যে আমার নাকি একটা সহজাত সংগীতপ্রতিভা আছে, সেটার বিকাশ ঘটানো উচিত।

শেষ পর্যন্ত আমার বাবা রাজি না হয়ে পারেননি।

দুর্গাদাসবাবুর কাছে শিখতে আরম্ভ করলাম টপ্পা—বাংলা দেশে যার প্রধান পরিচয় 'নিধুবাবুর টপ্পা' নামে। এ গানের স্রষ্টা ছিলেন সেকালের স্বনামধন্য কবি, সুরকার ও গায়ক রামনিধি গুপ্ত মহাশয়। উত্তর ভারতে এই টপ্পা শ্রেণীর যে গান বহুল প্রচলিত ও বহুজনপ্রিয় ছিল তার নাম 'শোরি মিঞার টপ্পা'। দুর্গাদাসবাবু ছিলেন এই ধরণের সংগীতে পারংগম ব্যক্তি। কিন্তু সমসাময়িক কাব্যসংগীতে তাঁর অধিকার ছিল খুবই সামান্য। এই সমসাময়িক কাব্যসংগীতেরই অন্তর্গত ছিল 'রবিবাবুর গান'। কিন্তু এই ধরণের গান শেখাবার মতো প্রস্তুতি তাঁর ছিল না। তথাপি আমি বলব, আমার জীবনে সংগীতের ভিত্তিভূমি তিনিই রচনা করে দেন। আজ আমার জীবন-সায়াহ্নে তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে যে অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আমার হৃদয়ে উদ্বেল হয়ে উঠছে তা যেন তাঁর বিদেহী আত্মার চরণস্পর্শ করে।

* * *

১৯২২ সালের কথা। আমি তখন কলেজের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথ সে-কালে ছিলেন 'রবিবাবু'। এই 'রবিবাবুর গান' যে কি বস্তু তখনো ভালো করে জানি না। শুধু শুনেছিলাম যে ভাবে, ভাষায় ও সুরে সে নাকি অতি সুন্দর গান। মন কেবল উৎসুক হয়ে ঘুরে বেড়াতো—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান শিখতে হবে।

এই সময়ে এক নিদাঘ দ্বিপ্রহরে আমার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেল।

আগেই বলেছি, গান শেখার রীতি-মাফিক হাতে-খড়ি আমার হয়েছিল দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিমও কিছু নিয়েছিলাম তাঁর কাছে।

তাঁর বৈঠকখানা ঘরটিতে ছিল একটি তক্তপোষ, এক পাশে একটি তানপুরা, একটি হারমোনিয়াম, একটি তবলা ও তার বাঁয়া। তাঁর ক্ষেত্রমোহন সংগীত বিদ্যালয়ের অপরাপর ছাত্রদের কীভাবে শেখাতেন জানি না, কিন্তু যে-পরিশ্রম করে তিনি আমায় শেখাতেন তা আজকের দিনে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি অবশ্য ছিল সাবেকি, এ-যুগে অচল।

দুর্গাদা এক একটি লাইন ধরে ধরে তুলিয়ে দিতেন। নিয়মিত রেওয়াজের জন্য টাস্ক্‌ও দিতেন।

তাঁর বাসস্থান ছিল বৌবাজার অঞ্চলে মদন বড়াল লেনে। কাছেই ফকির দে লেনে ছিল সেকালের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা—"আনন্দ পরিষদ্"। শৌখিন নাট্যসংস্থা হিসাবে এই আনন্দ পরিষদের খুব নামডাক ছিল। তখনকার দিনে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যাঁরা অভিনয় করতেন সমাজ তাঁদের বিশেষ সুনজরে দেখত না। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখর প্রমুখের মতো উচ্চশিক্ষিত প্রতিভাধরদের প্রবেশও রঙ্গমঞ্চের প্রকৃত মর্যাদা সমাজের কাছ থেকে বোধকরি পুরোপুরি আদায় করে দিতে পারে নি। সাধারণ রঙ্গালয়ে স্ত্রীভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁরা আবার সকলেই আসতেন কলকাতার নিষিদ্ধ পল্লীগুলি থেকে। সাধারণ রঙ্গালয়ের এই অবস্থার মধ্যেই শৌখিন নাট্যসংস্থাগুলি গড়ে উঠেছিল পাশাপাশি। যাত্রা-পালা-নাটক প্রভৃতি বাঙালির প্রাণের পিপাসা। অথচ নব্য শিক্ষিতরা অভিভাবক ও সমাজের তর্জনীর ভয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ে সচরাচর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন না। এর ফলে বহু প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন প্রতিভার যে অংকুরেই বিনাশ ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই।

বিকল্প হিসাবে বাঙালি তরুণেরা তাই গড়ে তুলেছিলেন শৌখিন নাট্যসংস্থা বা ক্লাব, লোকমুখে যার প্রচলিত নাম ছিল 'সখের থিয়েটার'। নাট্যপিপাসা চরিতার্থ হতো, অথচ সাধারণ রঙ্গালয়ের "কলঙ্ক" গায়ে লাগত না। সাধারণত মঞ্চসফল নাটকগুলিই এঁরা করতেন কিন্তু স্ত্রীভূমিকার জন্য পল্লীবিশেষ থেকে নটী ভাড়া করে আনতেন না। মেয়েলি চেহারার পুরুষরাই স্ত্রীচরিত্রের মেক-আপ নিয়ে নেমে পড়তেন।

আনন্দ পরিষদের কিন্তু একটু বিশেষত্ব ছিল। এঁরা প্রচলিত মঞ্চসফল নাটক-গুলি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। নতুন নাটক এঁরা লিখিয়ে নিতেন। শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ'কে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন এঁরা। উপরন্তু পল্লীসমাজ, চরিত্রহীন, পণ্ডিত-মশাই প্রভৃতিও তাঁরা মঞ্চস্থ করেছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সালটা ঠিক মনে করতে পারছি না, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' আনন্দ পরিষদ্ মঞ্চস্থ করেছিলেন এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে অভিনয় দেখে খুশি হয়েছিলেন।

কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিশেষ মর্যাদার স্থান ছিল এই সংস্থাটির। ব্রজেন্দ্র দত্ত নামক এক বিত্তবান্ ভদ্রলোকের গৃহে, এক তলার বড় হলঘরে ছিল পরিষদের কর্মস্থল। কর্মকর্তা ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র। আমরা তাঁকে লক্ষ্মীদা বলতাম।…

একদিন, এক রবিবারের মধ্যাহ্নে, যথারীতি গান শিখতে গিয়েছিলাম দুর্গাদাসবাবুর বাড়িতে। গিয়ে দেখি উনি বাড়ি নেই, বেরিয়েছেন। তক্তপোষে বসে একা একা অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ চোখে পড়লো একটি বই, রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'। প্রসংগত বলি, রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' তখনো প্রকাশিত হয়নি। তখনকার দিনে, এখনকার বয়স্করা স্মরণ করতে পারবেন, এই সঞ্চয়িতার পূর্বসূরী ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কলেবরের 'চয়নিকা'।

বইটি হাতে ধরে খুলতেই চোখে পড়লো একটি কবিতা—'চির আমি'। তখন কিন্তু আমি কবিতাটির সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। বস্তুত, সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে আমার কতটুকুই বা ধারণা!

সে যাই হোক, কবিতাটির প্রথম পংক্তিটি পড়েই কেমন মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কবিতাটি আমায় টেনে নিয়ে চললো যেন। যখন তাঁর পায়ের চিহ্ন আর এই পরিচিত পথে পড়বে না, তখনকার জন্য আজকের কবির কী বাসনা রইল সে-কথা কত গভীর কারুণ্য ও মমতার সঙ্গেই না বলেছেন কবি! আমি পড়তে পড়তে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে রইলাম। তার পরে সহসা কখন আপনমনে গুনগুন করে কবিতাটির বাণীতে সুর দিতে লেগে গেছি তা নিজেও জানি না। কবিতাটি সুর করে গাইতে গাইতে মন মেতে উঠলো। কাছেই একটা ছোট পার্ক ছিল, নাম গণেশ পার্ক। সেখানে চলে গেলাম। বসলাম গাছের ছায়ার নীচে এক বেঞ্চিতে। ভ্যাপসা গরমে শরীর তখন আনচান করছিল। কিন্তু সেই অবস্থাতেই কবিতাটির বাণী আমার মনে রণিত হয়ে চলেছে—"তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি/সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।"

এই গীতিকবিতাটির অপরূপ ভাব-ঐশ্বর্য, বেদনামাধুর্য এবং কবির আত্মোপলব্ধি ও চৈতন্যের কালাতীত পরিব্যাপ্তি—এই সব কিছু আজও আমাকে বিমোহিত করে দেয়। সেদিন এতটা উপলব্ধির ক্ষমতা আমার ছিল না, কিন্তু সেই বয়সের মতো করেই যা সেদিন বুঝেছিলাম, সেই বুঝে-নেওয়াটাই আমার পরবর্তী জীবনের রবীন্দ্রচেতনার প্রথম বীজটি বপন করে দিয়েছিল।

গানের গলা তখন আমার অল্পস্বল্প তৈরি হয়েছে। নিজে নিজে পছন্দসই কবিতায় সুরারোপ করার অকালপকতাও পেয়ে বসেছে। এই কবিতাটিতেও গুনগুন করে সুর দিতে লেগে গেলাম। শেষ কলিটিতে যখন পৌঁছলাম

তখন আমার আনন্দ রাখার জায়গা নেই। মনে খুব একটা অহঙ্কার এলো—আমি তাহলে রবিবাবুর কবিতাতেও সুর দিতে পারি! ব্যাস্, অমনি দৌড় লাগালাম আনন্দ পরিষদ্-এর গৃহ লক্ষ করে। ভাগ্যক্রমে ঘরটি খোলা ছিল। ঢুকেই কোণের অর্গ্যানটির সামনে ধপ্ করে বসে পড়লাম। নিজের লাগানো সুরটাকে অর্গ্যান-যন্ত্রে ধরার চেষ্টা করতে লেগে গেলাম।

সুর মিলতে লাগল, আমি আস্তে আস্তে গলা দিতে থাকলাম। রবীন্দ্র-নাথের বাণীতে সুর দিয়েছি নিজে, সেই সুর যন্ত্রে তুলে গলা মিলিয়ে গাইছি, ভাবতেও শিহরণ লাগছে, এমন সময় কে যেন পিছন থেকে বলে উঠল—উঁহু, উঁহু, একটু যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

চম্‌কে উঠে ফিরে দেখলাম আমাদের লক্ষ্মীদা—লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র। গান থামিয়ে বললাম—কী বলছেন লক্ষ্মীদা, আপনার কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না। এটা তো রবি ঠাকুরের কবিতা, আজই আমি নিজে নিজে সুর লাগিয়েছি···

—সে কী, এটা তো রবিবাবুর একটা গান, ওঁর নিজেরই সুর দেওয়া আছে। আরে, তুমি তো তা-ই গাইছ, মাঝে মাঝে সামান্য তফাৎ হচ্ছে।···

কী বলব, সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত চৈতন্য প্রথমে বিস্ময়ে ও পরক্ষণেই এক অপার্থিব পুলকে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমি যে ঠিক কী বলেছিলাম এরপর, তা আজ আর মনে নেই। হয়তো বলে উঠেছিলাম - বিশ্বাস করুন লক্ষ্মীদা, গানটা শোনা দূরের কথা, কবিতাটির বাণীই এই প্রথম আমার চোখে পড়লো। বিশ্বাস করুন, এটা আমার নিজের সুর, এই মাত্র নিজে নিজে লাগিয়েছি ··

কিন্তু একী! একী বিস্ময় এলো আমার জীবনে! আমি কেবল সুর দিতেই পারি না, কবির নিজের দেওয়া সুরের সংগে আমার সুর কিনা প্রায় মিলে যায়!

আজ উত্তর-সত্তর আমি আমার নিভৃত পাঠকক্ষে বসে এই স্মৃতি মাঝে মাঝে এখনও রোমন্থন করি আর ভাবি, তবে কি রবীন্দ্রনাথের গানের সংগে আমার পূর্বজন্মের সম্পর্ক ছিল!

এই বিস্মিত জিজ্ঞাসার উত্তর আজও পাইনি। শুধু জেনেছি, 'লোকের কথার বোঝা' সারাজীবন ধরে আমি যতোই বিনে থাকি না কেন, রবীন্দ্রনাথ

তাঁর পুণ্যময় স্পর্শে আমার সব ভার লাঘব করে দিয়েছেন।

সে-যুগে তো আজকালকার মতো রবীন্দ্র-আবহাওয়া ছিল না। ছিল না রবীন্দ্র চর্চার এত ব্যাপক ও বিপুল আয়োজন। আমার রুচি-গঠন তো তাই আবহাওয়ার আনুকূল্য কিছু পায় নি। বিপুল জনসমাজে তাঁর গান ক'জন গাইতো তখন? যদিও বা কেউ গাইতেন, তাও বিচ্ছিন্নভাবে, দুটি-একটি গানের পুঁজি নিয়ে, মেয়েলি ছাঁদে, মেয়েলি গলায়, ঘরে বসে পরিচিত মেয়েদের আসরে। আর বাছা বাছা কিছু গান গাওয়া হতো ব্রাহ্মসমাজে, সাধারণ বাঙালীকে তা স্পর্শ করতো না। ব্রাহ্মসমাজের বাইরে যে অগণিত সাধারণকে নিয়ে তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সেখানে সে-গানের রসগ্রাহী শ্রোতা সেকালে খুব বেশি ছিলেন না। বস্তুত, বাংলা কাব্যসঙ্গীতের যে-ধারায় বৃহত্তর বাঙালি-সমাজ মজে ছিল, সে-ধারাই ছিল অন্যরকম। এ-যুগের মতো রবীন্দ্র-সৃষ্ট পরিশীলিত কাব্যরুচিকে সাহিত্যরসাস্বাদনের পূর্বশর্ত হিসাবে তখনকার শিক্ষিত সমাজ গ্রহণ করতে পারেনি। বিশ্বকবির অনুপম রুচি-স্নিগ্ধ সুরবিহার তখন বাঙালির কানে পৌঁছালেও মরমে সবটা বোধকরি পৌঁছাতে পারে নি।

সে যাই হোক, আমার জীবনে উক্ত ঘটনাটি ঘটার ফলে এক অপ্রতিরোধ্য বাসনা আমাকে মত্ত করে তুললো। তা হচ্ছে রবিবাবুর গান শেখার বাসনা। আমাকে সেই গান শিখতেই হবে যা শব্দের কারুকর্মে, সুর ও ভাবের সুষমায়, রাগ ও অনুরাগের মেল-বন্ধনে অনিন্দ্যকান্তি, যার তুলনা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-চিত্রকলা-ভাস্কর্য কোনো কিছুতেই নেই। কিন্তু সেদিন কি কবির গান সম্বন্ধে এত সুন্দর করে গুছিয়ে ভাবতে পেরেছিলাম? তা নয়, তবে অনুভূতিটা এমনতরই ছিল, তা বলতে পারি।

"পূর্ণিমাতে সাগর হতে ছুটে এলো বান / আমার লাগলো প্রাণে টান।" সেদিন এইভাবেই বান এসে অকস্মাৎ আমায় ভাসিয়ে দিয়েছিল, আমার মর্মমূলে এসে টান দিয়েছিল। আমার এ-টান ছিল নিছকই ভাবলোকের ব্যাপার। "আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে/তুমি জান না, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে।" এই কথাটাই বড় কথা। কিন্তু, তথাপি বলি, বস্তুলোকেও তো কবির সঙ্গে যোগাযোগ কিছু ঘটেছিল। আমার অগ্রজপ্রতিম, শ্রদ্ধাস্পদ মনস্বী ও কর্মী কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এবং আমার পরমপূজ্যপাদ সঙ্গীতগুরু দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমি প্রতিদিনই

শত শত প্রণাম জানাই। প্রথম জন আমাকে স্বয়ং কবির চরণোপান্তে গিয়ে বসবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, আর দ্বিতীয় জন আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর 'গানের ঝরনাতলায়', তাঁর "সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে"।

* *

দিনেন্দ্রনাথের কথা সারাজীবন ধরে শতমুখে বলে বেড়ালেও বলা আমার ফুরোবে না। তাঁর উৎসাহ, শাসন, স্নেহ, তিরস্কার এবং নিপুণ শিক্ষাদান-পদ্ধতি যে আমাকে কীভাবে পুষ্টি জুগিয়েছে তা আমি আমার অক্ষম ভাষায় "কেমন করিয়া জানাব"। কেমন করে প্রকাশ করব আমার সেই দিনের অনুভূতিকে যে-দিন প্রথম তাঁর কাছে আয়ত্ত করলাম আমার জীবনের প্রথম রবীন্দ্র-সঙ্গীত—"হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে!" পঞ্চাশ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতরসসুধা গ্রহণ ও বিতরণ করে আমার কেমন যেন মনে হয় ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে লোকলোচনের অন্তরালে এক নিভৃত সাযুজ্য রচিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বুঝি আমার তাই ঘটে গেছে। কী ভাগ্য আমার, এর জন্য অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে আমায় ছাড়পত্র নিতে হয়নি!

কবির সঙ্গে এই সম্বন্ধসূত্রের জোরেই বেঁচে আছি। তরুণ বন্ধুদের কাছে রসিকতা করে বলি—কবির চাইতে আমি মাত্র দুদিনের ছোট, জন্ম আমার সাতাশে বৈশাখে। সালের নয়, মাস ও দিবসের এই নৈকট্য থেকেও কবির সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের এক বাল-সুলভ পরিতৃপ্তি এখনও, এই বয়সেও আমি পেয়ে থাকি, একথাটাও চুপি চুপি বলে ফেলি।

হ্যাঁ, সাতাশে বৈশাখ, ১৩১২ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১০ই মে, ১৯০৫) আমার জন্ম হয়েছিল কলকাতাতেই। উত্তর কলকাতার মানিকতলার কাছে চালতা-বাগান অঞ্চলে ছিল আমাদের ভাড়া-বাড়ি। পিতৃদেব তখনকার দিনের সুপরিচিত বিলাতি কোম্পানি বার্কমায়ার ব্রাদার্সে দায়িত্বশীল পদে কাজ করতেন। সেযুগের হিসাবে তাঁর বেতন ছিল বেশ স্ফীত। ধনী না হলেও, মোটামুটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত আবহাওয়াতেই আমাদের বাল্যকাল কেটেছিল। ১৯২২ সালে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। কলেজ-জীবনের সুরু ও শেষ বঙ্গবাসী কলেজে।

রবীন্দ্রনাথ, শুনেছি, একবার একটি মেয়েকে তার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কথা শুনে নাকি বলেছিলেন—তাই না কি গো, তবে তো তোমার সঙ্গে সাবধানে কথা কইতে হয়, আমি যে নন্-ম্যাট্রিক !

মানবেতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর মনেও বুঝি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের ছাপ না পাওয়ার একটা সকৌতুক অস্বস্তি কোথায় রয়ে গিয়েছিল—অন্যে পরে কা কথা ! তাই, এ আর বিচিত্র কী, আমা-হেন ক্ষুদ্র মানুষের মনেও এই একটা কাঁটা চিরকাল বিঁধে আছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কবিগুরুর চাইতে "বিদ্বান্" হয়েছিলাম বটে, তবে কলেজের পাঠ পুরোপুরি সাঙ্গ করতে পারি নি। একদিকে তখন পারিবারিক জীবনে নানান্ বিপর্যয়ের প্রাদুর্ভাব আর অন্যদিকে আমার গান-পাগলামি, এ দুয়ের ফলশ্রুতি হিসাবে স্নাতকত্ব অর্জন করার আগেই কলেজ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি।

তখন সে কি উদ্দীপনা—'চাহি না অর্থ চাহি না মান', চাই কেবল গান, গান আর গান। কিন্তু গানেই যে আমার অর্থ উপার্জন এবং তা সুরু হয়ে যাবে ওই বয়সেই তা কি আগে বুঝতে পেরেছিলাম। গান হবে আমার প্রাণের পরমান্ন, কিন্তু দেহধারণের অন্নও যে গান বিকিয়েই আমাকে সংগ্রহ করতে হবে, এ-কথাটাও আমাকে অচিরে জানতে হলো ! বার্কমায়ার ব্রাদার্স-এর অমন যে চাকুরী, তা প্রতিষ্ঠানটির অবস্থাবিপাকে বাবাকে হঠাৎ ত্যাগ করতে হলো।

তাঁর কর্মত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃহৎ পরিবারের দায়-ভার হুড়মুড় করে এসে পড়েছিল আমার অনভিজ্ঞ স্কন্ধে। অপরিণতবয়স্ক আমি, বিদ্যার জৌলুস নেই, আছে শুধু কিছুটা কণ্ঠ—এই মূলধনটুকু নিয়ে প্রাণান্তকর পরিশ্রমে সেদিন সংসারের নিত্যযাত্রাকে সচল রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। গানের টিউশনী নিয়েছিলাম বাড়িতে বাড়িতে।

এক এক সময় গেছে যখন সতেরো আঠারোখানা বাড়িতে গান ফিরি করে ঘুরেছি। এক বাড়ি সেরেই দৌড়ে গিয়ে আর এক বাড়িতে ঢুকে পড়তাম। এইভাবে উঞ্ছ-কুড়োনো শেষ করে পরিশ্রান্ত দিন-মজুর আমি ঘরে ফিরতাম রাত বারোটা বা তারও পরে ! ফিরে দেখতাম, স্নেহ-বিহ্বলা জননী অভুক্ত হয়ে বসে আছেন, সংসারে সকলকে দিয়ে থুয়ে একটু দুধ রেখেছেন বাঁচিয়ে আমার পাতের গোড়ায় দেবেন বলে !···টিউশনী-করে-ফেরা শ্রান্ত সন্তানের জন্য ওই দুধটুকুর সান্ত্বনা নিয়ে রাত-জেগে-বসে-থাকা জননীর মুখচ্ছবিটি

আমার স্মৃতিতে যে বিষাদ-মধুর রূপে মুদ্রিত হয়ে আছে, তার চাইতে সার্থক মাতৃমূর্তি কোনো চিত্রকরের তুলিতে ফুটে উঠতে পারে বলে আমার জানা নেই।

বাড়িতে আমাদের গৃহদেবতা জগন্নাথদেবের সন্ধ্যারতি হতো প্রতিদিন। আগেই বলেছি, বাবার ছিল ঠাকুর-দেবতায় অচলা ভক্তি। তিনি চাইতেন তাঁর সেই অবিমিশ্র ভক্তিভাবটিকে তাঁর সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে। বলতেন—বাবা, জীবনে কখনো কোনো অবস্থাতেই ঠাকুরের উপর বিশ্বাস হারাস নে। সুখে, দুঃখে, সব অবস্থাতেই তাঁকে সব কথা জানাবি। তিনিই তোর পথ নিষ্কণ্টক করে দেবেন।

এই ধরণের কথা ছেলেবেলা থেকে প্রায়ই শুনে একটা নিঃসংশয় ভক্তিবাদ মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল। পরে যখন রবীন্দ্রনাথের গানে অবগাহন করেছি, তাঁর কবিতা ও কথাসাহিত্য পাঠ করেছি, তখন ঋষি-কবির রচনায় এই কথারই সমর্থন পেয়েছি। কবি কতো জায়গাতেই তো বলেছেন যে, কোনো অপমানই আমাদের স্পর্শ করতে পারে না যদি তা আমরা আমাদের 'নিভৃত প্রাণের দেবতা'র চরণমূলে নীরবে সমর্পণ করে দিতে পারি। বাবা যে-কথা সাধারণ ভাষায়, সাধারণ ভঙ্গিতে বলতেন, আমার মনে হত সেই কথাই যেন কবির লেখনীতে সার্বজনীন ও অনন্তবিহারী হয়ে উঠেছে।

যৌবনে সংগীতসূত্রেই বেতার ও সিনেমার সঙ্গে জড়িয়ে গেছি নিবিড়ভাবে। উদ্দাম তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে কিংবা পারিপার্শ্বিকের মোহমুগ্ধতায় আমি কিন্তু সংশয়ী বা ঈশ্বর-বিহীন হয়ে যেতে পারিনি। গৃহের ভক্তিবাদী বৈষ্ণবীয় আবহাওয়া ও রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের প্রভাব আমাকে কখনও ভক্তি-মার্গ-ভ্রষ্ট হতে দেয়নি। দেয়নি বলেই তো জীবনব্যাপী অজস্র অবহেলা-অপমান সত্ত্বেও অশক্ত হয়ে পড়িনি। অবহেলার গ্লানি যখন দুর্বহ হয়ে উঠেছে তখন তা নামিয়ে দিয়েছি আমার প্রাণের ঠাকুরের চরণে। আর, তখুনি আমি মুক্ত জীবনানন্দের স্বাদ আবার ফিরে পেয়েছি। আজ তিয়াত্তর বছরের প্রবীণ দেহ-মন নিয়েও আমি গ্লানিভারশূন্য! আজ অনায়াসেই যখন তখন গেয়ে উঠি—"তার অন্ত নাই গো যে-আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ/তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।"

৩

সিটি ইনস্টিটিউশন মাইনর স্কুলে আমার বাল্য-শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল। একটা ঘটনা বেশ মনে পড়ে। তখন ১৯১১ সাল। স্কুলের একেবারে নীচু ক্লাশের ছাত্র আমি। সে বছর ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জের রাজ্য-অভিষেক হচ্ছে। তখন ইংলণ্ডেশ্বর মানেই ভারতেশ্বর। পরাধীন দেশে তখন মহা আড়ম্বরে উৎসব উদ্‌যাপনের তোড়জোড় চলছে। ইস্কুলগুলোতেও সাজো সাজো রব। আমাদের স্কুলের এক মাস্টারমশাই তো রাজ-বন্দনা করে এক সঙ্গীতই প্রস্তুত করে ফেললেন! তার প্রথম লাইনটি এখনো বেশ মনে পড়ে—"হে ভারত আজি রাজার চরণে কর রে ভকতি দান।" মাস্টারমশাই প্রবল উৎসাহে গানটি আমায় শেখালেন, কারণ অনুষ্ঠান যখন হবে তখন এই গানটি আমাকেই গাইতে হবে!

এখনকার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের নাম তখন ছিল মির্জাপুর পার্ক। সেখানে উৎসব, গান ও বাদ্যভাণ্ডের জোর আয়োজন হলো। তখন শৈশবের বুদ্ধিতে কি জানতাম যে একদিন বড় হয়ে রবীন্দ্রনাথ-চিত্তরঞ্জন-মহাত্মাজীকে জানতে পারব আর তখন এই গান-গাওয়ার কথা মনে পড়লে মজার সঙ্গে লজ্জাও কম পাব না? কিন্তু তখন তো মশগুল হয়ে আছি সেজেগুজে দলবেঁধে মার্চ করা, গান-গাওয়া আর ঠোঙা-ভরতি মিষ্টি খাওয়ার দুর্লভ আনন্দে!

আমার মেজো জামাইবাবুর গানের শখ ছিল। তিনি শ্বশুরবাড়িতে এলেই শ্যালক-শ্যালিকাদের মহলে সাড়া পড়ে যেত। আশপাশ থেকে একটা হারমোনিয়ম সংগ্রহ করা হতো। তারপর হারমোনিয়ম বাগিয়ে ধরে একের পর এক গান শোনাতেন তিনি।

সেদিন ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে যখন সগৌরবে উৎসবের বর্ণনা দিচ্ছি এবং বিশেষ করে আমার নিজের গান গাওয়ার কথা খুব বাহাদুরির সঙ্গে বলছি, সেই সময়ে আমার ওই জামাইবাবু আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। সব শুনে তিনি বললেন—বাঃ, বেশ বেশ, তুমি তাহলে তো ভালোই গাইতে পার। আমি তোমায় কয়েকখানা গান শিখিয়ে দেব। ভালো ভালো থিয়েটারের গান।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—গান শিখলে সবাই যে বকবে!

জামাইবাবু একগাল হেসে অভয় দিয়ে বললেন—না ভাই না, আমি তোমায় এমন সব গান শেখাব যে কেউ কিছু বলবে না। 'জয়দেব', 'কমলে কামিনী', 'বলিদান' এইসব নাটকের যত ভালো ভালো ঠাকুর-দেবতার গান তোমায় আমি শিখিয়ে দেব।

শেষ পর্যন্ত কয়েকখানি থিয়েটারের গান জামাইবাবুর কাছ থেকে শিখেছিলাম। তার মধ্যে ছিল 'জয়দেব' গীতি-নাট্যের সেই বিখ্যাত গান—"এই বলে নূপুর বাজে"। এই গানটা শেখার শেষে যখন তাঁকে হুবহু নকল করে গেয়ে শোনালাম, তিনি তো খুব খুশি।

মনে পড়ে তাঁর কাছে আরো গান শিখেছিলাম। যেমন, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বলিদান' নাটকের গান—'উলু নয়, রোদনধ্বনি, প্রাণ কাঁপে শাঁখের ডাকে', আর—

'খা লো কনে আফিঙ্ কিনে, বাগিয়ে না হয় রাখ দড়ি—
কলিতে অমর কনে-শাশুড়ী।'

তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের গানও কিছু কিছু শিখেছিলাম ওঁর কাছে। রীড টিপলেই অমন মিষ্টি সুর বেরোয় যে-যন্ত্র থেকে তাই বাজিয়ে জামাইবাবু গান গাইলেন বেশ ক'দিন, শেখালেন এবং চলে গেলেন। আমার মনে কিন্তু হারমোনিয়মের জন্য একটা প্রবল আকর্ষণ তিনি সৃষ্টি করে দিয়ে গেলেন।

হারমোনিয়ম! হারমোনিয়ম! 'কোথায় পাব তারে'? নিরুপায় বালক আমি, দিনরাত মনে মনে ওই আশ্চর্য বস্তুটিকে খুঁজে ফিরতে লাগলাম। ভাবলাম দীনদয়াল হরি তো কত লোকের কত কামনা পূর্ণ করেন, আমার কথা কি তিনি একটু ভাববেন না?

দিন কেটে যায়। হঠাৎ একটা ঘটনায় এক দিন বুঝলাম যে ঠাকুর আমার কথা ভোলেন নি। হারমোনিয়ম শেষ পর্যন্ত তিনি আমায় পাইয়ে দিলেন। আমারই একটু দুষ্টু বুদ্ধি অবশ্য আমায় সাহায্য করল। ঘটনাটা বলি।

প্রথম মহাযুদ্ধ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। আমাদের পাড়ার কাছেই থাকতেন ছোটকাকার এক বন্ধু, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। আমরা বলতাম শৈলেনকাকা। তিনি সেই সময়ে মেসোপটেমিয়ায় (ইরাকে) কোনো এক ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়ে চলে যান। তিনি থাকতেন তাঁর মামাদের একটি বাড়ির একখানা

ঘর নিয়ে, একাই। কলকাতায় তাঁর আর কেউ ছিল না। বিদেশযাত্রার সময়ে তিনি বেশ কয়েকটি দামী দামী জিনিস আমাদের বাড়িতে রেখে গেলেন, আর আমার মায়ের কাছে রেখে গেলেন নিজের ঘরের চাবিটি।

যে-ঠাকুরটি বাল্যে ননী-মাখন এবং যৌবনে নারীকুলের বস্ত্র ও মন—সব-রকম চুরিতেই হাত পাকিয়েছিলেন, তিনিই আমায় এই সুযোগে বুদ্ধি জোগালেন। আমার মনে পড়লো, শৈলেনকাকার ঘরে একটা হারমোনিয়াম তো আছে! মায়ের কাছে উনি চাবিও রেখে গেছেন! তখুনি আমার মতলব সুরু হলো, কেমন করে চাবিটার নাগাল পাওয়া যায়।

বাড়িতে নির্বিচার স্নেহ ও প্রশ্রয় আমি শুধু একজনের কাছে পেতাম, তিনি আমার বিধবা পিসিমা। আমার মনটা নেচে উঠল। মায়ের কাছে চাবি চাইতে গেলেই তো বকুনি খাব। কিন্তু পিসিমা? পিসিমাকে সব কথা বলা যায়।

সব শুনে পিসিমা বললেন—তোর মায়ের আলমারি থেকে শৈলেনের ঘরের চাবি এনে দেব। কিন্তু আগে বল্, অন্য কোনো জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি করবি না, কেবল হারমোনিয়মটা বের করে চুপি চুপি বাজাবি? তারপর আবার যেখান-কার যা ঠিক করে রেখে, দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটি আমার হাতে ফিরিয়ে দিবি, কেমন? খুব সাবধান কিন্তু, তোর মা জানতে পারলে রক্ষে থাকবে না।

চাবিটি হাতে পেয়েই তো আমি দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটলাম। পাশের পাড়ার ঘোষ লেনে শৈলেনকাকার বন্ধ ঘরের তালা তখন আমার লক্ষ। খুট করে দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম ওঁর ঘরে।

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, জানলা খুলে দিলাম। হঠাৎ-আলোর-ঝলকানিতে হারমোনিয়মের বাক্সটি যেন আমাকে অভ্যর্থনা করে বললো—এসো এসো। অধীর হাতে যন্ত্রটি বের করলাম ডালা খুলে। ধুলো-ভরতি মেঝেতেই বসে পড়লাম ধুপ করে। আমার অজ্ঞ আঙুলের চাপে হারমোনিয়মটি সরু মোটা নানান এলোমেলো সুরে কলরব করে উঠল। আমার সর্বাঙ্গে তখন রোমাঞ্চ।

হারমোনিয়ম নিয়ে আমার জীবনের প্রথম সংগীতশিক্ষার আসর ছিল সেটাই আর সেই আসরে সেদিন আমিই গুরু, আমিই চেলা। গলায় তখন আমার শুনে-শুনে তোলা বেশ কয়েকখান গানের পুঁজি। তার মধ্যে আবার ছিল রবিবাবুরও একটি গান—"এই মলিন বসন ছাড়তে হবে—।" (গানটি, যতদূর মনে পড়ে, আমাদের ছেলেবেলায় এই ভাবেই গাওয়া হতো। 'মলিন বসন' বলা হতো,

'মলিন বস্ত্র' না গেয়ে। মনে পড়ে, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শনিবার শনিবার ভবসিন্ধু দত্ত মহাশয় ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন, আমি গান তোলার জন্য শুনতে যেতাম প্রায়ই। তিনিও 'বস্ত্র' না বলে 'বসন' বলতেন। প্রসঙ্গত আরও মনে পড়ে 'আমি কান পেতে রই' গানটির কথা। এই গানটির প্রথম অন্তরা তখনকার দিনে গাওয়া হতো এমনি ভাবে—

'ভ্রমর সেথা হয় বিবাগী কোন্ নিভৃত পদ্ম লাগি—'

তারপর ফিরিয়ে গাওয়া হতো—

'ভ্রমর সেথা হয় বিবাগী নিভৃত নীল পদ্ম লাগি'।)

আমি—'এই বলে নূপুর বাজে'– গানটি হারমোনিয়মে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা সুরু করলাম। কিন্তু—'সে কি সহজ গান'? হারমোনিয়মে তখন সুরকে ধরা কি আমার পক্ষে সহজ কাজ? যে রীডই টিপি অন্য সুর বেরোয়। গলদঘর্ম হতে হতে অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ দেখি গানের সূচনার 'এই' শব্দটির সুর যন্ত্রে ধরা পড়ল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম আমি। আস্তে আস্তে যন্ত্রের সাথে মিতালি গড়ে উঠল আমার। গানটির সমস্ত শব্দগুলির সুর মিলিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ গানটি তুলে নিলাম।

* * *

বন্ধ ঘরের আধকারে যা ছিল সকলের অগোচরে, পিসিমার নিপুণ প্রশ্রয়ে তাকে এমনি করে 'গানে গানে নিয়েছিলেম চুরি করে'। এমনি ভাবে গানের পুঁজিও বাড়াতে লাগল আমার। বাড়ীতে তখনকার দিনে 'কলের গান' শুনতাম আমরা। নামকরা সব গায়ক-গায়িকার রেকর্ড ছিল তখন—পান্না-ময়ী, কে মল্লিক, মানদাসুন্দরী বা নরীসুন্দরীর গান তখন মুখে মুখে ফিরত। তাঁদের গান বাজিয়ে বাজিয়ে শুনতাম, শুনে শুনে তুলে ফেলতাম। তারপর সুযোগ মতন শৈলেনকাকার সেই বন্ধ ঘরের তস্কর মুহূর্তগুলিতে তাদের তুলে নিতাম হারমোনিয়ামে।

ইতিমধ্যে সঙ্গীতের ব্যাপারে আমাদের বাড়িতে একটু উদার বাতাস বইতে সুরু করেছে। গানে সোজাসুজি উৎসাহ না দিলেও গুরুজনদের আপত্তির ভাবটা অনেক শিথিল হয়ে গেছে। মা ও মাতৃস্থানীয়ারা তখন সাগ্রহে আমার মুখে ঠাকুর-দেবতার গান শুনতে চান, তাঁদের কাছে আমার একটু একটু সমাদর তখন সুরু হয়ে গেছে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন শৈলেনকাকা ফিরে এলেন মেসোপটেমিয়া থেকে। আমাদের বাড়িতে এসে চাবিটি নিয়ে তিনি স্বগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছন পিছন—আমিও!

—শৈলেনকাকা।

—কী বাবা, বলো, বলো।

ভয়ে ভয়ে বললাম তাঁকে তাঁর অনুপস্থিতিতে চুরি করে হারমোনিয়ম বাজানোর সব বৃত্তান্ত, একটি একটি করে গান তোলার সব ইতিবৃত্ত। আশঙ্কা ছিল, শৈলেনকাকা বুঝি রেগে যাবেন। কিন্তু কই, তিনি তো রাগলেনই না, বরং সোল্লাসে উৎসাহ দিয়ে বললেন—তাই নাকি? তাহলে দাঁড়াও, একটু পরে একটা গান শোনাও দিকি, বাবা।

আর আমায় পায় কে? এখন আর চোরের মতো নয়। শৈলেনকাকার সমর মত খোলা-মেলা ঘরে বসে দরাজ গলায় বেশ কয়েকখানা গান পর পর শুনিয়ে দিলাম তাঁকে।

গান শুনে তিনি সোল্লাসে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন—সাবাস্, কাজের ছেলে! গান শিখতে চাও ভালো করে? নিয়ে নাও হারমোনিয়াম-খানা। আমি তোমায় দিয়ে দিলাম ওটা। তোমার গানের পুরস্কার!

—পু-র-স্কা-র! না, না, সে কী!…আমার মুখ দিয়ে তখন ভালো করে বাক্‌স্ফূর্তি হচ্ছে না।

শৈলেনকাকা বললেন—আরে বাবা, দিচ্ছি নিয়ে নাও। আমার আর কী দেবার ক্ষমতা আছে বলো। কুড়িটি টাকার শখ করে কিনেছিলাম। কিন্তু আমার তো বাজানোই হয় না। তুমি তবু বাজাবে, কদর হবে যন্তরটার।

এর পরেও আমি কিন্তু কিন্তু করছি দেখে উনি বললেন—শোনো পঙ্কজ! জীবনে গান গেয়ে তুমি অনেক বড় হবে, অনেক বড় পুরস্কার পাবে। তার তুলনায় এ কিছুই নয়। আমি বলছি, তুমি নাও এটা।

মনে পড়ে এই ঘটনাটা সে-বছর রথযাত্রার কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল।

এই সেদিন প্রবীণ বয়সে যখন দাদাসাহেব ফাল্‌কে পুরস্কার পেলাম, তখন তাঁর কথা বার বার মনে পড়ছিল। সেই সুদূর কৈশোরে তাঁর-দেওয়া-উপহারে যে-আনন্দ পেয়েছিলাম আমি, ফাল্‌কে পুরস্কারের আনন্দ কি তাকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে?

প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। শৈলেনকাকা নিজেও কবি ও গীতিকার ছিলেন। বেশ লিখতেন তিনি। তাঁর স্বরচিত গানের একটি খাতা ছিল। তাঁর লেখা একটি গান একদিন আমায় পড়ে শুনিয়ে বললেন—পংকজ, এটাতে তুমি সুর দিতে পার?

গানটির প্রথম অংশ কিছুটা মনে পড়ে—

কোথা যাও শ্যাম

ব্রজ অভিরাম

গোকুল-ললাম, দাঁড়াও ফিরে!

আমি তাঁর কথামতো গানটিতে সুর লাগিয়েছিলাম এবং পরে তাঁর আরও কয়েকটি রচনায় সুর দিয়েছিলাম।

৪

আমার সুদূর বাল্যের এই ঘটনাই আমার সংগীত-জীবনের প্রথম স্মরণীয় ঘটনা। তার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে দুর্গাদাসবাবুর সংগে আমার পরিচয় ও তাঁর স্নেহস্পর্শলাভ এবং 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' গানটিকে কেন্দ্র করে যে-ঘটনা ঘটেছিল, সেইটি। বুদ্ধি দিয়ে এ-ধরণের ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় না। আমিও পারিনি : আজও পারি না।

কিন্তু এই ঘটনার জের হিসাবেই একটা লাভ হয়েছিল আমার। আনন্দ পরিষদের লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্রের কাছে জেনেছিলাম যে ঐ গানটি কবির নিজেরই সুরারোপিত একটি গান এবং রবিবাবুর গান শিখতে হলে যেতে হবে তাঁর বড়-দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। এদিকে আমি তখন নিজের উৎসাহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যেতাম মাঝে মাঝে, শনিবার সন্ধ্যায়। সেখানে ব্রহ্মসংগীত হতো, শুনে শুনে তুলে নিতাম। আগেই একবার উল্লেখ করেছি, সেখানে ভবসিন্ধু দত্ত মহাশয় গাইতেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বেশ কয়েকখানা গান তুলে নিয়েছিলাম আমার অনভিজ্ঞ কণ্ঠে। যতদূর মনে পড়ে, একখানি স্বরলিপি-পুস্তকও সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম।

১৯২২ সালের কথা। বংগবাসী কলেজের তরুণ ছাত্র আমি। কেমন করে জানি না, তখনই আমার মনে একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের গানেই আমার ইহজন্মের মুক্তি, এই গানই আমার এ-জীবনের তীর্থ-যাত্রার প্রধান সম্বল। বুঝতে পেরেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের গান শুধু গানই নয়, এ-যেন কোনো এক বিপুল অসীম থেকে নিয়ে-আসা অধরা মাধুরীর সংহত বাণীমূর্তি। এ গান রসিকের চিত্তকে নিখিলের বাণীমন্দির-প্রাংগণে এক অন্তহীন বিস্ময়ের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আজ সে-বয়স পেরিয়ে এসেছি যখন এই কথা বললে কোনো কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিদ্রূপ করতেন আর আমি মনো-বেদনায় ক্লিষ্ট হতাম।

মহাকবির চরণ-প্রসাদেই আজ মানসিক স্থৈর্য আমার করায়ত্ত। এমনকি সব যদি হারাই,—'তবু তো আছে আঁধার কোণে ধ্যানের ধনগুলি/একেলা বসি আপন মনে মুছিব তার ধূলি'।

তারপর ? তিনিই পথনির্দেশ করে গেছেন—'আপন মাঝে' যে 'গোপন রতনভার' আছে, তাই দিয়ে—

গাঁথিবি তারে রতনহারে, বুকেতে নিবি তুলি
মধুর বেদনায়……।

প্রথম কৈশোরের স্বপ্ন ছিল কালক্রমে ওস্তাদ গায়ক হব। কিন্তু রবীন্দ্র-রুচি আমার পথ দিল বদলে। আবার রবীন্দ্র-সঙ্গীত-চর্চার সঙ্গে এসে মিশে গেল আমার সুরারোপের প্রবণতা। 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' গানটির কথা তো আগেই বলেছি। এর পরে আমায় আচ্ছন্ন করলো 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই ছায়া'—'খেয়া' কাব্য গ্রন্থের 'শেষ খেয়া' নামক এই বিখ্যাত কবিতাটি। কিছু দিনের মধ্যেই এই কবিতাটিতে সুর দিয়ে এখানে ওখানে গেয়ে বেড়াতে লাগলাম। ছোট-খাটো আসরে, কলেজের অনুষ্ঠানে এই গানটি মহানন্দে পরিবেশন করছি তখন। এই গানটির সুর ও শেষের ইতি-কথা যদি এখানে একটু লিপিবদ্ধ করি, তাহলে আশা করি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হবে না। গানের প্রথম কয়েকটি পংক্তি—

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ওই ছায়া
ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ
ও-পারেতে সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।

দিনান্তের কবিতা, বেলাশেষের গান। অল্প বয়সের অজ্ঞতায় আমি কিন্তু এতে প্রভাতের সুর লাগিয়েছিলাম। হলে হবে কী, গানটি যত্রতত্র গেয়ে বেড়ানোর ফলে বহু প্রশংসা জুটে গেল চারিদিক থেকে। লোকে বললো বাঃ, বেশ গায় ছেলেটি।

কালক্রমে এই গান স্বয়ং কবির সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। কিন্তু সেদিন এই গান আমার সমূহ বিপদ ডেকে এনেছিল। কারণ, এত স্পর্ধা তো ভাল নয়। অনুমতির তোয়াক্কা না রেখে কবির কবিতায় সুর দিয়েছি, একেবারে স্বেচ্ছাচারের চূড়ান্ত!

তখন বুকের মধ্যে বাস করতো এক দুঃসাহসিক বালক ও তার সুরের যত পাগলামি। সেই বুকের 'আগল ধরে' তখনো কোনো শ্রোতা 'নাড়া' দেয় নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন নাড়া এসে লাগলো। সত্যিই এক ভদ্রলোক একদিন এসে সদর

দরজায় কড়া নাড়লেন। জানালেন, স্বয়ং কবিপুত্র আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। ভদ্রলোক সংক্ষিপ্ত বার্তাটুকু জ্ঞাপন করেই অন্তর্হিত হলেন।

ভদ্রলোক তো গেলেন, কিন্তু আমার বুকে সেই থেকে অনর্গল নাড়া লাগতে সুরু হলো। আচ্ছা, আমার কথা কেমন করে জানলেন রথীন্দ্রবাবু? আমি কি না জেনে তাঁর পিতৃদেবের চরণে কোনো অপরাধ করে ফেলেছি?

অচিরেই এক প্রভাতে দুর্গা-নাম স্মরণ করে আমার জীবনের সব চাইতে ভীতিপ্রদ যাত্রা সুরু করলাম, চিৎপুর-জোড়াসাঁকো লক্ষ করে। তখন নিতান্তই তরুণ আমি, ঠাকুরবাড়ি আমার কাছে এক বিস্ময়ের স্বপ্ন-রাজ্য, রাজার বাড়ি সেটা, সেখানে বাস করেন কাব্য ও সাহিত্যলোকের রাজরাজেশ্বর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় ঢুকে প্রথমেই দেখা পেলাম দারোয়ানদের। ভরসায় বুক বেঁধে তাদের কাছে রথীন্দ্রবাবুর খোঁজ নিলাম। গাঁট্টাগোট্টা মস্ত গোঁফওলা এক দারোয়ান দোতলার হল্-ঘরের পথ দেখিয়ে দিলো। সেখানে উঠে, দরজার সামনে কম্পিত বক্ষে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম সৌম্য সুদর্শন কবি পুত্রকে। এগিয়ে গিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই আমার দিকে তাকালেন তিনি। নিজের পরিচয় দিয়ে সভয়ে শুধালাম— আমায় কি আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন?…

রথীন্দ্রবাবু আমার পরমশ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ ও গুণগ্রাহিতা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কলকাতা—শান্তিনিকেতন—দেরাদুন—যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, তাঁর সংগে আমার যোগসূত্র কখনোই ছিন্ন হয়নি। আমার রবীন্দ্রনিষ্ঠাকে চিরকাল তিনি নিখাদ সততা বলেই বিশ্বাস করেছেন, আমার সামান্য কণ্ঠের রবীন্দ্রগীতিকে তিনি ব্যাকুল ও তন্ময় আগ্রহ নিয়ে কাছে বসে অনেক বার শুনেছেন। তাঁর আতিথ্যও আমি কম গ্রহণ করিনি। তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে, তাঁর দেরাদুন-প্রবাসের সময়ে, তাঁরই আমন্ত্রণে ১৯৬১ সালে, বিশ্বকবির জন্মশতবর্ষে তাঁর গৃহে দীর্ঘ আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। সেই আনন্দময় দিনগুলি আমার কেটেছিল তাঁকে গান শুনিয়ে, রবীন্দ্রচর্চা করে এবং তাঁর হাতের বিচিত্র সব কারুকৃতি দেখে। বটানি থেকে ফিলাগ্রি – নানান্ বিষয়ে ছিল তাঁর অনায়াস সঞ্চরণ। আজ আমার জীবনসায়াহ্নে ‘সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে’। আমার সামনে তাঁর অনেকগুলি চিঠি এই মুহূর্তে রয়েছে, কত দিনের কত মধুরতা, কত উচ্ছ্বাস

ছন্দে ছন্দে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে সেগুলিতে। আর রয়েছে তাঁর দেওয়া এক অমূল্য সম্পদ, কবির ব্যবহৃত একটি শাল। কবি সেটি ত্রিপুরার রাজবাড়ি থেকে উপহার পেয়েছিলেন, ত্রিপুরার কারিগরের সৃষ্ট অনুপম একটি গাত্রাবরণ সেটি। এই শাল রথীন্দ্রনাথ যখন আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, সংকুচিত হয়েছিলাম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত অংগবাস কেমন করে গায়ে তুলব? কবিপুত্র তবু জোর করে দিয়েছিলেন আমায় সেটি। আমি ধন্য!

আজ সেই রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে আমার 'চোখ ভেসে যায় চোখের জলে'। তাঁকে ভুলে গেলে যে মহাপাপের ভাগী হব! কথায় কথায় নয়ন অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এই জন্যই কি বার্ধক্যকে বলে দ্বিতীয় শৈশব?…

…কিন্তু কী কথার থেকে কী কথায় চলে এলাম। থাক এখন তাঁর সম্পর্কে অন্য স্মৃতির রোমন্থন। আবার আদি প্রসংগে ফিরে যাই।

—আমায় কি আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন?

রথীন্দ্রনাথ বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ বসুন।

আমি সঙ্কুচিত ভাবে আসন গ্রহণ করার পর তিনি আমার দিকে স্থিরভাবে চেয়ে বললেন—আপনি নাকি বাবামশায়ের কী একটা ছায়া ছায়া গান গেয়ে থাকেন?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—কী গানের কথা বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না তো।

বারান্দা দিয়ে ওই সময়ে এক ভদ্রমহিলা যাচ্ছিলেন। রথীন্দ্রবাবু তাঁকে ডাকলেন—রমা, শোনো।

সুবেশা তরুণীটি ঘরে ঢুকলেন, চেহারায় স্নিগ্ধ সুরুচির ছাপ। ওঁকে তখন আমার চেনার কথা নয়, পরে জেনেছিলাম যে উনি আমাদের সৌম্যদা অর্থাৎ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী।

— আচ্ছা রমা, তোমার কি মনে আছে সেদিন কোন্ গানের কথা হচ্ছিল? ইনি এসেছেন, এঁরই নাম পঙ্কজকুমার মল্লিক।

রমা দেবী বললেন—'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই ছায়া' কিন্তু গান নয় তো ওটা, ওটা তো একটা কবিতা।

এই বলে তিনি চলে গেলেন।

রথীবাবু বলে উঠলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—দিনের শেষে। আচ্ছা কবিতা বা গানটি, আপনি কোথায় পেলেন বলুন তো?

বুঝলাম, এইবার ধরা পড়বো। রথীন্দ্রনাথ নিশ্চয় গর্জন করে উঠবেন—এত বড়ো সাহস আপনার। অপরিণত যুবক আপনি, কোন্ সাহসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় সুরারোপ করেন?

সুতরাং মরীয়া হয়ে মিথ্যা কথা বললাম।

—আজ্ঞে গানের বইতেই তো রয়েছে।

'গানের বই' কথাটি শুনে রথীন্দ্রনাথ যেন একটু ধাঁধায় পড়ে গেলেন। বললেন—কোন্ বইতে আছে বলুন তো? স্বরলিপি আছে?

—নিশ্চয়। আমি তো তাই থেকেই শিখেছি।

—আশ্চর্য! আমরা কেউ মনে করতে পারছি না। আপনার কাছে বই আছে?

—আজ্ঞে ছিল, আমার এক বন্ধু সম্প্রতি ওটা নিয়ে গেছেন। তিনি কাশী গেছেন।

—আচ্ছা বেশ, তিনি ফিরলে আনতে পারবেন?

—হ্যাঁ, তা পারব না কেন?

মিথ্যার পর মিথ্যা সাজিয়ে তখনকার মতো রেহাই পেয়ে মনে করলুম বেঁচে গেছি। কিন্তু না, বাঁচিনি। এক মাস পরেই একটা চিঠি এলো, স্বাক্ষরকারী কবিপুত্রই। চিঠির বার্তা এই যে স্বয়ং কবি আমায় ডেকেছেন, অমুক দিন, অমুক সময়ে আমি যেন যাই।

* * *

'এ কী গভীর বাণী এলো ঘন মেঘের আড়াল ধরে'!

আমার মনে তখন পুঞ্জীভূত আশঙ্কার ঘনায়মান মেঘ, কিন্তু তার অন্ধকার ভেদ করে কী এক অপূর্ব রসোল্লাস উদ্বেলিত হয়ে উঠলো! কবিকুলশ্রেষ্ঠ, সুরের অধীশ্বর মহামানব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আমায় ডেকেছেন! আমাকে, মানে এই অখ্যাত, অর্বাচীন তরুণকে! থাক না আশঙ্কা, থাক না তিরস্কৃত হবার শতেক ভয়, এ আমার শতজন্মের সৌভাগ্য যে স্বয়ং তিনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন! আমার মানব জন্মের তীর্থদর্শন যে এই একটি সুযোগেই সম্পন্ন হয়ে যাবে!

যদি তিনি আমায় তিরস্কার করেন ? করুন না, তিনি আমায় প্রহার করলেও আমি তা আমার অঙ্গের ভূষণ করে নিয়ে ফিরে আসব। চলে আসার আগে শুধু তাঁর কমল চরণ দুটি চোখের জলে সিক্ত করে সব অপরাধ স্বীকার করে আসব।

নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে পৌঁছালাম। এবারেও প্রথমেই রথীন্দ্রবাবুর সম্মুখীন হতে হলো। এবার আর তিনি ভুল করলেন না। সোজা-সুজি বললেন—দেখুন, গোপন করার দরকার নেই। আমি জেনেছি 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' কবিতাটিতে সুর দিয়ে আপনিই গান তৈরি করেছেন। গানটা বাবামশাই আপনার মুখেই শুনতে চান। চলুন তাঁর কাছে।

ধরা পড়ে গেছি আমি। মাথা নীচু করে রথীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করলাম কবির ঘরের উদ্দেশে! এ-অবস্থায় নীরব থাকাই বিজ্ঞজনোচিত। কিন্তু মনে মনে তখন আমি কাঁপছি, চুরি করে ধরা পড়েছি, এখন স্বয়ং বিচারপতির সামনে সুড়-সুড় করে চোরাই মালপত্র সব বের করে দিতে হবে।

ঘরের এক পাশে নীচু সুদৃশ্য তক্তপোষ, শুভ্র চাদর পাতা। তার উপরে বসে কবি কী যেন লিখছিলেন আর মাঝে মাঝে অস্ফুটভাবে কী যেন বলছিলেন আপন মনে। তাঁর সেই তন্ময় ঋষিমূর্তি আজও আমার মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আরো বোধহয় আটজন মানুষ সে ঘরে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন মহিলা। এঁদের কাউকেই তখন আমি চিনতাম না। পরে জেনেছিলাম যে সকলেই ঠাকুর-পরিবার-সংশ্লিষ্ট।

ঘরের আর এক কোণে ছিল অনুপম একটি অর্গান। হ্যামিলটনের বাড়ির সেই সঙ্গীতযন্ত্রটিকে শুধু অর্গান না বলে একখণ্ড মনোরম আসবাব বললেই ভালো হয়। রথীন্দ্রবাবুর ইঙ্গিতে অর্গানটিতে বসলাম। তারপর ধীরে ধীরে কবির বাণী গাইতে সুরু করলাম আমার সুরে স্বয়ং কবির সম্মুখে। দেখতে পাচ্ছি, কবি তখনও চোখ বুজে রয়েছেন. অস্ফুটভাবে কী বলছেন মাঝে মাঝে। তাঁর সামনে ছোট একটি ডেস্কের উপরে রয়েছে কিছু বই, কাগজ, কলম আর হরেকরকমের নানা-রঙের পেনসিল।

আমি তখন ভয়ে ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছি। গলা শুকিয়ে উঠছে। আড়চোখে কবির দিকে গানের ফাঁকে ফাঁকে তাকাচ্ছি। কবি কিন্তু অচঞ্চল, অর্ধনিমীলিত নয়নে আত্মসমাহিত হয়ে আছেন, মাঝে মাঝে অস্ফুটভাবে কী যেন উচ্চারণ করছেন। গানও শুনছেন সতর্কভাবে তাও বুঝতে পারছি।

সন্ত্রস্ত কণ্ঠে কোনোমতে গান তো শেষ করলাম। কবির দিকে চেয়ে দেখি তিনি যেন আরো বেশি ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়েছেন। হয়তো বড় কিছু ভাব এসেছে মনে, তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন, একটু পরেই তাঁর লেখনী একটি অনুপম কবিতা সৃষ্টি করবে। আমি দেখলাম সকলেই একে একে পা টিপে টিপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, আমি তখন গানের শেষ কলির কাছাকাছি রয়েছি। ঘরে রয়ে গেছেন (স্বয়ং কবি ব্যতীত) কেবল দুই ব্যক্তি—একজন রথীন্দ্রনাথ আর অন্য-জন গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং সমরেন্দ্রনাথের পুত্র—রতীন্দ্রনাথ।

গান শেষ করে আর আমার দাঁড়াবার মতো মনোবল ছিল না। গান কেমন লাগল, একথা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জানতে চাওয়ার মতো দুঃসাহস তখন আমার পক্ষে কল্পনাতীত ছিল। ঘর্মাক্ত আমি কোনমতে অর্গান ছেড়ে উঠেই পাশের দরজা দিয়ে সোজা নিচে নেমে এলাম। তার পর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি বেয়ে, চিৎপুর পেরিয়ে সোজা নিজগৃহপথে।

৫

শুনেছি, কবিগুরুর জ্যেষ্ঠাগ্রজ, ভক্তি-ভাজন দার্শনিক ও কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্নেহাস্পদ্ অনুজের জন্মদিনে লিখেছিলেন—

সেই যে বালক সেদিনকার,
পঞ্চষষ্টি হইল পার;
প্রতিভা তার অসীম অপার,
কাণ্ডটা কী চমৎকার!

'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা, এবং যতদূর জানি, মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের প্রথম সার্থক বাংলা পদ্যানুবাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ বালক রবির চিত্তচমৎকারী কাণ্ডকারখানা দেখে, কৌতুক-ছলে ঐ পদ্যস্তবকটি রচনা করেছিলেন। কথাটা শুনেছিলাম আমার রবীন্দ্রসংগীত-গুরু দিনেন্দ্রনাথের কাছে।

আজ আত্ম-কথা বলতে গিয়ে বার বার এই স্তবকটি আমার মনে পড়ে। স্নেহ-ভরে কোনো কথা বলার মতো গুরুজন আজ আমার কেউ বেঁচে নেই; তা ছাড়া—'প্রতিভা তার অসীম অপার'—এমন কথা আমায় কে-ই বা বলবে? কিন্তু নিজের প্রতি নিজের মমতার ফলে আমার নিজেরই ইচ্ছা করে সকৌতুকে পংক্তি-কটি বার বার উচ্চারণ করতে। মনে ভাবি, সত্যিই তো, কাণ্ডটা কী চমৎকার! সেই যে আমি সেদিনকার বালক, কবির আদেশে ত্রস্ত কণ্ঠে তাঁকে আমার গান শুনিয়েছিলাম, সেই আমিই কিনা আজ আমার সত্তর-অতিক্রান্ত জীবনের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করছি! সেদিন আমার তরুণ কণ্ঠে ছিল আশঙ্কা, আজ এসেছে বার্ধক্যজনিত কম্পন। মাঝের দিনগুলো মুদ্রিত রয়ে গেছে সিনেমার পর্দায়, বেতার-অফিসের টেপ্-রেকর্ডে, গ্রামোফোনের ডিস্কে এবং হয়তো বা অগণিত শ্রোতার স্মৃতিতে—যাঁরা আজ উত্তরযৌবন, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। মাঝে মাঝে মনে হয় এই ভালো, এই ভালো। এ-ও এক পরম মুক্তি। সব খসে গিয়ে মুক্ত ও নিরাভরণ আমি যে শুধু আমিই এই অনুভূতিটুকুর আস্বাদ নিতে লাগে বেশ!

'অনেক দিনের সঞ্চয় তোর
আগুলি আছিস বসে,
ঝড়ের রাতের ফুলের মতন
ঝরুক রে, পড়ুক রে, ঝরুক পড়ুক খসে।
আয়রে এবার সব হারাবার জয়মালা পর শিরে।'

এই—'সব হারাবার জয়মালা'—শব্দগুচ্ছটি উচ্চারণ করতে গিয়ে আমার অকস্মাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে এক সত্যকারের সদানন্দ পুরুষকে। মনের মধ্যে একদিন যাঁকে গভীর শ্রদ্ধার আসনে সংস্থাপন করেছিলাম। তিনি হচ্ছেন আমাদের কেষ্টদা—প্রখ্যাত অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। বুকের ভিতর একটা দুর্বহ দুঃখের ভার তিনি আবাল্য বয়ে বয়ে বেড়িয়েছেন, তবু তাঁর স্মিত, প্রসন্ন, অন্ধ মুখখানিতে ক্লেশ বা ক্ষোভের লেশমাত্র দেখিনি কখনো।

আমরা যখন নিতান্ত তরুণ, কৃষ্ণচন্দ্র দে তখন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। তাঁর কণ্ঠসম্পদের কথা আজকের প্রবীণেরা নিশ্চয় ভোলেননি। তাঁর—'গানের তানের সে উন্মাদনে' বঙ্গভূমি তখন প্লাবিত। তখনকার দিনে নটকুলগুরু শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রখ্যাত নাটক 'সীতা'য় তাঁর গানের আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। আমার মনে পড়ে, যেদিন প্রথম ঠাকুরবাড়িতে, দুঃসাহসিকভাবে দিনেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম ঠিক তার কিছু পূর্বে বাড়ির গুরু-জনদের সংগে আমি'সীতা' দেখতে গিয়েছিলাম। ইডেন গার্ডেনে তখন মস্ত একটা একজিবিশন হচ্ছিল, সেইসংগে 'সীতা'ও মঞ্চস্থ হতো সেখানে। প্রসংগত বলি, 'সীতা' প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯১৮ সালে, এটা তার কিছুদিন পরের কথা।

'সীতা'র সংগীত-পরিচালক ছিলেন স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর সহকারী ছিলেন সেযুগের আর এক বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ, নাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। (ইনি পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় নন্)।

তখনকার দিনে সীতার গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বিখ্যাত গান-গুলির মধ্যে ছিল—'মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে', 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে' 'জয় সীতাপতি' ইত্যাদি। প্রাসঙ্গিকভাবে বলি, 'অন্ধকারের অন্তরেতে' গানটির সুরের উৎস ছিল (parent tune) রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সংগীত—'যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা'।

কৃষ্ণচন্দ্র জগৎ দেখে অন্ধ হয়েছিলেন শুনেছি, মাত্র দশ/এগার বছর বয়সে।

জন্মান্ধ যিনি, তাঁর অন্তরে নিশ্চয়ই আলোর জন্য একটা আকুলতা সারা জীবন ধরে থাকে, কিন্তু যিনি বিশ্বরূপ দেখে চোখের আলো হারিয়েছেন তাঁর ব্যাকুল বেদনা বোধ করি একটু অন্যধরণের এবং তা অনেক বেশি দুঃসহ। কৃষ্ণচন্দ্রের বেদনা যে কী ছিল তা পরিমাপ করা আমাদের মতো তথাকথিত চক্ষুষ্মানদের পক্ষে সম্ভব নয়। সংগীতনায়ক এই অন্ধগায়ককে লোকে বলত 'কানাকেষ্ট'। এই সূত্রে বলি, এই 'কানাকেষ্ট' অভিধাটিতে আমি চিরকালই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। এত বড় প্রতিভাশালী একজন সংগীতজ্ঞকে এই রকম তাচ্ছিল্যদ্যোতক নামে ডাকা এক ধরণের সামাজিক কুরুচির প্রকাশ বলেই আমার মনে হয়েছে।

যাই হোক, জীবনের কোনো আঘাতই কিন্তু এই প্রাণময়, শালপ্রাংশু পুরুষটিকে দমিয়ে দিতে পারেনি। তিনি ছিলেন যথার্থই সচ্চিদানন্দ।

কবি গেয়েছিলেন—'অন্ধজনে দেহো আলো/মৃতজনে দেহো প্রাণ'। অন্ধজনকে আলো দিয়ে বিশ্ব-বিধাতা বিশ্বকবির প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন কিনা জানি না, তবে দেখেছি, আপন সাধনার বলে অন্ধ মানুষ-ও যে-আলোকের সন্ধান পান, তা বহু আয়ত-চক্ষু মানুষেরও দৃষ্টির অগম্য। কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তরে সংগীতের পথ বেয়ে সেই আলোকের উৎসার ঘটেছিল।

এই সংগীত-সাধককে সাক্ষাৎ পরিচয়ে পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল যখন নিউ থিয়েটার্সে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক দেবকীকুমার বসুর 'চণ্ডীদাস' ছবিতে কাজ করছি। আমরা তো প্রায় প্রতিবেশীই ছিলাম; কেষ্টদা থাকতেন সিমলায়, আমি চালতাবাগানে। কিন্তু পরিচয় ঘটলো নিউ থিয়েটার্সের প্রাঙ্গণে। মনে পড়ে, একবার আমার অন্তরের সব দুঃখের কথা তাঁর কাছে উজাড় করে দিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন,—ভাই, দুঃখ জয় করতে শেখো, ঈশ্বরকে সর্বদাই হৃদয়ে স্থাপন করে রাখবে, কর্মে বিশ্বাস রেখো, ফলের জন্য ভেবো না। সব তাঁর অভিপ্রায়, এটা জেনো।

আশ্চর্য এক নিরাসক্ত অথচ সংবেদনশীল দার্শনিক মন ছিল তাঁর। তাঁর কথা শুনে কবির কথা আমার মনে পড়ে যেত—ফলের তরে নয়তো খোঁজা। কে বইবে সে বিষম বোঝা…। অহংশূন্য মানুষ তো আমরা কল্পনা করি মাত্র। কিন্তু বাস্তবে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় অনেক ভাগ্য করলে। আমি সেই ভাগ্য করেছিলাম।

আমাদের দুজনের মধ্যে সেই যে সম্বন্ধ তৈরি হলো, তাতে কিন্তু অনেক

সময় অনেক কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটেছিল। অগ্রজ এই সংগীতনায়কের কণ্ঠে ছিল দিগন্তপ্লাবী উচ্ছ্বাস। তাঁর কণ্ঠের যা শক্তি ছিল তা আজকের দিনে কল্পনা করা যায় না। সুবিশাল সমাবেশেও তিনি মাইক ব্যবহার করতে চাইতেন না। তাঁর পাশে আমরা তরুণ গায়কেরা তখন ভয়ে ভয়ে থাকতাম। কিন্তু সংসারে কতো বিচিত্র ব্যাপারই না ঘটে। কালক্রমে আমি সুরকার ও সংগীত-পরিচালক হলাম, এবং সেই সুবাদেই তাঁকে গান তোলাবার দরকার হলো বহুবার। এক-সঙ্গে বসতাম যখন, ভুলে যেতাম আমি ওঁর পরিচালক। একত্রে বসলেই আমার মনে হতো উনিই আমার নেতা, আমি ওঁর অনুচরমাত্র। তারপর দুজনে একত্রে সুরের সীমাহীন রাজ্যে বিচরণ করতাম। নোটেশানের হিসেবী বাঁধুনি সুরের প্লাবনে ভেসে যাবার উপক্রম হতো।

সব চাইতে মজা হতো যখন উনি নিজে গেয়ে নিজেই বলতেন—উঁহু, ঠিক হলো না তো, তোমার মতন হলো না হে। তুমি পরিচালক, আমার কাজ হচ্ছে তোমাকে ঠিক ঠিক অনুসরণ করা, অথচ দেখো তো কী কাণ্ড, এযে আমার মতন হয়ে যাচ্ছে!

আমি যত বলি—এই খুব ভালো হয়েছে কেষ্টদা, আপনি আপনার মতোই করুন, এটাই বেশি জমেছে, তিনি তত বলেন—না হে না, তোমারটিই বেশি ভালো, তুমি হচ্ছ গিয়ে সংগীত-পরিচালক।

এ এক বিচিত্র কৌতুক! কেষ্টদার ভঙ্গিটি সত্যিই আমার বেশি পছন্দ হয়েছে, চাইছি ওটাই থাক; কেষ্টদার কিন্তু অতৃপ্তি ও বিনয়ের যেন শেষ নেই। উনি কিছুতেই সংগীত-পরিচালকের মতো না করে ছাড়বেন না!

একবার আরো একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। প্রায় অবিস্মরণীয়। সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক বাঙালি-মাত্রই জানেন, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এক একটা সাহিত্য-পত্রিকাকে ঘিরে অনেকগুলি নাম-করা সাহিত্য-মজ্‌লিস্‌ বা 'আড্ডা' গড়ে উঠেছিল এককালে। কল্লোল, ভারতী, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি ছিল এ-বিষয়ে অগ্রগণ্য। এদের মধ্যে ভারতীর আসরে আমার এবং বন্ধু বাণীকুমারের গতায়াত ছিল। নিয়মিত না হলেও, প্রায়ই। আমাদের সর্বজনপ্রিয় হেমেনদা অর্থাৎ হেমেন্দ্রকুমার রায়—যিনি ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, কিশোর ও শিশুসাহিত্যে কুশলী এবং সংগীতরচয়িতা —এখানে নিয়মিত আসতেন। আর আসতেন—সাহিত্যজগতের

সেকালের অনেক দিক্‌পাল—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (আমাদের বুড়োদা) এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। কৈলাস বসু স্ট্রীট-(বা সুকিয়া স্ট্রীট) এর সেই জম্‌জমাট আড্ডায়, আগেই বলেছি, আমি ও বন্ধুবর বাণীকুমার (৺বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য) মাঝে মাঝে গিয়ে পড়তাম। এইখানেই কেষ্টদাকে নিয়ে একটি ভারি মজার ঘটনা ঘটেছিল, সেইটি বলার জন্যই এত কথার অবতারণা।

কিন্তু তার আগে একটা অন্য স্মৃতির কথা বলি। পরলোকগত গুরুজন-মহাজনদের কাছে মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নিই। তারপর নিচুগলায় বলি—এই 'ভারতী'র আসরেই একদিন এক স্মরণীয় উৎসব দেখেছিলাম। আমি ও বাণীকুমার গিয়ে পড়েছি. গিয়ে দেখি সেদিন প্রাগুক্ত অনেকেই উপস্থিত রয়েছেন, দিনুবাবুও বাদ নেই। ঘরে রীতিমতো এক Carouse-এর আয়োজন। বিশাল এক জমকালো Bowl-এ বিদেশিনী বারি-সুন্দরী টল্‌টল্‌ করছেন, মাঝখানে ভাসছে একটি অপরূপ Black Prince জাতীয় গোলাপ ফুল। ও'রা সব তখন নিজ নিজ ওষ্ঠে রূপার Straw লাগিয়ে সমুদ্রশোষণে নিযুক্ত। টানের জোরে গোলাপটি যাঁর স্ট্রতে গিয়ে ঠেকবে তিনিই বিজয়ীর মর্যাদা লাভ করবেন।

আমরা দুজনে সেদিন শ্রদ্ধেয় অগ্রজদের এই তরলোৎসব বিস্ফারিত নয়নে অবলোকন করতে করতে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম!

ঠিক এমনটিই আর একদিন গিয়ে পড়েছিলাম। আড্ডা জমেছিল চা, মুড়ি, ভাজাভুজি সহযোগে। এমন সময় কেষ্টদা এসে উপস্থিত হলেন তাঁর শিষ্য ও নিত্যসঙ্গী বলাই ভট্টাচার্যের কাঁধে ভর দিয়ে। তাঁর সঙ্গে ছিল একটি পোর্টে-বল গ্রামোফোন।

ঘরে ঢুকেই কেষ্টদা বললেন—হেমেন, হেমেন, তোমার লেখা গানের রেকর্ডটা বেরিয়েছে, কেমন গেয়েছি শোন।

কেষ্টদাকে দেখেই আমরা সব চেপেচুপে বসে তাঁর বসার জায়গা করে দিলাম।

হেমেনদা শশব্যস্ত হয়ে বললেন—আরে বসো বসো কেষ্ট, এই তো দিনু-বাবুও উপস্থিত আছেন, ভালোই হলো।

শুনেই কেষ্টদা ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন—দিনুবাবু? কই, কোথায় তিনি? কী সৌভাগ্য আমার!

অনেক কষ্টে কেষ্টদা হাতড়ে হাতড়ে দিনেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করলেন, তারপর করজোড়ে বললেন—কী ভাগ্য আমার, দিনুবাবু আমার প্রণাম নিন্।

দিনুবাবুও সোচ্চারে 'নমস্কার, নমস্কার' বলে প্রতিনমস্কার করলেন।

কেষ্টদার গাওয়া গানটি ছিল হেমেন্দ্রকুমার রচিত—'বঁধু, চরণ ধরে বারণ করি, টেনো না আর চোখের টানে।'

কেষ্টদার আদেশে বলাইবাবু রেকর্ডখানা চালিয়ে দিলেন। গান বেজে উঠলো। কেষ্টদার কণ্ঠে 'ভারতী' র অপরিসর ঘরখানি গম্ গম্ করে উঠলো।

অপূর্ব কণ্ঠ তাঁর। যেমন বলিষ্ঠ, তেমন মধুর ও কারুকর্মময়! সুরের নর্তন আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়ে অবশেষে স্তব্ধ হলো।

মাঝে মাঝে গানটিতে সাপাট তান দিয়েছিলেন কেষ্টদা। 'টেনো না আর চোখের টানে' – বলার পরই 'এ্যা বঁধু' বলে দাপটের সঙ্গে টান। সে কী টান!

তাঁর গানে তো আমরা সকলেই মুগ্ধ। হেমেনদা সরবে 'আহা' 'ওহো' করতে লাগলেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য, চুপ করে রইলেন দিনেন্দ্রনাথ। বলা বাহুল্য, গান শুনিয়ে দিনেন্দ্রনাথের মন্তব্য না শুনতে পেলে যে কোনো শিল্পীরই বিচলিত হবার কথা, কেষ্টদার তো বটেই। কেষ্টদা বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন—কিন্তু দিনুবাবু, আপনি তো কিছু বলছেন না। আপনার কেমন লাগল বলবেন না?

দিনুবাবু জবাব দিলেন—এঁ্যা, কই, লাগেনি তো!

কেষ্টদা বুঝতে পারলেন না একথার মানে। আমরাও বুঝে উঠতে পারিনি। কেষ্টদা সঙ্কুচিত হয়ে তাড়াতাড়ি ধুতির কোঁচা সামলে নিয়ে জড়সড় হয়ে বললেন—কী বললেন? লেগে গেছে? অজান্তে বোধ হয় লেগে গেছে, মনে কিছু করবেন না আপনি।

কিন্তু দিনবাবুর আবার সেই রহস্য! আবার বললেন—আরে না, না, লাগে নি তো!

এবারে কেষ্টদা একেবারেই বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

হেমেন্দ্রকুমার তখন দিনুবাবুকে লক্ষ করে বলে উঠলেন—দিনুবাবু, কেষ্ট জানতে চাইছে, ওর গানটা আপনার কেমন লাগল। আপনি একটা কিছু বলুন।

দিনেন্দ্রনাথ আবার সেই একই কথা বললেন—লাগে নি তো।

এবারে হেমেনদা-কেষ্টদাসহ আমরা সকলেই হতভম্ব হয়ে দিনুবাবুর রহস্যের অর্থভেদ করার নিষ্ফল চেষ্টা করতে লাগলাম।

কয়েক মুহূর্ত পরেই দিনুবাবু আবার মুখ খুললেন, এবার আর রহস্য করলেন না। বললেন—কেষ্টবাবু, আপনার গলা অপূর্ব, গান সুন্দর হয়েছে, আপনার কণ্ঠের কাজ নিয়ে বলার কিছু নেই। কিন্তু এ-গানের গায়কী কোথাও কোথাও একটু অন্যরকম হওয়া উচিত ছিল না কি? মাঝে মাঝে এমন তান দিয়েছেন যে পুরো গানটাই মারা গেছে। বঁধুকে চরণ ধরে মিনতি করছেন, কিন্তু এই ব্যাকুলতার ভাবের মধ্যে 'এ্যা বঁধু' বলে অমন ধোবীর পাট ছেড়েছেন কেন? এতে গানের স্পিরিট্‌টাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, নয় কি? আপনি এত বড় গায়ক, খুঁত ধরতে ভয় করে, তবু বলতে বাধ্য হলাম—লাগে নি তো!

কৃষ্ণচন্দ্র দে, সে-যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কণ্ঠশিল্পী, দিনেন্দ্রনাথের এত তীক্ষ্ন সমালোচনা শুনেও এতটুকু ক্ষুণ্ন হলেন না। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-বাড়ির ছেলে। তিনি সংগীতবিষয়ে পণ্ডিত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারী। তথাপি, কণ্ঠ-শিল্পী হিসাবে কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন অনেক বড়। কিন্তু সেই তিনিও এই সমালোচনায় মোটেই আহত হলেন না। বরং যেন লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলেন। বললেন—তাই তো, তাই তো, একথাটা তো আমার ভাবা উচিত ছিল, এমন করে তো কখনো ভাবিনি · খুব ভুল হয়ে গেছে···

এই রকম মানুষ ছিলেন আমাদের কেষ্টদা। অত বড়ো শিল্পী, কিন্তু এতটুকু অহমিকা নেই, কতখানি মহৎ বিনয়ের সঙ্গেই না তিনি ওই মন্তব্যটি স্বীকার করে নিলেন!

৬

দিনুবাবুর সেই সরস রহস্য—'কই লাগেনি তো'—সঙ্গীতরস পরিবেশন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য উক্তি। সঙ্গীত-বিষয়ে উপলব্ধির পরিপূর্ণতা ঘটলেই তবে মানুষ এই ধরণের উক্তি করার যোগ্যতা অর্জন করে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, তাঁর এই উচ্চারণ কাব্যসঙ্গীত-শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের কাছে বীজ-মন্ত্রের মতোই মূল্যবান। আমাকে তো সারা জীবন ধরেই এই উক্তিটি পথ-প্রদর্শন করেছে। এমনকি কৃষ্ণচন্দ্রের মতো অসাধারণ কণ্ঠশিল্পীও কথাটিকে কতখানি সম্মান ও বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তাও বললাম।

রবীন্দ্রনাথের গানে তথা আধুনিক বাংলা কাব্যসঙ্গীতের জগতে দিনু-বাবুর প্রভাব ওদান, আমার মতে তাঁকে আক্ষরিকভাবে দিনেন্দ্রনাথ বা সূর্য-দেবের মতোই মর্যাদা দিয়েছে। আক্ষেপ হয় যখন দেখি তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনও পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা হলো না। আমরা কণ্ঠশিল্পী মাত্র। সে-কাজ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা সঙ্গীত বিষয়ে তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক অনুসন্ধানী এবং লেখনীচালনায় পটু তাঁরা কেউ এই অসামান্য সংগীতগুরুকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও আলোচনা আজ পর্যন্ত কেন করেন-নি জানি না।

যাক সে-কথা। 'সীতা' নাটক তো বাড়ির বড়দের সঙ্গে দেখে এলাম ইডেন গার্ডেনে। গান শুনলাম দিনেন্দ্রনাথের আরোপিত সুরে, কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠে। মনের মধ্যে গুন্‌ গুন্‌ করে ফিরতে লাগল—'মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে', 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে' ইত্যাদি। লক্ষ্মীদা, আনন্দ পরিষদের লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র, বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান শিখতে গেলে দিনেন্দ্র-নাথের কাছে যেতে হবে। 'সীতা' দেখে এসে ঐ কথাটা মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। এ আমার কলেজ জীবনের প্রথম দিকের কথা। পূর্ব অধ্যায়ে 'ভারতী' পত্রিকার আসরের যে-সব কাহিনী বলেছি এ তারও অনেক আগের কথা।

মনে পড়ে, এর পর একদিন আমি ভরসায় বুক বেঁধে একাই চলে গিয়েছিলাম

দিনেন্দ্রনাথের কাছে। 'সীতা' দেখার কয়েকদিন পরেই। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, কোনও পরিচয়পত্র নেই, নিজস্ব কোনো গুণগরিমাও নেই। সম্বল খানিকটা দুঃসাহস মাত্র।

দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পৌত্রসম্পর্কীয়। কবির জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্র-নাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ—তাঁরই পুত্র দিনেন্দ্রনাথ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মানুষেরা তাঁদের যে কন্দর্পকান্তি রূপের জন্য বিখ্যাত, প্রকৃতির খেয়ালে কোথাও কোথাও তার কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছিল। দিনেন্দ্রনাথ তারই একটি নিদর্শন ছিলেন।

পথ চিনে প্রথম যখন দিনেন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছালাম, তখন শ্যামবর্ণ স্থূলাঙ্গ মানুষটিকে চিনতে পারিনি। কিন্তু ভয়ে ভয়ে যখন তাঁর কাছে আপন পরিচয় নিবেদন করলাম এবং আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম তখন তাঁর বাক্‌-ভঙ্গি থেকে বুঝলাম যে আমি এক প্রবল ব্যক্তিত্বের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছি। শশব্যস্ত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে আমি তখন আম্‌তা আম্‌তা করছি। উনি একটি আরাম-কেদারায় বসেছিলেন, বললেন—হ্যাঁ, আমিই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কী চাই তোমার ?

আমি বললাম—আজ্ঞে, আমি একটু আধটু গান গাইতে পারি, রবিবাবুর গান শেখার বড় ইচ্ছে আমার। শুনেছি আপনার কাছেই শিখতে হয়, তাই এসেছি।

—বটে, গান জানো ? কী গান জানো ?

—আজ্ঞে এই নানা ধরণের গান, যাত্রা, পালা, থিয়েটারের গান···

—থিয়েটার! তুমি থিয়েটার দেখো ?

খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ, তখনকার দিনে ছেলে-মেয়েদের থিয়েটার দেখা গুরুজনদের চোখে দুষ্কর্ম বলে নিন্দিত হতো।

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে সম্প্রতি 'সীতা' দেখেছি মা, পিসিমা, জ্যাঠাইমা প্রভৃতির সঙ্গে।

দিনেন্দ্রনাথ জলদ্‌-গম্ভীর স্বরে বললেন—আচ্ছা, তুমি বোসো।

তারপর একটু থেমে বললেন—ভালো করে বসে একটা গান শোনাও দিকি।

নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় এবং বিনা হারমোনিয়মে

গান ধরলাম 'মঞ্জুলে মঞ্জরী নব সাজে'।

বিশেষ করে এই গানটি গাওয়ার পিছনে আমার একটু চাতুরি ছিল। আগেই বলেছি 'সীতা' নাটকের প্রধান সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ, সুতরাং এ গানে তাঁরই দেওয়া সুর। নিজের গান শুনে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন, আমাকে বিমুখ করতে পারবেন না।

দিনেন্দ্রনাথ চুপ করে শুনলেন আমার গান। শেষ হলে বললেন—গানটি তো দিব্যি তুলে নিয়েছ! ·আচ্ছা···তোমাকে রবিদার একটা গান শিখিয়ে দিচ্ছি। চুপ করে বোস।

তারপর গীতাঞ্জলি খুলে আমায় একটি গান পড়তে দিলেন—ধ্রুপদাঙ্গের সেই বিখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীত—'হেরি অহরহ, তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে'।

বললেন—দেখো, রবিঠাকুরের গান যদি শিখতে চাও তো মনে রেখো আগে গানের বাণী ও ভাবটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে হবে। বার বার পাঠ করে বাণীবাহিত ভাবটুকুকে কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করাতে হবে। তারপর সুরের শিক্ষা। বুঝলে? · ভাব না বুঝে লাইন ধরে ধরে সুর নকল করলে আর যাই হোক রবিঠাকুরের গান শিখতে পারবে না। দেখি গানটা বেশ ভালো করে পড় তো, শুনি। বেশ ধীরে ধীরে অর্থ বুঝে বুঝে পড়বে। তারপর পড়া শেষ হলে যখন সুর তুলবে, দেখবে ভাবের সঙ্গে সুরের কী আশ্চর্য মিলন, —যেন যুগলসম্মিলন পুরুষ ও প্রকৃতি, রাধা ও কৃষ্ণ। দুই-এর মিলনেই পূর্ণতা! যাক্, এত কথা এখন বুঝবে না, এখন পড় তো।

ভাষাটা অবিকল এই না হলেও, এমন কথাই তিনি বলেছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথের আদেশে আমি পড়তে লাগলাম—

'হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে,
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে আকাশে সাগরে সাজে হে।···'

পড়ি, আর দিনুবাবু মাঝে মাঝে বাধা দেন—ঠিক হচ্ছে না, হলো না। এই রকম বলে নিজে খানিকটা খানিকটা আবৃত্তি করে যান। তারপর থেমে গিয়ে বলেন—এইবার ঠিক করে পড়ো। আবার মাঝখান থেকে পড়তে সুরু করি আমি। ঠিক মতো যতি দিয়ে নির্ভুল ভঙ্গিতে পড়ে ভাবকে আয়ত্ত করা এবং ভাবকে আয়ত্ত করতে করতে আরও নির্ভুল ভাবে পড়তে পারা—কবিতা বা

গীতিকবিতাকে ধরে এই ভাবে এগোতে হয় একথা এই প্রথম জানলাম। আমার কবিতা ও কাব্যসংগীত পাঠের হাতেখড়ি বা সূচনা হলো।

এই সুগম্ভীর গীতটির সমগ্র ভাবটিকে আয়ত্তের মধ্যে আনা আমার সেই বয়সের পক্ষে কখনোই সম্ভবপর ছিল না। তথাপি, গানের ভাবলোকের দেহলি-প্রান্তে অন্তত দাঁড়াতে পেরেছিলাম দিনুবাবুর শিক্ষার গুণে। তাঁর এই শিক্ষাদান পদ্ধতি সেকালে বিরল ছিল। এভাবে কেউ করাতেন না, আর বোধ-হয় কেউ ভাবতেনও না।

আগে ভাবকে এই ভাবে আত্মস্থ করা ও তারপরে সুরকে প্রয়োগ করা—কাব্যসংগীতকে নিয়ে পরবর্তীকালে শুধু আমার কেন, অন্যান্য যতো শিল্পী এসেছেন, তাঁদের সকলের ভাবনা, চিন্তা, শিক্ষা ও শিক্ষণ দিনুবাবুর এই নির্দেশ মেনে নিয়েই অগ্রসর হয়েছে।

অনেকে আমায় প্রশ্ন করেছেন—আমি 'আকাশবাণী'তে আমার 'সংগীত-শিক্ষার আসর'-এ গান শেখাবার আগে অতবার পড়ি কেন। বানান করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ভেঙেচুরে, অর্থনির্দেশ করে কেন অতবার পড়ি ও পড়াই?—বস্তুত এটা হচ্ছে দিনেন্দ্রনাথের কাছে আমার ওই শিক্ষার ফল। তাছাড়া আমি মনে করি বাংলা কাব্যসংগীত শিক্ষাদানের এর চাইতে ভালো পদ্ধতি আর কিছু নেই, হতে পারে না। তাই সারা জীবন ধরে দিনুবাবুর নির্দেশই মেনে নিয়েছি। রবীন্দ্রসংগীত বা বাংলা সংগীতের জগতে দিনুবাবুর চাইতে বড় শিক্ষক আর কেউ হন্‌নি বলেই আমার বিশ্বাস।

যাই হোক, সেদিন তো রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারীর কাছে অপটু কণ্ঠে পড়তে লাগলাম—

> 'সারা নিশি ধরি তারায় তারায় অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
> পল্লবদলে শ্রাবণধারায় তোমারি বিরহ বাজে হে।
> ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায় তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়
> কত প্রেমে হায়, কত বাসনায়, কত সুখে দুখে কাজে হে।
> সকল জীবন উদাস করিয়া, কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া,
> তোমারি বিরহ উঠেছে ভরিয়া আমার হিয়ার মাঝে হে॥'

বহু চেষ্টার পর আমার পড়া তো তাঁর কাছে কোনোমতে গ্রহণযোগ্য হলো। এর পরে সুরের ব্যাপার। গানের ভাণ্ডারী এবার সুরের কাণ্ডারী হয়ে একটু

একটু করে গেয়ে গেয়ে আমায় সুর তোলাতে লাগলেন। একদিনে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না। যতটা হলো তা তাঁকে শুনিয়ে, অনুমোদন পেয়ে সেদিনকার মতো নিষ্কৃতিলাভ করলাম।

সেদিন স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে রবিবাবুর গান শেখার সূচনা হলো আমার—এই ভেবে হৃদয়-মন নৃত্যপর হয়ে উঠেছিল। সেদিন চলে এলাম, কিন্তু আবার কয়েক দিন পরে গিয়ে হাজির হলাম। কালক্রমে একটি একটি করে অনেক গান তাঁর কাছে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু গান তোলা বললেই সবটা বলা হয় না। তাঁর কাছে আসা-যাওয়া মানেই ছিল একটা সর্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ করে আসা—কাব্যে, সঙ্গীতে, রসগ্রহণ পদ্ধতিতে। গান ও সুর ছিল সহজাতভাবে তাঁর শিরায় শিরায়, আর সেই সঙ্গে ছিল কঠোর নিয়মানুবর্তী শিক্ষকের দাপট। রবীন্দ্রনাথ যোগ্য ব্যক্তিকেই তাঁর গানের ভাণ্ডারী ও সুরের কাণ্ডারী নিয়োগ করেছিলেন।

সুর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ছিল একটা ঐশী বোধশক্তি—সুরকে বোঝবার, ধরে ফেলার, গঠন করার যে-ক্ষমতা কবিগুরুর ছিল, তা তিনি কোনো অধীত বিদ্যার সাহায্যে পাননি, পেয়েছিলেন সহজ অনুভূতির মধ্যে, বিধাতার আশীর্বাদে। দিনেন্দ্রনাথ, আমার বিশ্বাস, উত্তরাধিকারসূত্রে বিশ্বকবির এই আশ্চর্য শক্তির বেশ কিছু অংশ লাভ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে নিজের চোখে দেখা একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। ঘটনাটি অবশ্য দিনেন্দ্রনাথ-বিষয়ক নয়, রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত। কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনা করছি না আমি, তাই এ ঘটনা অনেক পরবর্তীকালের হলেও এই অধ্যায়েই তা বর্ণনা করতে দ্বিধা করছি না।

কবি গেয়েছিলেন—'মেঘ রঙে রঙে বোনা/আজ রবির রঙে সোনা/আজ আলোর রঙ যে বাজলো পাখির রবে।'—এই ধরণের চিত্রকল্পের ব্যবহার সে-যুগের গীতিকবিতায় এক আশ্চর্য অভিনবত্ব বটে! যা কিনা দর্শনেন্দ্রিয়ের ব্যাপার তা পাখির রবে বেজে উঠে শ্রবণগ্রাহ্য হয়ে ওঠে বিশ্বকবির লেখনীতে।

কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি আপাত পৃথক হলেও তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে অন্তরের পরিপূর্ণ রসগ্রহণের প্রবেশপথ। এইটেই বড়ো কথা। সৌন্দর্য বস্তুটি কোন্ ইন্দ্রিয়ের পথ বেয়ে এসে অন্তরের অন্তস্তলকে রসাপ্লুত করে দিচ্ছে, সেটা বড়ো কথা নয়। যে-পথ দিয়েই হোক তা অন্তরে প্রবেশ করছে ও গৃহীত হচ্ছে।

যিনি আলোর রঙের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকে পাখির কূজনের ধ্বনিময়তায় রূপান্তরিত হতে দেখেন, শ্রবণনির্ভর সুরলহরীকে তিনিই পারেন দর্শন দিয়ে উপভোগ করতে।

সংগীত ও সিনেমার প্রয়োজনে কবির সঙ্গে অনেক বার সাক্ষাৎ করতে হয়েছে আমাকে। কখনো জোড়াসাঁকোয়, কখনো শান্তিনিকেতনে, কখনো বা মহলানবীশ-দম্পতির গৃহে। একবার এইরকম উপস্থিত হয়েছিলাম প্রশান্ত মহলানবীশ মহাশয়ের বরানগরের গৃহ 'আম্রপালী'তে। কবি তখন সেখানে অধিষ্ঠিত। দোতলার বারান্দায় চেয়ার পাতা রয়েছে, বসে আছেন স্বয়ং কবি, শ্রীমতী নির্মলকুমারী (রাণী) মহলানবীশ এবং অন্য এক অপরিচিত ব্যক্তি, একটি এসরাজ নিয়ে। শ্রীমতী মহলানবীশ আমাকে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। সেই আসরে তখন আমি হলাম চতুর্থ ব্যক্তি। শুনলাম, এসরাজধারী ব্যক্তিটি ওই পাড়ারই একজন দোকানদার, একটি মুদিখানার মালিক। এসরাজ বাজানোর শখ তাঁর। কবি এখানে অবস্থান করছেন জেনে তাঁর নিজের বাজনা কবিকে শোনাবার জন্য তিনি ব্যাকুল। বলা বাহুল্য, কবিও রাজি হয়েছেন। মানুষের প্রতি অপরিসীম মমতা তাঁর, সকলের কাছেই তিনি ছিলেন মুক্তদ্বার। তাঁর ঘনিষ্ঠরা কেউ কেউ হয়তো কখনো কবির কাছে পেঁছানোর ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন কিন্তু কবির ছিল—

'অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥'

সেদিন সেই সামান্য দোকানদারের এসরাজবাদন শুনছিলেন স্বয়ং বিশ্বকবি। খানিকক্ষণ বাজনা চলার পর শ্রীমতী মহলানবীশ আমার কাছে এসে চুপি চুপি শুধালেন— ওটা কী সুর, পঙ্কজবাবু?

আমি ফিস্ ফিস্ করে বললাম—ইমনকল্যাণ।

বাজনা শেষ হলে শ্রীমতী মহলানবীশ কবিকে মৃদুস্বরে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—বলুন তো কী সুর ওটা?

এখানে বলে রাখি, কবি তখন কানে কম শুনতে আরম্ভ করেছেন। প্রশ্নটা শুনেই অসহায় বোধ করলেন। সুরটা কী ছিল তা ধরে নেবার মতো স্পষ্ট-ভাবে তিনি শুনতে পাননি। তাই প্রশ্নটি শুনে একটু থেমেই তিনি বাদককে বললেন—আচ্ছা, আর একবার বাজাও তো।

তারপর যেই আবার সেই বাজনা সুরু হলো, কবি অপলক নেত্রে চেয়ে রইলেন সেই নার্ভাস বাদকের সঞ্চরণশীল অঙ্গুলিগুলির দিকে। আমি তখন বিস্মিত হয়ে চেয়েছিলাম কবির নিষ্পলক নয়নযুগলের দিকে। কোনো মানুষ যে একটানা দু'মিনিট বা তারও বেশি সময় নিমেষহারা চক্ষে চেয়ে থাকতে পারে তা আমি সেই প্রথম দেখলাম। মনে হলো যেন তাঁর স্থির স্তব্ধ ও সন্ধানী চোখ দিয়েই কবি শ্রবণের কাজ করে যাচ্ছেন।

ঠিক তাই। কবি বলে উঠলেন—ইমনকল্যাণ।

কবির কথায় সেদিন চমৎকৃত হয়েছিলাম। কানে শুনতে পেলেন না, শুধুমাত্র চোখ দিয়ে আঙুলের খেলা দেখেই এমন নির্ভুল ভাবে সুর-নির্ণয় করলেন কবি।

আমাদের আদি ভাষা সংস্কৃতে একটি শব্দ আছে—'অক্ষিশ্রবা'। এ-শব্দের অর্থ সর্প। প্রচলিত ধারণা এই যে সর্পের একটি ইন্দ্রিয় কম, তার শ্রবণেন্দ্রিয় নেই। চোখ দিয়ে সে শোনে। এ-জন্যই তার নাম 'অক্ষিশ্রবা'।

সেদিন কবিকে দেখে আমার এই শব্দটি বার বার মনে পড়ছিল।

৭

'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটির কথা আগেই বেশ কিছু বলেছি। আর একটু বলি।

১৯৩৫ সালে নিউ থিয়েটার্স-এর প্রযোজনায় প্রখ্যাত পরিচালক-অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া মহাশয় 'মুক্তি' ছবিটি তুলতে সুরু করেন। সে-যুগের নিরিখে এই ছবির পরিকল্পনা ছিল যুগান্তকারী। বড়ুয়া সাহেব আমাকে এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বই শুধু দেননি, সেই সঙ্গে গায়ক-অভিনেতার ভূমিকাও দিয়েছিলেন এবং এই ছবির প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করা ও তাঁর আশীর্বাদ যাচ্ঞা করে আনার ভারও আমার উপর ন্যস্ত করেছিলেন। এই সুযোগেই 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটির জন্য কবির কাছে পাকাপাকি অনুমোদন লাভ করি এবং গানটিকে 'মুক্তি' ছবিতে ব্যবহার করি ও গ্রামোফোনের ডিস্কে প্রকাশ করি। আমার জীবনের পরম তৃপ্তিগুলির একটি হচ্ছে এই যে কবির জীবদ্দশাতেই আমি তাঁর কবিতায় সুরারোপ করে তাঁর অনুমোদন পেয়েছি ও রেকর্ড করেছি। তাছাড়া, অ-রবীন্দ্রিক কাহিনী-চিত্রে এই গানটি ছাড়াও বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীতকে সর্বপ্রথম আমিই প্রয়োগ করেছি কবির অনুমতি আদায় করে। এর জন্য জনচিত্তের আশীর্বাদ আমি কম লাভ করিনি। 'দিনের শেষে' গানটি বহু দশক ধরে রবীন্দ্ররসপিপাসু শ্রোতাকে অনাবিল আনন্দ দান করেছে। বাঙালি শ্রোতা-সাধারণ গানটিকে রবীন্দ্রসংগীত হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। তথাপি, এ-ও সত্য যে, গানটি প্রকৃতরূপে রবীন্দ্রসংগীতের মর্যাদা লাভ করেনি। এটি গীতবিতান-বহির্ভূতই থেকে গেছে।

শুধুই কি তাই? আমার জীবন-সায়াহ্নে এসে একথাও শুনতে হয়েছে যে এর সুর অন্য কোনো সুরজ্ঞ-কর্তৃক প্রদত্ত!

মন্দভাগ্য পঙ্কজ মল্লিক সারা জীবন ধরে তার বহু সুরকে অন্যের বেদীতে আহুতি দিয়েছে, নানান্ অপরিহার্য কারণে। বহু সিনেমার সংগীত-পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি ঘটেছে। আবার, অন্য এক বিখ্যাত রবীন্দ্রকবিতার ক্ষেত্রেও

তা ঘটেছে!

আমার এই সন্ততিগুলি যাঁদের বেদীতে সমাধিস্থ হয়েছে তাঁরা আমার সমসাময়িক বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় এবং তাঁদের বিভিন্ন গুণাবলীর জন্য আজও আমি তাঁদের বন্ধু বলে স্বীকার করে আনন্দ পাই। তাঁরা কেউ মার্গসংগীতে কৃতবিদ্য, কেউ বা রবীন্দ্রসংগীত-তত্ত্ব-চর্চায় উচ্চাসনের অধিকারী। আমি মনে করি না যে তাঁরা কেউ এতে লাভবান্ হয়েছেন। কারণ স্ব স্ব প্রতিভার জোরেই তাঁরা বহুমানিত। তবে আমি যে সন্তান হারানোর বেদনায় জর্জরিত এ-কথা আমি বেশ জানি।

শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজপ্রতিম, স্বনামধন্য রবীন্দ্রবিশারদ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ যে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটি গীতবিতানে কেন সন্নিবিষ্ট হবে না, এই প্রশ্ন তিনি তাঁর সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। সে কথা প্রসঙ্গান্তরে বলার বাসনা রইল।

যাই হোক, কবি যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁর সংগীতপ্রচারে কখনো কোন বাধার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়নি। আমি জানি যে, চিরদিনই আমি সামান্য এক দল-বিহীন, গোষ্ঠীবিহীন শিল্পী। তাই কবির কাছাকাছি থাকতেন এমন অনেকেই আমার রবীন্দ্রসংগীত-প্রচারকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন না। কত কথাই না তখন তাঁদের উদ্যোগে লোকমুখে প্রচার করা হতো আমার সম্পর্কে। সেযুগের সে-সব কথার প্রসঙ্গে এ-যুগের সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করতে প্রলুব্ধ হচ্ছি।

পত্রটি কলকাতার প্রখ্যাত ইংরেজি দৈনিক The Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত (২১ ৯. ৭৫)। পত্রলেখক 'প্রদোষ দাশগুপ্ত'। চিঠিতে প্রকাশিত তথ্যের থেকেই বোঝা যায় ইনিই স্বনামধন্য প্রবীণ ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত মহাশয়। তিনি লিখছেন —

...Referring to the controversy on the true style of Tagore songs, in any creative expression, the style differs from one personality to another. The rendering in each case becomes an original one, within, of course, the basic framework of the song. The straightjacket of Tagore songs is the creation of a coterie of die-hards, who have monopolized the right of putting the stamp

of approval on them. This attitude emanates from the possessive instinct, contrary to the spirit of universalism that Visva Bharati is supposed to embody.

...This reminds me of an incident which I think is revealing. In July, 1940, Rabindranath gave me a few sittings at Santiniketan for a portrait bust I was commissioned to do. During one such sitting, some records of his songs and recitations produced by Gramophone Companies were brought before him for his approval. Some of the "exponents" of Tagore music present put up a stout oppostion particularly against two of the records. Tagore quietly asked them to play the records One of the records was by Pankaj Mullick who sang a Tagore song delightfully in his sonorous voice and the other a recitation by Nirmalendu Lahiri, the famous stage actor.

I saw that Rabindranath enjoyed listening to them. Only in the case of the recitation, Tagore remarked that there was a little too much drama in it. This was true, but then that was Nirmalendu's style and Rabindranath, a true artiste, was above pedantry. He approved of both the discs, dismissing the so-called exponents with his usual kind smile..... PRADOSH DAS-GUPTA, New Delhi, Sept. 8.

বন্ধুবর প্রদোষ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটেনি। তবে তাঁর ভাস্কর্য-শিল্পের আমি একজন অকৃত্রিম গুণগ্রাহী। তাঁর চিঠিতে তিনি আমার কণ্ঠের প্রতি যে মমতা ও প্রীতি প্রকাশ করেছেন, তার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি যত দূর আন্দাজ করতে পারি, প্রদোষবাবু যে রেকর্ডখানির কথা বলেছেন তার একটি গান ছিল—

—'যৌবন সরসী-নীরে মিলন শতদল'।

আমার মনে হয়, প্রদোষবাবু কথাটাই বলেছেন যে এটা ছিল একটা সংকীর্ণ

গোষ্ঠীসর্বস্ব একচেটিয়া দখলদারীর মনোভাব। এই মনোভাব থেকে আজও কেউ কেউ মুক্ত হতে পারেননি। বিশ্বভারতীর যে বিশ্বজনীনতার আদর্শ ছিল কবিগুরুর জীবনসাধনা, এ-মনোভাব তার অপরিসীম ক্ষতি-সাধন করেছে।

* *

সুরের, ছন্দের ও তালের অধিপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এমন সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা এসেছি, যখন তাঁর গানে তবলার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। এসব কথা আরও আগেকার। এই শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষার্ধ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে তবলার ব্যবহার হয়নি। আমার মাঝে মাঝে বিস্ময় লাগত, এমন যে অতুলনীয় গীতি, এতে যদি তবলার মৃদু, স্নিগ্ধ বাঁধুনি না থাকল তো কিসে থাকবে? আমার ধারণা, এ-ক্ষেত্রেও ক্রিয়া করতো ঐ একই ধরণের ছুৎমার্গী মনোবৃত্তি, যা একদল 'মনোপলিস্ট্' এর মধ্যে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। এঁরাই কবিকে ঘিরে রাখার চেষ্টায় দিনভোর ব্যাপৃত থাকতেন। তথাপি বলি, কবি যতদিন তাঁর প্রিয় মধুময় এই পৃথিবীর ধূলিতে সশরীরে বিরাজমান ছিলেন, ততদিন তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা, আত্ম-নিয়োজিত রবীন্দ্র-অভিভাবকেরা শত চেষ্টা করেও তাঁর কথার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। প্রদোষবাবু যথার্থই বলেছেন যে কবি ছিলেন পণ্ডিতিয়ানার অনেক উর্ধ্বলোকের মানুষ, যথার্থ শিল্পী তিনি। তাঁর প্রসন্ন আস্যের একটি মৃদু অভিব্যক্তি মানুষের মনের আকাশে মুক্তির পবন বইয়ে দিত। 'ভয় হতে···অভয় মাঝে'—'নূতন জনম' দান করত।

কবি নিজে যে-সমাজের অন্তর্গত ছিলেন সেই সমাজ যে বিশৃঙ্খলতাবাদী হতে গিয়ে এক ধরণের গোঁড়ামির আবর্তে পড়ে গিয়েছিল এ-কথা ঐতিহাসিক সত্য। এই কথাটি স্বয়ং কবি যতটা অনুধাবন করেছিলেন, তেমন আর ক'জনই বা পেরেছিল? নিজে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়েও 'গোরা'র মতো এপিক উপন্যাসে কবি তাঁর মনোভঙ্গিকে অপূর্ব স্বচ্ছদৃষ্টি ও মুক্ত মানসিকতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।

সে যাই হোক, তবলা সম্পর্কে একটা অনীহা বা দ্বিধা নানা দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গানকে খণ্ডিত করে রেখেছিল। হয়তো বা চপল নৃত্য-গীত-রঙ্গের উপাদান মনে করেই এই অতিপ্রয়োজনীয় ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রটিকে কবিগুরুর গানে অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছিল। এর পিছনে একটা 'holier than thou' মনোভাব ক্রিয়াশীল ছিল বলেই আমার ধারণা।

তাঁর গানে কিছুটা ব্যুৎপত্তি অর্জন করার পরই তবলা-ব্যবহারের প্রশ্ন নিয়ে আমার মনটা প্রায়ই আলোড়িত হতো। মনে হতো, এমন সুধাময় সঙ্গীতে তবলাসংগত না থাকলে এর পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে কী করে? তাই ধীরে ধীরে আমার প্রয়াস সুরু হয়েছিল এ-ব্যাপারে কবির অনুমতি আদায়ের দিকে। বলা বাহুল্য, তাঁর গানের ব্যাপারে আমার কাণ্ডারী ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। তাঁর মাধ্যমেই আমার আবেদন কবির কাছে পাঠিয়েছিলাম।

এই নিয়ে সামান্য একটু টানা-পোড়েন যখন চলছে, তখন, মনে পড়ে, একটা কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটে গেল। পূণ্যশ্লোক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র শ্রদ্ধেয় সংগীতসাধক দিলীপকুমার রায় মহাশয় আকস্মিকভাবে, কবির অনুমতি না নিয়েই (যত দূর মনে পড়ে) তবলা-সহযোগে কবির একটি গান রেকর্ড করে বসলেন। এই ঘটনার উদাহরণও দিনুবাবুর কাছে পেশ করেছিলাম। এমনি ভাবেই আস্তে আস্তে বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল, কবির সুরে তবলার বাঁধন এসে লেগেছিল। কবির গানে তবলা ব্যবহারের অনুমতি আমিই প্রথম দিনুবাবুর মাধ্যমে কবির কাছ থেকে ভিক্ষা করে নিয়েছিলাম। সে-যুগে টপ্‌পা-ঠুংরি-বাবুতন্ত্র ও বিবি-বিলাসের যে পরিবেশে তবলার ব্যবহার ব্যাপক, সে-পরিবেশ থেকে নিরপেক্ষভাবে এই বাদ্যযন্ত্রকে বিচার করা সত্যিই কষ্টকর ছিল। তথাপি গানের জগতে তবলার যে একটা প্রশান্ত ও সুগম্ভীর মর্যাদা আছে এ-কথা সে-দিন কবির কাছে নিবেদন করেছিলাম।

গানের রসহানি না ঘটলে তবলার ব্যবহারে তাঁর অনুমতি আছে একথা তিনি জানিয়েছিলেন। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

জীবনভোর আমি যত গান গেয়েছি তাতে তবলা, মৃদঙ্গ, খোল প্রভৃতি বাদ্যকে সেই প্রতিশ্রুত সংযমের সঙ্গেই ব্যবহার করেছি। কবির নিজের প্রতিষ্ঠানেও কালক্রমে তবলাবাদ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

* * *

সমান্তরালভাবে আর একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। কলকাতায় বেতার তখন 'ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী' নামে সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেসরকারী এই বেতারসংস্থার স্টেশন ডাইরেক্টর ছিলেন স্টেপ্‌লটন সাহেব। আমাদের শ্রদ্ধেয় ও সর্বজনপ্রিয় নেপেনদা (নৃপেন মজুমদার মহাশয়) ছিলেন প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর।

আমি নৃপেনদাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলাম সে সময়ে যে বেতার মারফত সাপ্তাহিক সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা একটা অভিনব অনুষ্ঠান হবে এবং বেতারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। আমার উপর নৃপেনদা আসর পরিচালনার ভার অর্পণ করেছিলেন। আমার সেই বয়সের পক্ষে এটা ছিল রীতিমতো গুরুদায়িত্ব।

দায়িত্ব গ্রহণ করে আমি বুঝলাম, সব গানই শেখাব বটে, তবে রবীন্দ্রনাথের গানকে বিশেষভাবে শেখাবার ও প্রচার করবার সুযোগ যেন দৈবযোগে আমার কাছে এসে গেল। অবশ্য এই সুযোগ নিতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন স্বয়ং কবির অনুমতি ও আশীর্বাদ, যা সংগ্রহ করার প্রয়াস তখনই সুরু করে দিলাম দিনুবাবুর মাধ্যমে। কবির আনুকুল্য দিনুবাবুর মাধ্যমেই আমার কাছে অচিরে পৌঁছেছিল।

সেপ্টেম্বর, ১৯২৯-এ বেতারে 'সঙ্গীতশিক্ষার আসর'-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পরবর্তীকালের বহু বড় বড় গায়ক-গায়িকার শিল্পী-জীবনের ভূমিকা রচিত হয়েছিল এই আসরের মাধ্যমেই। সাতচল্লিশ বছর ধরে এই আসর পরিচালনা আমিই করে এসেছি। এতদিন যে তা পেরেছি, এ-ও বোধহয় সুরের গুরু ঋষি-কবির আশীর্বাদ। 'সারাজীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ/তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ'।

দিনুবাবুর মাধ্যমে কবির কাছ থেকে প্রয়োজনমতো অনেক অনুমতিই আদায় করেছি। আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনভূমিতে তাঁর অনুমতি-অনুমোদন-গুলি ছিল 'মেঘের কলস' থেকে ঝরে-পড়া প্রসাদ-বারির মতোই—'নিখিলের সন্তাপভঞ্জন'।

কবি প্রথমেই আমায় যা জানালেন তার মর্ম এই—তোমার সঙ্গীত-শিক্ষার আসরে আমার গান শেখাতে পারো, তাতে আমি আপত্তির কারণ দেখি না, বরং আনন্দই পাবো।

শুধু সেই একটি নির্দেশ, তাঁর গানের সঙ্গে তবলার ব্যবহার যেন মৃদু হয়, সুরের সঙ্গে মিশে গিয়ে তা যেন সুরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করে, সুরকে ছাপিয়ে উঠে যেন অতিরিক্ত শব্দাবিস্তার না করে।

এমনিভাবে, নানান্ ঘটনার মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে কবির সঙ্গীতে তবলার ব্যবহার এবং যথার্থ তালের প্রয়োগ সুরু হয়।

তবলা সহযোগে তাঁর গান গাইবার, শেখাবার, রেকর্ড করার ও ছায়াচিত্রে প্রয়োগ করার অনুমতি এই ভাবেই সূচিত হয়েছিল।

আজ তবলাবিহীন রবীন্দ্রসংগীতের কথা কেউ কল্পনা করতে পারেন কি ?···

পরবর্তীকালে দেখেছি কত রকমের বাদ্যই না কবির গানে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কত বিলাতি অর্কেস্ট্রার মত্ততাই না রবীন্দ্রসংগীত সয়ে নিচ্ছে, এমনকি তাঁর জীবদ্দশাতেই সহ্য করে নিয়েছে। অথচ সেই প্রথম যুগে কেবল এই তবলার অনুমতিটুকু সংগ্রহ করতে আমার কম বেগ পেতে হয়নি।

এই ঘটনার মাত্র বছর দুই পরের একটা কথা মনে পড়ে গেল। কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তী-উৎসর্গের আয়োজন তখন চলছে দেশ-ব্যাপী। চারিদিকে সাজো সাজো রব উঠেছে। শিল্পী-সাহিত্যিক-গায়ক-গায়িকা-নৃত্য-কুশলী-অভিনেতা-কর্মী সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রস্তুত হচ্ছেন বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করার জন্য। এমনই এক প্রস্তুতিপর্বে, স্বয়ং দিনুবাবুর পরিচালনায়, যত দূর মনে পড়ে, বত্রিশ জন গায়ক-গায়িকা গানের মহলা দিচ্ছিলেন। বলা বাহুল্য, ঐ দলে আমিও একজন ছিলাম। মোট প্রায় ত্রিশ/পঁয়ত্রিশটি গান বাছা হয়েছিল।

কবির গানে তবলা-সংগতের অনুমতি তার দুবছর আগেই সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। সেই উৎসবে আমরা সকলেই তবলা ব্যবহার করেছি। তথাপি সেদিন সেই শিল্পীদের মধ্যে এক বিশিষ্টা গায়িকা, (কনক দাশ —যিনি গেয়েছিলেন— 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'), কিছুতেই তবলা নিতে সম্মত হননি।

এই সূত্রে আজ নানান্ কথা মনে পড়ে যায়। আর, তা নিতান্ত অবান্তরও বলা যায় না! প্রমথেশ বড়ুয়া মহাশয়ের বিখ্যাত ছায়াচিত্র 'দেবদাস' যখন তোলা হচ্ছিল, তখন আমাদের মনে বিশেষ এক পরিকল্পনা জেগেছিল। বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী-অভিনেতা বন্ধুবর কুন্দনলাল সায়গলকে ঐ ছবির একটি ভূমিকায় নামানো হয়েছিল। সেই প্রথম আমরা দুঃসাহসে ভর করে একটি অ-রাবীন্দ্রিক কাহিনীচিত্রে কিঞ্চিৎ রাবীন্দ্রিক ব্যাপার প্রয়োগ করেছিলাম। 'কড়ি ও কোমল'-এর একটি অনবদ্য কবিতার প্রথম পংক্তিটি (কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা) অবলম্বন করে আমার পরম সুহৃদ্ কবি বাণীকুমার একটি গান রচনা করে-ছিলেন। প্রথম পংক্তিটি ছাড়া বাকি সবটাই ছিল বাণীকুমারের রচনা (এ-

ব্যাপারে অবশ্য কবিগুরুর কাছে কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি)। অবাঙালি সায়গলের মুখ দিয়ে এই অরাবীন্দ্রিক চিত্রে কিঞ্চিৎ রবীন্দ্রবাণী-সম্বলিত এই গানটি গাওয়ানো হয়েছিল। এই কর্মের অংশীদার হিসাবে সেই তরুণ বয়সে বেশ খানিকটা গৌরব বোধ করেছিলাম।

অবাঙালি সায়গলকে বাংলা গান, তথা কবিগুরুর গান শেখাবার সুযোগ আমার ঘটেছিল এবং কালক্রমে এই অবাঙালি শিল্পী প্রায় সম্পূর্ণ বাঙালিত্ব অর্জন করে ফেলেছিলেন। তাঁর অনুপম কণ্ঠে তিনি অনেক বাংলা গান গেয়েছিলেন, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি রেকর্ড ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের। তাঁর অনন্য কণ্ঠমাধুর্যে সেসব গানের বেশ কয়েকটি আজও তুলনাবিহীন।

আগেই বলেছি, কবির স-প্রশ্রয় অনুমোদন আদায় করে নিয়ে অরাবীন্দ্রিক কাহিনী-চিত্রে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রয়োগও প্রথম আমিই করেছিলাম প্রমথেশবাবুরই অপর এক চিত্রে। বস্তুত, 'মুক্তি' ছবিটি নানা অর্থেই বাংলা ছায়াছবির মুক্তি এনে দিয়েছিল। সুর-সংযোগ-পদ্ধতির ক্ষেত্রে তো বটেই। তাছাড়া সিনেমার সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সম্পর্ক কী দাঁড়াবে তারও নির্দেশ দিয়েছিল এই 'মুক্তি'। ঋষি-কবির অকৃপণ আশীর্বাদে ভারতীয় সিনেমা এইভাবেই একদিন ধন্য হয়েছিল। সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে আমিও ধন্য হয়েছিলাম।

পিতৃদেব—পরম ভক্ত বৈষ্ণব মণিমোহন মল্লিক

পরমারাধ্যা জননী—মনোমোহিনী দেবী

প্রথম যৌবন—পঁচিশ বছর বয়সে

সঙ্গীত শিক্ষার আসরে শিক্ষাদানরত

IS YOUR FAVOURITE

pankaj mullick

OR

bing crosby?

HEAR THEM BOTH ON

COLUMBIA

THE FINEST NAME ON RECORD

Columbia Graphophone Co. Ltd. • CALCUTTA BOMBAY MADRAS DELHI LAHORE

পুরানো দিনের একটি বিজ্ঞাপন

সঙ্গীত শিক্ষার আসরের একটি দৃশ্য
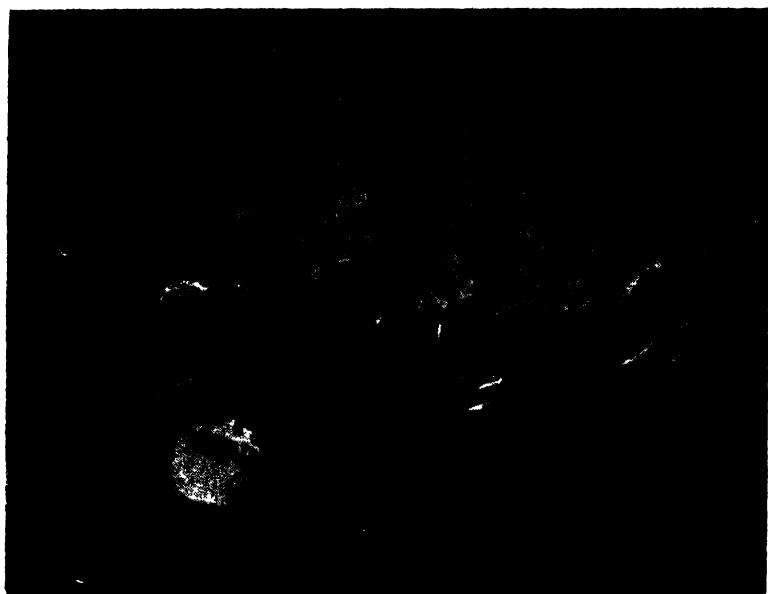
'দেশের মাটি' ছায়াচিত্রে পঙ্কজকুমার, সায়গল; ইন্দু মুখোপাধ্যায়,
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়) প্রভৃতি।

হিন্দী 'কপালকুণ্ডলা' ছায়াচিত্রে—বিখ্যাত গান 'পিয়া মিলনকো জানা' গাইছেন
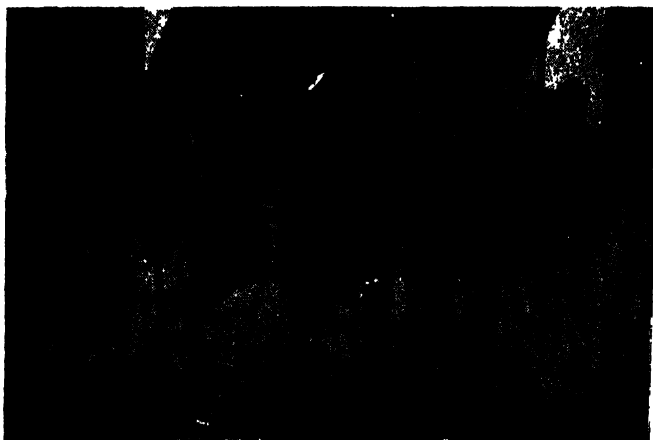
গারস্টিন প্লেসে রেডিও অফিসের ছাদে। সঙ্গে বাণীকুমার,
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বিমল ভূষণ সুরেশ চক্রবর্তী প্রমুখ।
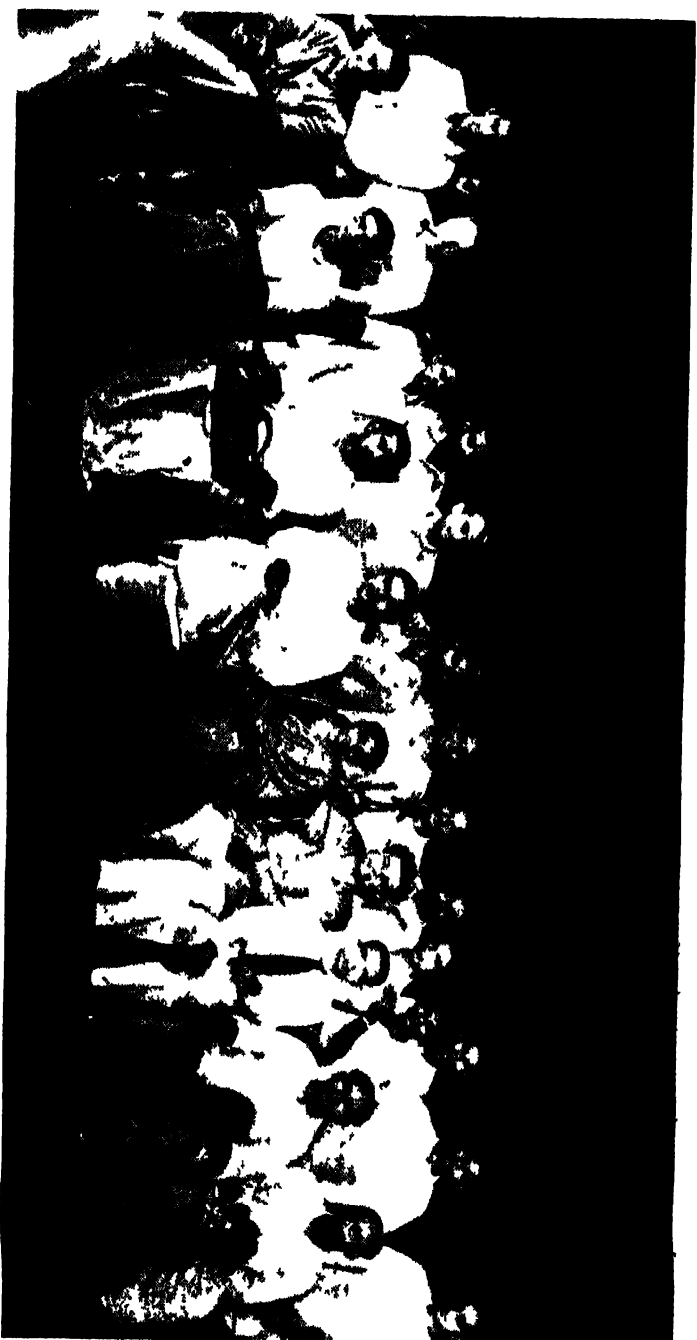
রবীন্দ্রনাথের 'চাব অধ্যায' অবলম্বনে হিন্দী চিত্র "জলজলা"ব কুশলীবৃন্দেব সঙ্গে। বাঁদিকে জার্মান পবিচালক পল জিলস্‌ মধ্যে পঙ্কজকুমারেব পাশে কণ্ঠশিল্পী গীতা রায় (দত্ত)।

পণ্ডিত নেহরুকে দিল্লীতে তার বাসভবনে গান শোনানোর পর
(১৯৫৭)

দিল্লীতে মোরারজী দেশাই ও বি, ভি, কেশকারের সঙ্গে
বাম প্রান্তে পঙ্কজকুমারের পিছনে নাট্যকার মন্মথ রায়।

'দাদাসাহের ফালকে পুরস্কার' গ্রহণ করছেন রাষ্ট্রপতি গিরির হাত থেকে।

চৌ-এন্ লাই-এর সঙ্গে—কলকাতার রাজভবনে গান
শোনানোর পর। ৮.১২. ১৯৫৬

৮

কলকাতা বেতারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছিল একটা অভাবনীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে। বস্তুত, সে-যুগে এমন এক একটা ঘটনা ঘটত মানুষের জীবনে, যা এ-যুগের ব্যাপক নিয়মের নিগড়ে বাঁধা জন-জীবনে কল্পনা করা কঠিন।

স্নাতক হবার আগেই কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গানের টিউশনী করে বেড়াই তখন। কিন্তু সংসারের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা কি শুধু টিউ-শনীতে মেটানো যায়? একটা পাকাপাকি কর্মসংস্থানেরও দরকার। পিতৃদেবের ইচ্ছায় তাই পাটের বাজারে দালালীর ধান্দায় বেরুতে লাগলাম। ক্যানিং স্ট্রীট অঞ্চলের পাটের বাজারে দালালীর কাজ। প্রতিষ্ঠানের নাম 'তুলসীদাস কিষণদয়াল'। এ-কাজ যে আমার কাজ নয় তা বেশ বুঝতাম, প্রতিদিনই ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেরুতে হতো। মনের বেশি অংশটাই জুড়ে থাকত গান—পাটের দরের ওঠা-নামার সঙ্গে সে-গানের গুঞ্জরণ বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত ছিল না। কেবলই মনে হতো এ আমার দ্বারা হবে না।

পাটের বাজারের দালালি—ইংরেজিতে মানানসই করে বলা যেত 'জুট ব্রোকারি'। কিন্তু মন তাতেও প্রবোধ পেত না।

বৃষ্টিতে কলকাতা চিরকালই ভাসে। আজ এই ১৯৭৭ এর জুলাই-অগাস্টে কলকাতা যেমন প্রায় প্রতিদিনই ভাসছে, পতনশীল বারিবিন্দুগুলি বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে সি এম্ ডি এ পর্যন্ত সকলকেই বেয়াদবির সঙ্গে অগ্রাহ্য করে কলকাতার পথে পথে রীতিমতো নাব্য খাল রচনা করে চলেছে, সেদিনও ঠিক এমনটিই হতো। তফাৎ শুধু এই ছিল যে তখন বেচারা কলকাতা কর্পোরেশন একাই এই সমস্যার বারিধিতে হাবুডুবু খেত!

১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি দিনেও ছিল আজকের মতো এমনই মেঘের ঘটা এই ভাগীরথী নদীর তীরে, এমনি বারিই সেদিন ঝরেছিল কলকাতার সৌধমালা এবং জীর্ণ বস্তিগুলির শিরে।

পথে পথে হাঁটুজল, যে-জলটি চিৎপুরের গলিতে দাঁড়ালে বালক রবির মন

আনন্দে নেচে উঠত এই ভেবে যে আজ আর অঘোর মাস্টারমহাশয় আসতে পারবেন না! ·····তেমন জলেই শহর ভাসছে সেদিন, কিংবা ডুবেছেও বলা যায়!

কোনমতে মালকোঁচা-মারা ধুতি ও শার্ট সামলাতে সামলাতে ক্যানিং স্ট্রীট বেয়ে সেণ্ট্রাল এভেনিউয়ের মোড়ের কাছাকাছি এসেছি, কিন্তু আর এগোনো গেল না বোধহয়। বৃষ্টি আবার ঝমঝমিয়ে নামলো সতেজে। ওরই মধ্যে যতটা দ্রুত সম্ভব রাস্তা পার হয়ে একটা গাড়ি-বারান্দার নীচে আশ্রয় নিলাম। মনুষ্য ও বৃষ মিলিয়ে সেখানে তখন অনেক আশ্রিত।

অল্প জায়গায় সিক্ত মানুষের গাদাগাদি ক্রমেই বাড়তে লাগল। আমি একটু স্বচ্ছন্দ হবার বাসনায় গাড়িবারান্দার নীচে এক ডাক্তারবাবুর ডিসপেনসারির রোয়াকে উঠে দাঁড়ালাম। আমার মনেপ্রাণে এল গানের আবেগ। সুবিধামতো একটু দাঁড়িয়ে নিয়েই গুন্‌গুন্ করে সুর ভাঁজতে লাগলাম।

আমার চারিদিকে তখন—'বন্যা মরণ-ঢালা', কিন্তু মন আমার সেই সময়ে মজে ছিল এমন গানে যার সঙ্গে পরিবেশের সংগতি যেন ছিল না। আমি গুন্‌গুন্ করছিলাম—'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়'। না কি অন্য কোনও গান? ঠিক ঠিক মনে করতে পারি না আজ। তবে যতদূর মনে পড়ে এই গানটিই। হঠাৎ কে আমার পিঠে যেন টোকা মারল। চম্‌কে মুখ ফিরিয়ে দেখি শাদা সুট-পরা এক ভদ্রলোক। বুঝলাম ওই ডিস্‌পেন্‌সারির সঙ্গে সংযুক্ত কোনো ব্যক্তি। আলাপান্তে বুঝলাম যে তিনিই স্বয়ং ডাক্তারবাবু এবং দক্ষিণ- ভারতীয় বটেন, নাম, রামস্বামী আয়েঙ্গার এবং ডিস্‌পেনসারির মালিক।

আমায় বললেন—'কাম ইন'।

অবাক হলাম, একটু হতবুদ্ধিও বটে। কিন্তু পরক্ষণেই খুশি হলাম এই ভেবে যে যাই হোক, এই বৃষ্টিতে তো একটু বসার মতো ঠাঁই পাওয়া গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো টন্ টন্ করছিল।

ভিতরে যেতেই উনি ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন—আপনি গুন্ গুন্ করে খুব সুন্দর গান করছিলেন। আমায় একটু শোনাবেন এখানে বসে?

অনুরোধ শুনে একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। কিন্তু উনি আমায় সাদরে ভিতরে ডেকে বসতে দিয়েছেন, তার উপরে শুনতে চাইছেন আমার গান, আমার

তো গাওয়াই উচিত। আমি অতি মৃদু কণ্ঠে ও যথাসম্ভব দরদ দিয়ে পূর্বোক্ত গানটি তাঁকে গেয়ে শোনালাম এবং আশ্চর্য ও বিস্মিত হলাম যে তিনিও গানটি শেষ হবার পর গানের প্রথম কলির সুরটুকু গুন্ গুন্ স্বরে গেয়ে শোনালেন। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম যে যদিও তিনি চিকিৎসক তথাপি তিনি সঙ্গীত চর্চা করেন এবং বিনীতভাবে জানালেন যে তিনিও একজন সামান্য গায়ক। যাই হোক, গান শুনে তো উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন—ডু ইউ লাইক টু ব্রডকাস্ট ? কলকাতায় রেডিয়ো স্টেশন হয়েছে, ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী, আমার জানাশোনা আছে। যদি গাইতে চান তো বলুন।

আমি জানতাম, কলকাতায় তখন কয়েকমাস হলো বেতার-কেন্দ্রর পত্তন হয়েছে—একটি বেসরকারী কোমপানী। জানতাম, তারও বোধহয় মাস দুয়েক আগে বোম্বাই-তেও বেতার চালু হয়েছে। তখন সেই যুগে বেতার নিয়ে মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহল যে কী ছিল তা এ-যুগে বসে অনুভব করা অসম্ভব। আজকের টি ভির বিস্ময়ও তার চাইতে অনেক কম।

সে যাই হোক, আমি অপ্রত্যাশিত এই অনুগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়ে বললাম—আমায় যদি এ সুযোগ আপনি করে দেন তো কৃতার্থ হব।

ডাক্তারবাবু সযত্নে আমার নাম ও ঠিকানা লিখে রাখলেন। আমি সবিনয়ে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—ডাঃ রামস্বামী আয়েঙ্গার।

এর সপ্তাহ দুয়েক পরে একদিন আমি অবাক হয়ে দেখলাম আমাদের বাড়ির সামনে একটা পালকি গাড়ি এসে দাঁড়ালো এবং সেই গাড়ির থেকে নামলেন স্বয়ং ডাক্তার রামস্বামী আয়েঙ্গার। আমি তো বিহ্বল হয়ে ছুটে গিয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করলাম। তিনি বললেন—চলুন আমার সঙ্গে।

ওঁর সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম টেম্পল চেম্বার্স-এর বাড়িতে, তখন যেখানে বেতারের অফিস এবং স্টুডিয়ো।

অবাক হয়ে চারিদিক দেখতে লাগলাম। কিন্তু এত বড়ো যে একটা ব্যাপার, ঘর মাত্র তিন-চার খানা। আজকের রেডিয়ো অফিসের এলাহী কাণ্ডকারখানা দেখলে সে-যুগের এই চিত্রটিকে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

ডাক্তারবাবু আমার সঙ্গে প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর নৃপেন মজুমদার মহাশয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্টেশন ডাইরেক্টর ছিলেন এক ইংরেজ—স্টেপল্‌টন সাহেব। দৈনন্দিন প্রোগ্রামের ব্যাপারে নৃপেনদাই ছিলেন সর্বেসর্বা। এখানে

বলি, নৃপেন মজুমদার মহাশয়কে 'নেপেনদা' বলে ডেকেছি আরো অনেক পরে, পরিচয় ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবার পর। ক্রমে ক্রমে তিনি আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় দাদা হয়ে পড়েছিলেন।

একখানি ছিল বেশ বড়ো হল ঘর, সারি সারি মাদুর পাতা, একটি মাইক বসানো। নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্রও ছিল ঘরে। পাশের একটি ঘরে ছিল বেতার-প্রেরকযন্ত্র বা ট্রান্সমিটার। ব্রডকাস্ট্ হতো বরানগর থেকে। নেপেনদা বললেন—আজই আপনার গান ব্রডকাস্ট্ হবে।

২৬ সেপেটম্বর, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ওই দিনটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় শুভদিন। সেদিন সন্ধ্যাতেই আমি আমার প্রথম বেতার-অনুষ্ঠান করেছিলাম, বিশ্বকবির সেই অপূর্ব গানখানি গেয়ে যে গানখানি সেদিন ডাঃ রামস্বামীকে শুনিয়েছিলাম, অর্থাৎ কবিগুরুর—'এমন দিনে তারে বলা যায়/এমন ঘন ঘোর বরিষায়'...। এবং তারপরে গেয়েছিলাম 'একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে/বসেছ ফুলসাজে সে কথা যে গেছ ভুলে'।

প্রোগ্রাম ডাইরেকটর মহাশয় যে কেবল ব্রডকাস্ট করার সুযোগ দিয়েছিলেন তাই নয়, আমাকে তাঁর এত পছন্দ হয়ে গিয়েছিল যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার সব খবর নিলেন এবং বললেন যে ইচ্ছা হলে আমি বেতারে যোগ দিতে পারি।

জন্মাবধি আমার শিরায় শিরায় সংগীত। আমি তো এমন একটা কাজই খুঁজছিলাম। জীবন ও জীবিকা একই কাজে মিলে যাবে, এমন কাজই তো আমার একমাত্র কাম্য বস্তু তখন। আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে তাঁকে বলে বসলাম—আপনি আমায় যে সুযোগ দিলেন সে জন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

শুনে তিনি প্রসন্ন হাসি হেসেছিলেন।

সে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা।

নেপেনদার অনুগ্রহে আমি ২৬-এ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ সাল থেকে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে গেলাম। বেতারের সঙ্গে আমার এই সংযোগ ১৯৭৫-এর শেষ পর্যন্ত, সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী অটুট ছিল!

বেতারের সেই প্রথম যুগে নেপেনদা ও আমি ছাড়া ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল, রাজেন সেন, যোগেশ বসু প্রভৃতি। এর কিছু সময় পরে এলেন আমার সারা-জীবনের পরম সুহৃদ বাণীকুমার (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য) এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

রাজেন সেন দেখতেন নিউজ ডিপার্টমেণ্ট, যোগেশ বসু ছিলেন গল্পদাদু, বাণীকুমার ছিলেন গীতিকার ও বিভিন্ন বিষয়ের ভাষ্যকার, রাই দেখাশোনা করত সংগীতের দিকটা এবং বীরেন ছিল সাহিত্য, নাটক ও অন্যান্য বিচিত্র ও সরস বিষয়ে অপরিহার্য।

রাই-এর পিতৃদেব লালচাঁদ বড়াল ছিলেন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ! বউবাজারের এক বিখ্যাত ধনী পরিবার তাঁরা, তাঁদের সাংগীতিক ঐতিহ্যও ছিল প্রসিদ্ধ। বাণীকুমার ছিল এক প্রতিভাময় কবি. গীতিকার ও সাহিত্যিক। আর বীরেন্দ্র-কৃষ্ণ তো তার সাংস্কৃতিক গুণাবলীর জন্য স্বনামখ্যাত। এ'রা সকলেই আমার অন্তরঙ্গ, আযৌবন সুহৃদ। জীবনের নানান্ বিপর্যয়ের মধ্যে সে বন্ধুত্ব অনেক সময়েই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে, তথাপি বন্ধু হিসাবে এ'দের পেয়ে আমি চিরকাল আনন্দিতই হয়েছি।

বাণীকুমার আজ আমাদের মধ্যে নেই। তার মতো একজন সর্বগুণান্বিত সুহৃদকে হারিয়ে আজ আমার জীবনসায়াহ্নে প্রায়ই এক নিষ্করুণ শূন্যতাবোধ আমাকে অধীর করে তোলে। ··

বেতারের মত এক শক্তিশালী ও সর্বব্যাপক 'মাস মিডিয়ম'কে হাতে পেয়ে অহর্নিশ আমাদের একই চিন্তা পেয়ে বসেছিল—কেমন করে শিল্প-সংগীত-সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ে আরো বেশি জনসাধারণকে সচেতন, ও রসগ্রাহী করে তোলা যায়। আমাদের এই কর্মীগোষ্ঠীর টীম-ওয়ার্ক ছিল খুবই ঐক্যবদ্ধ, একসূত্রে গাঁথা। একই কার্যে তখন আমরা জীবন সঁপে ফেলেছি ক্রমে ক্রমে।

নতুন নতুন পরিকল্পনা আমাদের মনে আসত তখন। আমরা সবাই মিলে বসে যেতাম সেই পরিকল্পনার ভালোমন্দ, গুণাগুণ বিচার করতে।

রেডিয়োতে এইভাবে সংগীত,নাটক, কথিকা এবং গল্পদাদুর আসর তো হতই, তা ছাড়াও অভিনব কিছু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সংগীত শিক্ষার আসর', 'মহিষাসুরমর্দিনী' এবং আর কিছুদিন পরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'বিষ্ণুশর্মার আসর'।

আমাদের সেই টীম-স্পিরিট এর কথা ভাবলে আজও গর্বে বুক ফুলে ওঠে। আজকালকার বিপুল ব্যবস্থাপনার যুগে, বেতারের নানান্ শাখায়িত ও পল্লবিত

এবং নিয়মকানুন-কণ্টকিত প্রশাসন-ব্যবস্থার যাঁরা কর্ণধাররূপে আছেন, তাঁদের অনেকেই তখনো জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁরা অনেকেই আজ উপলব্ধি করতে পারবেন না সেই ঘরোয়া পরিবেশের কথা, যে-পরিবেশে আমরা কয়েকটি মানুষ সেদিনের সেই শিশু বেতারকে বৃহত্তর বঙ্গসমাজের প্রকৃত সেবক ও শিক্ষক এবং আনন্দ-বিতরণ-কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলাম। সে এমন এক উদ্দীপনা যা আজকের বহু প্রশাসকের ধারণার অতীত।

৯

সংগীতকেই জীবিকা করে আমার জীবনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হল তখন থেকেই। আজ মনে হয়, জীবনের সেই নবশ্যাম দিনগুলিতে সংগ্রাম হয়তো ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল কী প্রাণ মাতানো উদ্দীপনা। আহা, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি! সোনার খাঁচায় তারা যে আর রইল না, রইল না!

আজই তো আমার এই গান গাইবার সময়! কিন্তু সেই কণ্ঠ তো আজ আমার নেই! যখন কণ্ঠ ছিল, তখন দিনগুলি আমার সোনার খাঁচায় ধরা ছিল। সেই অসময়ে আমি কবির এই গান গেয়েছিলাম, অনেক শ্রবণে হয়তো আনন্দ ঢেলে দিতে পেরেছিলাম। জননী বাগীশ্বরীর এও এক কৌতুক! যা তিনি একদিন দুহাত ভরে দিয়েছিলেন, আজ একে একে তা সব ফিরিয়ে নিচ্ছেন। কবিগুরু বোধকরি এইজন্যই তাঁর বিধাতাকে বলেছেন 'দত্তাপহারক'।

কিন্তু কী কথার থেকে কিসে এসে গেলাম।

সে যুগের বেতারের কথায় ফিরি।

আমাদের মনে হঠাৎ একটা পরিকল্পনা জেগেছিল। ধর্মপ্রাণ বাঙালী হিন্দুর ঘরে বার মাসে তের পার্বণ। আর, সব পার্বণের বড় পার্বণ দুর্গাপূজা —মহাদেবীর আবাহন। আমরা ভাবলাম, দশভুজা দুর্গতিনাশিনীর বার্ষিক আরাধনার শুভ উদ্বোধন যদি একটা সাড়ম্বর বেতার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে করা যায় তো কেমন হয়। বন্ধুবর বাণীকুমারই প্রাথমিক পরিকল্পনাটি আমাদের সামনে রেখেছিল আমরা তখন সকলে মিলে আলোচনা করে অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিকল্পনাটি দাঁড় করিয়েছিলাম। ভাষ্য, স্ক্রিপ্ট ও গীত-রচনার দায়িত্ব নিল বাণীকুমার, সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব আমার এবং ভাষ্যপাঠ ও চণ্ডীপাঠের দায়িত্ব নিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। স্ক্রিপ্ট রচনায় বাণীকুমারকে সহায়তা করেছিলেন আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিশিষ্ট পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়। বাঙালী বিদ্বৎসমাজে তিনি ছিলেন বহুসম্মানিত।

এই অনুষ্ঠান সর্বপ্রথম আরম্ভ হল ১৯৩২ সালে। প্রথম বছরে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছিল মহাষষ্ঠীর দিন প্রভাতে। কিন্তু তার পরের বছর

(নাকি, তারও পরের বছর থেকে ?) অনুষ্ঠানের সময়সূচীর পরিবর্তন করা হলো। পিতৃপক্ষের সমাপ্তি দিবসে পবিত্র মহালয়া উপলক্ষে ছুটি থাকায় ঐ দিনটিকে উপযুক্ত মনে করা হলো। তা ছাড়া, দেবীপক্ষ আরম্ভের প্রাক্‌কালে পবিত্র মহালয়া তিথির সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা যখন যাবেন পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গায় পিতৃপুরুষের তর্পণ করতে, তখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা দেবী মহিষাসুর-মর্দিনীর বন্দনা করে দেবীপক্ষকে আবাহন করলে তা অনেক বেশী মনোজ্ঞ হবে। পবিত্র স্তোত্র ও মন্ত্রপাঠ, সুললিত ভাষ্যের উচ্চারণ এবং দেবীমহিমা বিষয়ক সুলিখিত, সুগীত সংগীতে সেই অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার প্রয়াসে আমরা কোনো ত্রুটি রাখিনি। আমরা চেয়েছিলাম, এই গীতময়, মন্ত্রময় ও স্তোত্রময় চণ্ডীবন্দনায় বাঙালী-হিন্দু মহালয়ার প্রত্যূষে সুপ্তোত্থিত হয়ে উঠবেন, এই ধ্বনি শ্রবণ করতে করতেই তাঁরা মহাদেবীকে স্মরণ করে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর দিকে যাত্রা সুরু করবেন পিতৃপুরুষের তর্পণার্থে।

আমরা সফল হয়েছিলাম।

এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য কলকাতা বেতারের জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করে দিয়েছিল। আগেই বলেছি, আমার পিতৃদেবের ধর্মপ্রাণতা ধারাবাহিক ভাবে আমার মধ্যে কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই এই অনুষ্ঠানের সুর রচনায় আমার প্রাণের সমস্ত ভক্তি ও নিষ্ঠা আমি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলাম। তার পুরস্কারও পেয়েছিলাম অগণিত প্রশংসাসূচক চিঠি ও সমালোচনায়। বাণীকুমারের সুনির্বাচিত ভাষ্য ও সুললিত গীতরচনা এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণের রসমধুর আবৃত্তি, ভাষ্যপাঠ ও মহিমান্বিত চণ্ডীপাঠের গুণে এই অনুষ্ঠান যেন ষড়ৈশ্বর্যে বিভূষিত হয়ে উঠেছিল।

এই প্রসঙ্গে আজ বিশেষ করে স্মরণ করতে ইচ্ছে করে কয়েকজন মুসলমান সঙ্গীতযন্ত্রী ভ্রাতাকে, যাঁরা এই অনুষ্ঠানে অসঙ্কোচে মিউজিক দিয়ে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন।

আমরা প্রবলভাবে উৎসাহিত হয়ে তখন নতুন নতুন পরিকল্পনাকে বাস্তব-রূপ দেবার চেষ্টা করে চলেছি। এই চেষ্টারই অন্যতম ফলশ্রুতি বেতারে নাটকের অনুষ্ঠান। যতদূর মনে পড়ে বেতারে প্রথম অভিনীত নাটক ছিল পরশুরামের 'চিকিৎসাসংকট'। আমরা, অর্থাৎ, বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ও

আমি একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, নাম তার 'চিত্রা-সংসদ'। আমাদের নির্বন্ধাতিশয্যে চিত্রাসংসদের শিল্পীরা এই অনবদ্য কৌতুকনাট্যটি বেতারে উপস্থাপিত করেন। বেতারের এই শ্রবণনির্ভর অভিনয়-অনুষ্ঠান চারিদিকে রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিল! আরো কয়েকটি বেতার-নাটক তখন পর পর অভিনীত হয়েছিল। সব নাম মনে পড়ে না। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু'র কথা বেশ মনে আছে।

তখনকার দিনে, এমনকি বেতারেও, স্ত্রীচরিত্রে পুরুষশিল্পীরা অভিনয় করতেন। যে কোন সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সামাজিক রক্ষণশীলতা সে যুগে একটি দুস্তর প্রতিবন্ধক ছিল। আগেই বলেছি, ছেলেমেয়েদের গানবাজনা করা বড়দের চোখে ছিল লেখাপড়ার বিঘ্নস্বরূপ। থিয়েটার দেখা বা নভেল-পাঠও তাই। এই একই মানসিক বাধা কাজ করেছিল বেতারের ক্ষেত্রে। রেডিওতে যাঁরা গান গাইতেন, সাধারণ ভাবে তাঁরা ছিলেন পেশাদারী মহলের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং তাঁদের সঙ্গদোষের ভয়ে, যাঁরা সুকণ্ঠ ও সুগায়ক, তাঁরা অনেকেই ব্যাপক জনসমাজের মধ্য থেকে এগিয়ে এসে বেতারের সঙ্গীত বিভাগকে পুষ্ট করতে সাহস পেতেন না। ফলে. প্রথম দিকে বেতারে গানের মতো একটা প্রধান, দিকই দুর্বল হয়ে পড়েছিল! মহিষাসুর-মর্দিনী অনুষ্ঠান আরম্ভ করার বেশ কিছু দিন আগে থেকেই আমরা এই জিনিসটা বুঝতে সুরু করেছিলাম। সমাধানের চিন্তাও চলছিল সেই সঙ্গে। পরবর্তী যুগে বাংলার শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীদের নিয়ে আমার সঙ্গীত পরিচালনায় মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানের কোরাস ও সোলো গান করিয়েছি। স্বনামখ্যাত তাঁরা সকলেই আমার অনুজ ও অনুজা। তাঁদের প্রীতি ও সহযোগিতা আমি জীবনভোর পেয়েছি। কিন্তু সেই যুগে বেতারের জন্য একজনও ভাল কণ্ঠশিল্পী সংগ্রহ করা দুরূহ ছিল।

এই ধরণের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হতেই আমাদের মনে একটা পরিকল্পনা এসে গিয়েছিল, সেটা 'মহিষাসুরমর্দিনী' প্রভাতী অনুষ্ঠানেরও অনেক আগেকার কথা। তা হচ্ছে 'সঙ্গীত শিক্ষার আসর' এর পরিকল্পনা। আগেই একবার এর কথা উল্লেখ করেছি। নৃপেনদাকে বলেছিলাম যে বেতারের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে, বেতার নিজেই নিজের জন্য শিল্পী তৈরি করে নিতে পারে। তাছাড়া, বাঙালীর ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঙ্গীতের মতো একটা সুকুমার শিল্পকে এইভাবে ছড়িয়ে দেবার পক্ষে এটা একটা সুযোগও

বটে। আর, সর্বোপরি, যে-সঙ্গীতের মধ্যে আমি আ-কৈশোর শ্রেষ্ঠ রসের সন্ধান পেয়েছি, সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে এই আসরের মাধ্যমে বাঙালীর ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে পারব, এমন একটা আশা-আকাঙ্ক্ষাও ছিল, সেকথা আগেই বলেছি।

জীবনব্যাপী অনেক নিন্দা, অভিযোগ ও বিদ্রূপ পেয়েছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এই স্বীকৃতিও লাভ করেছি যে নিতান্ত সাধারণ বাঙালীসমাজে রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে এমন এক সময়ে আমিই ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলাম বা ছড়িয়ে দেবার সুযোগ পেয়েছিলাম, যখন একটা রক্ষণশীল, সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর বাইরে তা কদাচিৎ গাওয়া হতো। আমার এই সাফল্যের মূলে ছিল আমার কণ্ঠ ও গায়নরীতির বৈশিষ্ট্য, এমন কথাও শুনেছি ও পড়েছি। আমার অনুজ, পরম-প্রীতিভাজন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম বিশেষজ্ঞ ও মরমী শিল্পী সন্তোষ সেন-গুপ্ত মহাশয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্য এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে পড়ে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকার সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত প্রচারের মূলে আমার ভূমিকার তিনি তুলনা করেছেন! এত বড় উপমার যোগ্য আমি কদাপি নই, তাই কথাটা শুনে মনের গোপনে গর্ববোধ করলেও লজ্জাই পেয়েছি বেশি। বন্ধুবর আমাকে ভালবেসে যা বলেছেন, তার যাথার্থ্য বিচারের দায় আমার নয়, তবে আমার প্রসঙ্গে এত বড় উপমার অবতারণা করে বন্ধুবর যে আমায় কী অস্বস্তিতে ফেলেছেন তা আমিই মর্মে মর্মে জানি। স্বয়ংপ্রকাশ রবি কি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পৌঁছে যাবার জন্য অন্য কারোর অপেক্ষায় থাকেন?

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনিষ্ঠ, স্বনামখ্যাত শিল্পী অরবিন্দ বিশ্বাস, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুবিনয় রায় প্রমুখের মন্তব্যও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। তাছাড়া বিশেষ আনন্দ পাই যখন দেখি স্নেহভাজন অনুজ রবীন্দ্রশিল্পী হেমন্ত মুখো-পাধ্যায় 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে আমার গান শুনেই তাঁর মন রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকে ঝুঁকেছিল। তিনি বলেছেন— 'এই হিসেবে তাঁকেই আমার রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরু বলা যায়। তাঁর আগে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইয়েদের পরিসর সত্যিই খুব ছোট ছিল।···একটা বিশেষ গোষ্ঠী কবির গানকে নিজেদের মনোপলি প্রপার্টির মতো আগলে রাখতে চাইতেন। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদের মতো রুখে দাঁড়ালেন পঙ্কজ মল্লিক।

…রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে প্রতিভাকে চিনেছিলেন।… পুরুষকণ্ঠের ওজস্, বলিষ্ঠতা, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগপ্রবাহ যা আগে ছিল না—তাই দিয়ে যেন রবীন্দ্রসংগীতে নতুন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন পঙ্কজদা তাঁর একার ব্যক্তিত্বে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পঙ্কজ মল্লিককে রবীন্দ্রসংগীতের যুগস্রষ্টা নিশ্চয় বলা যায়। এঁর সংগ্রামের দাম ভাবীকাল দিয়েছে · ”।

১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত সংগীত শিক্ষার আসরের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গানকে আপামর সাধারণের মধ্যে আমি বছরের পর বছর ছড়িয়ে দিতে থাকি। কেউ কেউ অস্বীকার করলেও এই ইতিহাসের অপহ্নব ঘটবে না যে রবীন্দ্রসংগীতের অনন্ত রসমাধুরী থেকে সাধারণ বাঙালী তখনো বঞ্চিত ছিলেন। এই পটভূমিতেই, সাধারণ মানুষের মুখে, সেই আলোকসামান্য মহাগীতিকারের দাসানুদাস আমি, তাঁর গান একটি একটি করে তুলে দিয়েছিলাম। এটাই ছিল আমার সংগীতশিক্ষার আসরের একটি প্রধান কাজ। এর পাশাপাশি আমি অন্যান্য গানও শিখিয়েছি। যেমন, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কাজী নজরুল ইসলাম, পদকীর্তন, পল্লীসংগীত, দেশাত্মবোধক সংগীত, আনুষ্ঠানিক, শ্যামাসংগীত, বাণীকুমার, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিভিন্ন হিন্দী ভজন (তুলসীদাস, সুরদাস, নানক, মীরাবাঈ প্রভৃতি) বিদ্যাপতি, প্রখ্যাত হিন্দী গীতিকারগণ রচিত বিভিন্ন রসের গান ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া, বৈদিক মন্ত্র, উপনিষদ্-স্তোত্র, সংস্কৃত গীতি-রচনাও আগ্রহী শ্রোতাদের শেখাবার উদ্দেশ্যে যথানিয়মে তুলে দিয়েছিলাম সুদীর্ঘ প্রায় সাতচল্লিশ বছর ধরে! সহস্রাধিক গান তো হবেই। আর, রবীন্দ্রনাথের দ্বি-সহস্রাধিক গানের এক বিপুল অংশ এই আসরে আমি বছরের পর বছর শিখিয়েছি ও গেয়েছি।

আজ সেই সব কথা স্মরণ করতে গিয়ে আমার নিজেরই কৃত সেই অনুষ্ঠানগুলির সুর-স্মৃতি আমার 'প্রাণের শ্রবণে' 'দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায়' ক্ষীণ অথচ মধুর স্বরে বার বার বেজে উঠছে!

এই অনুভূতির আস্বাদনে যে কী 'নিবিড় বেদনা'র 'পুলক' আছে তা ভাষায় পরিস্ফুট করতে আমি অক্ষম!

১০

পূর্বেই বলেছি, ১৯২৯ সালের শেষের দিকে কলকাতা বেতারে সঙ্গীত শিক্ষার আসরের শুভযাত্রা শুরু হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের কথা আবছা আবছা মনে পড়ে। তিয়াত্তরে পা দিয়েছি আমি, স্মৃতি আজ আর তেমন অনুগত নয়। তবু মনে পড়ে, তখনকার দিনের এক অধুনাবিস্মৃত গীতিকার অলোক গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত একটি গান (আমার সুরে) দিয়ে আসরের উদ্বোধন হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলি, এই অলোক গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় হচ্ছেন পরবর্তী যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্বশুর। যাই হোক, গানটির বাণী আজ আর আমার মনে নেই, সুরও ভুলে গেছি—প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই খাতা আজ আর খুঁজে পাচ্ছি না।

দ্বিতীয় যে গানটি শিখিয়েছিলাম, তা পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। তা হচ্ছে আমাদের সর্বজনপ্রিয় কাজীদার বিখ্যাত গান—'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর, নমো নম, নমো নম ··'। কাজী নজরুল ইসলামের এই অনবদ্য গীত-রচনা শিক্ষা দিতে পেয়ে অসীম আনন্দ লাভ করেছিলাম সেদিন।

প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল, যে ঘটনা আসরের সুরুতেই আমাকে প্রভূত আনন্দ এবং উৎসাহ দান করেছিল। সঙ্গীত শিক্ষার আসরের পরিচালক 'পঙ্কজকুমার মল্লিক'-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য একদিন হঠাৎ এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ব্যক্তি রেডিও অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। নাম বললেন—যোগীন্দ্রলাল রায় ঢাকার কোনো এক অঞ্চলের জমিদার।

নেপেনদা (প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর নৃপেন মজুমদার মহাশয়) আমাকে ডেকে বললেন - 'এই ভদ্রলোক সঙ্গীত শিক্ষার আসরের ব্যাপারে খুব আগ্রহী, ঢাকা থেকে এসেছেন, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।'

যোগীন্দ্রলালবাবু বোধকরি আমার তরুণ চেহারা দেখে প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেননি যে আমিই সেই আসর-পরিচালক গুরুগম্ভীর মাষ্টারমশাই!

তিনি বলে উঠলেন -'না না এঁকে নয়, আমি চাই, সঙ্গীতশিক্ষার আসরের পরিচালক পঙ্কজকুমার মল্লিক মহাশয়কে।'

নেপেনদা অনেক কষ্টে তাঁর প্রতীতি উৎপাদন করলেন যে আমিই তাঁর সেই অভীষ্ট ব্যক্তি।

যোগীন্দ্রবাবু যেন একটু হতাশ হয়েই বললেন—'আরে আপনি তো দেখছি নিতান্ত ছেলেমানুষ!, রেডিওতে আপনার গম্ভীর কণ্ঠ এবং গান শেখানোর পদ্ধতি লক্ষ করে আমার ধারণা হয়েছিল আপনি বেশ রাশভারী বয়স্ক লোক'!

অতঃপর যোগীন্দ্রবাবু জানালেন যে তিনিও গানবাজনার চর্চা করেন এবং এই আসর তাঁর খুবই প্রিয়। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা যে এই আসর আরও জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত হোক। তিনি প্রস্তাব করলেন যে এই আসরে একটা সংগীত-প্রতিযোগিতার আয়োজন হোক, প্রতিযোগিতার প্রথম তিনটি পুরস্কার (স্বর্ণপদক) তিনিই দান করবেন।

অযাচিত এই সুচারু প্রস্তাবটি নেপেনদা তো তৎক্ষণাৎ লুফে নিলেন। 'বেতার জগৎ' পত্রিকাটি তখন অল্পদিন হল প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। ঐ পত্রিকাতেই প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করা হল।

যথাসময়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মোট কুড়িপঁচিশজন যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেছিলেন যাঁরা তাঁরা সকলেই মহিলা। তাঁরা কেবল পুরস্কারই পেলেন না, বেতারে নিয়মিত গান গাইবারও সুযোগ লাভ করলেন। বিচারকদের মধ্যে আমি তো ছিলামই, তাছাড়া ছিলেন নলিনীকান্ত-সরকার, বকু মজুমদার ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মহাশয়রা।

আর একটা কথা মনে পড়ে। আসর পরিচালককেও যোগীন্দ্রলালবাবু একটি মেডেল উপহার দিয়েছিলেন। সেটা ১৯৩২ সালের কথা। স্বর্ণপদকটি আজো আমি সযত্নে রক্ষা করে রেখেছি।

* * *

কলকাতা বেতার প্রসঙ্গে কত কথাই না মনে ভীড় করে আসে। 'সঙ্গীত শিক্ষার আসর' আমি সুরু করতাম 'নমস্কার' জানিয়ে। হঠাৎ একদিন এই শব্দটি নিয়ে কর্তৃপক্ষের আপত্তি উঠল। আমাকে বলা হল শব্দটিকে পরিত্যাগ করতে।

অগত্যা তাই করতে হল।

কিন্তু সব অনুষ্ঠানেরই একটা মুখবন্ধ থাকে, একটা নান্দীমুখের আয়োজন

করতে হয়! ভাবতে লাগলাম, কী করা যায়। ভাবতে ভাবতে গিয়ে পড়লাম বিশিষ্ট বন্ধুবর, পণ্ডিত ও সংগীততত্ত্ববিদ্ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহাশয়ের কাছে। শ্রদ্ধেয় স্বামীজী মহাশয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'সংগীত-রত্নাকর' গ্রন্থের প্রথম বন্দনা-শ্লোকটি ব্যবহার করার পরামর্শ দিলেন। এই 'সংগীত-রত্নাকর' গ্রন্থের রচয়িতা শার্ঙ্গদেব—অতীত ভারতের সংগীত-সাধকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পুরুষ!

আমি এই পরামর্শ সানন্দে গ্রহণ করলাম। সন-তারিখ ঠিক মনে পড়ছে না, তবে অনেক বছর আগে এই ঘটনা ঘটেছিল এবং আমি সেই থেকে বছরের পর বছর এই অনবদ্য বন্দনা শ্লোকটিকে আমার প্রতিটি আসরের প্রারম্ভে সুরা-বৃত্তি করে এসেছি। অর্থ ও ভাবৈশ্বর্যের দিক থেকে এ-শ্লোক তুলনাবিহীন। সংগীতসাধক ও শিক্ষার্থীর জীবনে এ-শ্লোক বীজমন্ত্রস্বরূপ। শ্লোকটি এখানে আমি অবনত চিত্তে স্মরণ করি—

ব্রহ্মগ্রন্থিজ মারুতানুগতিনা চিত্তেন হৃদ্‌পঙ্কজে।
সুরীনামানুরঞ্জকঃ শ্রুতিপদং যোঽয়ং স্বয়ং রাজতে॥
যস্মাদ্‌ গ্রাম-বিভাগ-বর্ণ-রচনালঙ্কার জাতিক্রমো।
বন্দে নাদতনুং তমুদ্ধুরজগদ্গীতং মুদে শঙ্করম্‌॥

এই শ্লোকের বাংলা আক্ষরিক অর্থ—

ব্রহ্মগ্রন্থি থেকে জাত বায়ুর সহগামী চিত্তদ্বারা হৃদয়পদ্মে যিনি স্বয়ং বিরাজমান ও সংগীততত্ত্বজ্ঞগণের অনুরাগ-উৎপাদক—যাঁর থেকে শ্রুতি, পদ, বর্ণ ষড়জাদি গ্রাম বিভাগ-অলঙ্কার ও জাতির ক্রম উৎপন্ন ও অভিব্যক্ত, অথবা, বিপুল বিশ্ব যাঁর থেকে গীত (উদ্ভূত), সেই সুখকর নাদসন্দর্ভকে, আনন্দ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বন্দনা করি।......

এই প্রসঙ্গে আকাশবাণীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নানান্‌ টুকরো টুকরো ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে যায়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে আকাশবাণীর Signature song এর প্রসঙ্গ। আমার 'সংগীত শিক্ষার আসর'-এর Signature song ছিল উপরোক্ত শ্লোকটি—'...সেই সুখকর নাদসন্দর্ভকে আনন্দপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বন্দনা করি।' আকাশবাণীর বিশাল কর্মানুষ্ঠানের যে Signature tune ছিল বা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে তা সেই ইংরেজ-আমলে প্রবর্তিত একটি সুর। সুরটি অবশ্যই অতীব মনোজ্ঞ।

সংস্কৃতিবান, বাঙালীমাত্রই জানেন যে একদা বাংলার নাট্যমঞ্চ পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণরেণুস্পর্শে ধন্য হয়েছিল, নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়েছিল। ঠিক তেমনিই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পদধূলি ও আশীর্বচনে একদিন 'আকাশবাণী' বা তদানীন্তন All India Radio কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। সে ঘটনার যতটুকু সাক্ষী আমি তা পরে বিবৃত করছি। এখন কেবল বলি যে স্বাধীন ভারতবর্ষে 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র পাশাপাশি যে 'আকাশবাণী' নামটি সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছে, যতদূর জানি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ভারতীয় বেতারকে তা প্রদান করেছিলেন।

বিশ্বকবি বেতারের জন্যই বিশেষ করে একটি কবিতা রচনা করেন। অপরূপ এই কবিতার শিরোনাম—"আকাশবাণী"। কবিতাটি—

ধরার আঙিনা হতে ঐ শোনো
উঠিল আকাশবাণী,
অমরলোকের মহিমা দিল যে
মর্ত্যলোকেরে আনি।
সরস্বতীর আসন পাতিল
নীল গগনের মাঝে,
আলোকবীণার সভামণ্ডলে
মানুষের বীণা বাজে।
সুরের প্রবাহ ধায় সুরলোকে
দূরকে সে নেয় জিনি,
কবিকল্পনা বহিয়া চলিল
অলখ সৌদামিনী।
ভাষারথ ধায় পূরবে পশ্চিমে
সূর্যরথের সাথে—
উধাও হইল মানবচিত্ত
স্বরগের সীমানাতে।

(শান্তিনিকেতন ৫ আগস্ট, ১৯৩৮)

১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ যে Brochure প্রকাশ করেছিলেন, তাতে এই কবিতাটি মূল বাংলায়, ইংরেজি অনুবাদ

সহযোগে ছাপা হয়েছিল। বেতারের পক্ষ থেকে অশোক সেন মহাশয় কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি অর্থবহ নাম প্রার্থনা করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি এই কবিতা।

বাংলা কবিতাটির যে ইংরেজি কাব্যরূপ কবি নিজে করেছেন, সেটিও উদ্ধৃত না করলে অতৃপ্তি থেকে যাবে। কবি-কৃত ইংরেজিটি ছিল—

Hark to Akashvani upsurging
From here below
The earth is bathed in Heaven's glory
Its purple glow
Across the blue expanse is firmly planted
The altar of the Muse
The lyre unheard of light is throbbing
With human hues,
From earth to heaven distance conquered
In waves of light,
Flows the music of man's divining
Fancy's flight,
To East and West speech careers
Swift as the Sun
The mind of man reaches Heaven's confines
Its freedom won.

(Poem specially written for A. I. R. in 1938 by Poet Tagore)

১৯৩৮ সালে বেতারের Brochure-এ প্রকাশিত হবার পর ১৯৩৮ সালে আমি এই কবিতাটিতে (বাংলা) সুরারোপ করি এবং বেতার কর্তৃপক্ষের নিকট ১৯৩৮ সালে প্রস্তাব দিই এটিকে আকাশবাণীর Signature song হিসাবে গ্রহণ করতে। সে প্রসঙ্গে পরে আবার আসছি।...

এক নম্বর গারস্টিন প্লেসের বেতার ভবনের সদর প্রবেশদ্বার থেকে প্রায় কুড়ি ফুট দীর্ঘ ও আট ফুট প্রস্থযুক্ত প্রবেশপথটির মাঝে একটি বৃত্তের মধ্যে সবুজ সিমেণ্টের একটি রেখা-চিত্র ছিল। চিত্রটি ভারতবর্ষের মানচিত্র। তখন জল

ইণ্ডিয়া রেডিওর ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলেন এ, এস, বোখারী এবং কলকাতার স্টেশন ডাইরেক্টর ছিলেন পূর্বোল্লিখিত অশোক সেন মহাশয় (ইনি পরে ডাইরেক্টর জেনারেল হয়েছিলেন)। মাস মনে নেই, সাল ১৯৩৭। বোখারী সাহেব ও সেনমহাশয়ের আমন্ত্রণে বিশ্বকবি সে সময়ে একদিন বেতার-ভবনে পদধূলি দান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন এসে নামলেন তখন সকলেই শশব্যস্ত এবং যথোচিত মর্যাদা রক্ষায় যত্নশীল। সেদিন অন্যান্য যেসব কর্মী ও শিল্পী উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম।

কবিকে পথ দেখিয়ে আগে এগিয়ে এলেন বোখারী সাহেব ও সেনমহাশয়। তাঁরা দুজনে অনায়াসেই বৃত্তটি মাড়িয়ে সোজাসুজি হেঁটে গেলেন। কবি কিন্তু বৃত্তটির সামনে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, ভারত-জননীর সিমেণ্ট-রচিত রেখাচিত্রটিকে আনত মস্তকে নিরীক্ষণ করলেন এবং এক অপরূপ প্রশান্ত ভঙ্গীতে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সংগে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে গিয়ে, মানচিত্রে তাঁর পদস্পর্শ সযত্নে এড়িয়ে পথ-প্রদর্শকদ্বয়ের অনুসরণ করলেন। বেতারের কর্তা দুজন, যাঁরা ঠিক তাঁর আগেই ভারতজননীর চিত্ররেখাকে অবশ্য সম্পূর্ণ অকারণেই দলন করে গিয়েছেন, পিছন ফিরে কবির এই শ্রদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত আচরণ দেখে স্বভাবতই অপরিসীম লজ্জায় মাটিতে মিশে গিয়েছিলেন। তাঁদের মুখের চেহারা দেখে আমার একথা তখন অনুমান করতে মোটেই অসুবিধা হয় নি। পরে কবি ভিতরে গিয়ে বলেছিলেন—'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা…।' এই পংক্তির 'মাটি' শব্দটি আবার ধীরে ধীরে মা-টি এই ভাবে পুনরুচ্চারণ করেছিলেন, যেন বলতে চাইছিলেন যে মায়ের অংগে মাথা ঠেকানো যায়, পা ঠেকাবো কেমন করে—মাটি যে মা-টি!…

১৯৩৮-এর জুলাই মাসের ২ তারিখে পার্বত্য শহর কার্সিয়ং-এ একটি বেতারকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দিন স্থির হওয়ার পর দিল্লী বেতার কর্তৃপক্ষ আমাকে এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করেন। তাঁরা জানালেন যে তদানীন্তন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী মাননীয় গোপাল রেডডী মহাশয় স্বয়ং এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের ইচ্ছা আমি যেন উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করি। আমি তদুত্তরে জানাই যে 'আকাশবাণী' নামকরণের জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ কবিতাটি রচনা করেছিলেন এবং যে-কবিতাটি মূল বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ সহযোগে বিশ্ব-

কবির চিত্রের সঙ্গে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে আকাশবাণী-কর্তৃক প্রকাশিত Brochure-এ স্থানলাভ করেছিল, সেই রচনাটি যদি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে আমাকে সুর-সংযোজিত করে গাইবার পাকা ব্যবস্থা আকাশবাণী করে দিতে পারেন তাহলে আমি পরমানন্দে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করব।

গোপাল রেডডি মহাশয় তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টায় সে ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন এবং আমিও গানটিকে উদ্বোধন-সংগীত হিসাবে পরিবেশন করেছিলাম সেই অনুষ্ঠানে। তাঁর আনুকূল্য পরে আমি এই গানটি বেতারে শিখিয়েছিলামও বটে।···

অশোক সেন মহাশয় ১৯৩৮ সালে যখন আকাশবাণীর ডাইরেক্টর জেনারেল, তখন আকাশবাণীর Signature song-এর প্রসঙ্গটি আমি তাঁকে দীর্ঘকাল পরে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। অনুরোধ করেছিলাম, বেতারের জন্যই রচিত কবির এই অনুপম গীতিকবিতাটি যেন আমার প্রদত্ত সুরে কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতরূপে গৃহীত হয় আকাশবাণীর Signature song হিসাবে—প্রযোজনীয় সময়সীমার মধ্যে। বিশ্বকবি যেমন নিজের প্রতিষ্ঠান শান্তি-নিকেতনের জন্য 'আমাদের শান্তিনিকেতন' রচনা করেছিলেন, ঠিক তেমনই তো বেতারের জন্য 'আকাশবাণী' কবিতাটি রচনা করে দিয়েছিলেন। প্রথমটি যেমন শান্তিনিকেতনের মন্ত্র সংগীত, দ্বিতীয়টিকে তেমনি বেতারের মন্ত্র-সংগীত বলা যায়!

বন্ধুবর অশোক সেন তখন কলকাতা কেন্দ্রের ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত ভাটিয়াকে যথারীতি ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছিলেন। গানটি সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে তাঁর অনুমোদনও আমাকে জানিয়েছিলেন। পরিতাপের কথা, এর অব্যবহিত পরেই শ্রীযুক্ত ভাটিয়া বদলি হয়ে যান। আমিও নানান্ কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। ফলে ব্যাপারটি আর অনুসৃত হয় নি।

'ধরার আঙিনা হতে ঐ শোনো
উঠিল আকাশবাণী··'

আশা ভৈরোতে আমি সুর সংযোজন্ করেছিলাম। আমার জীবনের অন্যতম প্রিয় বাসনা —বিশ্বকবির এই রচনা, যা দিয়ে তিনি আকাশবাণীকে ধন্য করে গেছেন, পুণ্য করে গেছেন এবং চির ঋণে আবদ্ধ করে গেছেন এবং যাতে সুরারোপ করে আমি নিজে ধন্য হয়েছি তা আকাশবাণীর Signature song বা

মন্ত্র-সংগীতরূপে গৃহীত হোক। কিন্তু তা কি আমি দেখতে পাব? প্রসংগত বলি, ১৯৩৮ সালের শেষ দিকে কলকাতা বেতারের তদানীংতন কর্তৃপক্ষ যখন আমার সংগে অকারণে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, তার কিছু আগেও কর্তৃপক্ষকে আমি আকাশবাণীর বিষয়টি অশোক সেন মহাশয়ের চিঠিসহ পুনরায় মনে করিয়ে দিয়েছিলাম।

১৯৫৯-এ আকাশবাণী কর্তৃক দিল্লীতে প্রথম দূরদর্শনী বা টেলিভিসন স্থাপিত হয়। তার ব্যাপ্তি ছিল ঐ নগরকে কেন্দ্র করে পঞ্চাশ মাইল ব্যাসার্ধ পর্যন্ত। কলকাতা থেকে আমি সেখানে উদ্বোধন সংগীতের জন্য আমন্ত্রিত হই এবং আজ আমার এই কথা মনে পড়লে বড়ই আনন্দ হয় যে ভারতের প্রথম টেলিভিসন আমার কণ্ঠে কবিগুরুর সংগীত দিয়েই উদ্বোধিত হয়েছিল। গানটি—

'তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে, এল এল এল গো
ওগো পুরবাসী'…

* * *

বেতারে 'সংগীত শিক্ষার আসর'-এর অল্পকাল পরে আর একটি আসরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তার নাম 'বিষ্ণুশর্মার আসর'। পরিচালক ছিলেন বন্ধু-বর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এটি ছিল কথিকার আসর।

এ ছাড়া বাণীকুমার অতি সুন্দরভাবে নানা ধরণের অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করতেন। অভিনবত্বের দিক থেকে বাণীকুমারের উদ্ভাবনী শক্তি ছিল অসাধারণ। তার তুলনা বেতারে আমাদের কর্মজীবনে আর দেখিনি। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে—যেমন, দুর্গাপূজা, শিবরাত্রি, সরস্বতীপূজা প্রভৃতিতে তিনি অভিনব সব অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট রচনা করে দিতেন। শুধু কি তাই? মাস অনুসারে নানা উৎসবের পরিকল্পনাও তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। তিনি বেতারে রীতিমতো বারমাস্যার আয়োজন করতেন। এইরূপ বিচিত্র সব অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলা নববর্ষ, মাঘমণ্ডল ব্রত, বুদ্ধ-দেবের বোধিসত্ত্বলাভ ও নির্বাণলাভের দিনগুলি, আষাঢ়স্য প্রথম দিবস, কোজাগরী পূর্ণিমা, সত্যযুগের আরম্ভ উপলক্ষে অক্ষয় তৃতীয়ার পালন এবং দশহরার দিনে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার মর্তে আগমন ইত্যাদি নানান্ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন বাণীকুমারেরই কৃতিত্বের ফল।

বেতারে একটা জিনিস আমার ও বাণীকুমারের উদ্যোগে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাণীকুমার সংকলিত ও মৎকর্তৃক পরিচালিত ও গীত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতৃগণের এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের গান সেই প্রথম বেতারস্থ হয়। সালটা ঠিক মনে নেই। তবে দশকটা চল্লিশের।

গানের মাধ্যমে পল্লী-উৎসবগুলিকে বেতার-রূপ দিয়ে গ্রাম-বাংলার জনসাধারণের কাছেও বেতারকে পৌঁছে দেবার প্রয়াস আমরা পেয়েছিলাম সেই যুগে। পরবর্তীকালে বেতারে পল্লীমঙ্গল প্রভৃতি নানান্ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে, কিন্তু এ-সবের উৎপত্তি খুঁজতে গেলে পুরানো দিনের সেই সব ছোটখাটো অনুষ্ঠানের ইতিবৃত্তে ফিরে যেতে হবে। কথাপ্রসঙ্গে মনে পড়ে আউস ও আমন ধানের কথা। একটি দ্রুত উৎপন্ন ও একটি বিলম্বে উৎপন্ন। পল্লীবাসীর চোখে এই দুশ্রেণীর ধানের দুটি রূপ। তাদের জীবনে এই দুটি ফসল দু রকম আবেদন রেখে যায়। বাণীকুমারের রচনা-মাধ্যমে আমরা গানের ভিতর দিয়ে পল্লীবাসীর এই বিচিত্র অনুভূতি ও জীবনধারাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে আরও ছিল বুদ্ধপূর্ণিমা, রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী, রবীন্দ্র তিরোভাব দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জন্মাষ্টমী, গান্ধী জয়ন্তী, খৃষ্ট আবির্ভাব ও তিরোভাব, বসন্তোৎসব, সাধারণতন্ত্র দিবস, বেতারনাট্যের মাধ্যমে বিভিন্ন ভারতীয় মহাপুরুষের জীবন ও কর্মকীর্তি পরিস্ফুটন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব কথা আজ আর অনুপূর্বিক ভাবে মনে পড়ে না। তবে আমাদের এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ছিলেন সুহৃদ্বর বাণীকুমার বা বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। একথা স্বীকার করতে তাঁর বন্ধু হিসাবে আমি যুগপৎ আনন্দ ও গৌরব অনুভব করি।

১১

১৯৩৮ এর শেষার্ধে আমি আমার প্রাণাধিক প্রিয় এই সংগীতশিক্ষার আসরে শেষ রবীন্দ্র-সংগীত শিখিয়েছিলাম—'তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে চলে এসেছি।' আর তার কয়েকমাস পূর্বে শিখিয়েছিলাম—

শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে
শেষ কথা যাও বলে।
সময় পাবে না আর, নামিছে অন্ধকার
গোধূলিতে আলো-আঁধারে
পথিক যে পথ ভোলে।

তখন কি জানতাম এই গানগুলিই আমার আসরের শেষ গান হয়ে দাঁড়াবে।

সব শেষে যে রবীন্দ্র সংগীতটি শিখিয়েছিলাম তার বাণীগুলিও আজ বার বার আমার প্রাণে ধ্বনিত হচ্ছে—

তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে
চলে এসেছি
কেউ কি তা জানে।
তখনো তো কতই আনাগোনা
নতুন লোকের নতুন চেনাশোনা—
ফিরে ফিরে ফিরে আসার আশা দলে এসেছি
কেউ কি তা জানে।

গীতবিতানের প্রেম পর্যায়ভুক্ত এই বেদনানিবিড় সংগীতটি বোধকরি মহাকবির করুণায় 'সংগীত শিক্ষার আসরে' গাওয়া আমার শেষ গান হয়ে দাঁড়ালো। সারা জীবন তিনি আমায় অন্নজল দিয়েছেন, শেষ গানটিও তিনিই যেন আমার অগোচরে আমার মুখে সংগোপনে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

এই গানটি শেখানো শেষ করে সবেমাত্র একটি মীরাবাঈ-ভজন শেখাতে আরম্ভ করেছিলাম। এমন সময় অকস্মাৎ একদিন আমার বাসভবনের

ঠিকানায় এলো এক চিঠি, পত্রলেখক কলকাতা বেতারকেন্দ্রের তদানীন্তন স্টেশন ডাইরেক্টর।

আজ প্রায় দু বছর আগেকার এই ঘটনার স্মৃতি লিপিবদ্ধ করতে বসে অনুভব করি যে এই পত্রাঘাত-জনিত ব্যথার থেকে আজও আমি পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি। চিঠিটা পেয়ে প্রথমেই আমার কবিগুরুর সেই আপাত-সরস বেদনার্ত উক্তি মনে পড়ে গিয়েছিল—'টেলিগ্রাম এলো সেই ক্ষণে/ ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হলো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে'। কিন্তু তার পরক্ষণেই এক বোবা যন্ত্রণাবোধ আমাকে নির্বাক করে দিয়েছিল।

সংগীত শিক্ষার আসরের Conductor-এর দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্তজ্ঞাপক কলকাতা বেতারকেন্দ্রের তৎকালীন স্টেশন ডাইরেক্টরের ৩ অক্টোবর ১৯৩৮ তারিখের এই চিঠি যে আমার শেখানো ওই গানটির জন্য অপেক্ষা করছিল, তা কি আগে জানতাম। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে-অনুষ্ঠানের আমি সূচনা করেছিলাম, অভিনবত্ব ও বয়সের দিক থেকে যা ছিল বিশ্ব-বেতারের ক্ষেত্রে একটি রেকর্ড, এতকাল ধরে যে-অনুষ্ঠানকে আমি তিল তিল করে লালন-পালন-পরিপোষণ করে এসেছিলাম, তার পরিবর্তনের ব্যবস্থা অতি সন্তর্পণে পাকা করে তারপর আমায় বরখাস্ত করে চিঠি দেওয়া হলো, পূর্বাহ্ণে আমার সঙ্গে সামান্যতম পরামর্শ করার সৌজন্যটুকুও করা হলো না। চিঠিটির প্রতিলিপি—

D. K. Sen Gupta REGISTERED

Station Director Government of India

All India Radio

Cal—10 (3) 75—PII

Post Box no 696
Eden Gardens
Calcutta—700001

Dear Shri Mallik,

This is with regard to broadcast of Music Lessons from this Station, conducted by you. In accordance with the decision taken to introduce many changes in programmes broadcast by

I have to convey to you AIR'S deep appreciation of the valuable services rendered by you as the Conductor of the above-mentioned programme for so many years.

With warm regards.

Yours Sincerely,

Sd-

(D. K. Sen Gupta)

Shri Pankaj Kumar Mallik
2/2 Sevak Baidya Street.
Calcutta 29.

এর দ্বারা আকাশবাণীর তদানীন্তন প্রশাসন যে তাঁদের যশোবৃদ্ধি ঘটালেন তাতে আর সন্দেহ কী? আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সৌজন্য বিষয়ক ঐতিহ্যগুলি যে এই ধরণের অভিভাবকত্বের গুণে সুসংরক্ষিত থাকবে এ-বিষয়ে আর সংশয়ের কারণ রইল না! বিশেষত, এ-যুগের শিল্পীরা কেউ কেউ যখন আমাদের মতো সেকেলে মূল্যবোধে বিশ্বাসী নন্!

* * *

শেষের দিকের কয়েক বছর ধরে প্রতিটি আসরের অনুষ্ঠান কয়েকদিন আগেই টেপ্ করে নেওয়া হতো। যাই হোক, রেডিও কর্তৃপক্ষের কথায় ও কাজে কোনো ফারাক দেখা গেল না। ২ নভেম্বর ১৯৩৮ থেকে আমার অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ হয়ে গেল। যে মীরাবাঈ ভজনটি শেখাতে আরম্ভ করেছিলাম সেটিকে, বলা বাহুল্য, শেষ হতে দেওয়া হলো না। অসমাপ্ত গানটি সহৃদয় শিক্ষার্থীর কণ্ঠে তার সুরের আসনখানিকে বিছিয়ে দিতে পারলো না।

কয়েকদিন পরে কলকাতার এক বিখ্যাত দৈনিকের পক্ষ থেকে এক সংবাদদাতা এলেন আমার কাছে এই বিষয়ে খোঁজখবর করতে। তাঁকে সেদিন আমি যা বলেছিলাম, সেই সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমি যা বলিনি এমন কথাও প্রকাশিত প্রতিবেদনে আমার মুখে আরোপ করা হয়েছিল। আমার পরে সংগীতশিক্ষার আসর কে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে কিঞ্চিমাত্র সংবাদ জানা দূরের কথা, আমি নিজেই যে অপসৃত হতে চলেছি তাই আমি জানতাম না। সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাছে স্বভাবতই

উত্তরাধিকারী সম্পর্কে আমি কোনো মন্তব্য করিনি। কে উত্তরাধিকারী হবেন সে-বিষয়ে আমার পূর্বজ্ঞান না থাকায় তাঁর যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন ছিল না, অথচ সংবাদপত্রটিতে ছাপা হয়ে গেল যে আমি নাকি বলেছি, যোগ্য উত্তরাধিকারী এসেছে এতেই আমি সুখী!

তথাপি, তাঁরা আমার প্রতি যে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন তা আমার মর্মকে স্পর্শ করেছিল। তাঁদের সেই প্রীতিপূর্ণ মন্তব্য কিছু কিছু উদ্ধার করছি—

কৈশোরের সেই রঙীন মুহূর্তগুলি আজও ভেসে আসে। বেতারে সংগীত শিক্ষার আসরের পরিচালনা করতেন পংকজকুমার··সেই ধ্যানগম্ভীর কণ্ঠ বাঙালী জাতিকে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও আরও অনেক গানের রস জুগিয়ে দিয়েছে।··

কিন্তু যিনি চলে গেলেন তাঁর গৌরব যে আমাদের ঘোষণা করতে হবে, আমরা যারা তাঁর যৌবনোচ্ছল কণ্ঠমাধুরীর সাক্ষী। যাঁদের কাছে রবিবারের সকাল প্রত্যাশা বহন করে আনত তাঁরা কি জানতে চাইতে পারেন না যে প্রবীণ পংকজকুমারের বিদায়লগ্নটি এমন নিরুৎসব কেন?

দিনেন্দ্রনাথের গান শুনিনি, পংকজবাবুর বহু শুনেছি··কেন তাঁর গৌরবময় শিক্ষকজীবনের যোগ্য হলো না সে বিদায়? (আনন্দবাজার,

'আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রটিকে সুদূর অতীতে যাঁরা তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন···তাঁদের আর সকলেই একে একে রেডিও থেকে বিদায় নিয়েছেন বাকি ছিলেন পংকজ মল্লিক···স্বয়ং প্রতিষ্ঠানের মতো এই মানুষটির কাছে বাংগালী কৃতজ্ঞ।···বৈদিক মন্ত্র, উপনিষদের স্তোত্র, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, ভজন বাউল, হিন্দী ও উর্দু, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, সজনীকান্ত, বাণীকুমার, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের গান। রবীন্দ্র সংগীতকে সাধারণ মানুষের গলায় যিনি তুলে দিয়েছেন, তাঁরই নাম পংকজ মল্লিক।

ঠিক এই কথাই শুনেছি সুচিত্রা মিত্রের কাছে। বললেন—'ও'র তুলনা

শুধু উনিই। ও'র বিকল্প হয় না, ও'কে বদলানো যায় না। ও'র পায়ের কাছে বসে রবীন্দ্রসংগীতের তালিম নিয়েছি। ও'রই সার্টিফিকেটের বলে ১৯৪১ সালে শান্তিনিকেতনে গান শেখার সুযোগ পেয়েছি। উনি আমার আত্মার আত্মীয়, আমার গুরু। এই সংগীতশিক্ষার আসরই আমার সংগীত সাধনার প্রেরণা। আমার মতো লক্ষ লক্ষ বাঙালী মেয়ের।··(আনন্দবাজার

আনন্দবাজার প্রকাশিত শ্রীমতী সুচিত্রার চিঠির অংশবিশেষ—আমিও আশৈশব সংগীতশিক্ষার আসরের নিয়মিত শিক্ষার্থী ও শ্রোতা। শ্রদ্ধেয় শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা কমপক্ষে চল্লিশ বৎসরের। তিনি আমার সংগীতজীবনের প্রথম গুরুও বটেন। এই সংগীতশিক্ষার আসরের সঙ্গে তিনি এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন যে একটিকে ছেড়ে আর একটির কথা ভাবা যায় না।

আমিও তাই নতজানু হয়ে এই শ্রদ্ধেয় শিল্পী-সংগীতগুরুর কাছে আশীর্বাদপ্রার্থী।'

বেতারে যাঁর কণ্ঠ শুনে জানতে পেরেছিলাম সংগীতশিক্ষার আসরে কে আমার 'উত্তরাধিকারী' হলেন, সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনিই আমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। তিনি আমার স্নেহভাজনা, কন্যাসমা। শিক্ষক হিসাবে তাঁর সংগীতজীবনের কৃতিত্বে আমি আনন্দিত। এভাবে তিনি আশীর্বাদ না চাইলেও আমি তাঁর চির-আশীর্বাদক।

শিল্পী ও শিক্ষকজীবনের প্রান্তসীমায় এসে আজ কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে—

'শুধায়ো না কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান
পথের ধুলার পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।'

১২

কলকাতা বেতারের প্রসঙ্গে আরো অনেক কথা মনে ভীড় করে আসে। কালানুক্রমকে অস্বীকার করে তার অনেক কিছুই আমি বলব, কারণ, লিখতে বসে অনুভব করছি, কালানুক্রমকে ঠিক মতো অনুসরণ করা আজ আমার পক্ষে দুরূহ। 'কবে কোন্ গান/কাহারে করিয়াছিনু দান' এই কবিতাটি মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হতেই, জানি না কেন, মনে পড়ে যাচ্ছে এক যাদুকর কণ্ঠ-শিল্পীর কথা, যার নাম সংগীতপ্রিয় লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অন্তরে চির-জাগরূক হয়ে আছে।

আজ যাঁরা প্রবীণ বা উত্তর-যৌবন আমার এই কথায় তাঁদের স্মৃতি হয়তো আলোড়িত হয়ে উঠবে। তাঁরা হয়তো অনুমান করতে পারবেন যে আমি এখন যার কথা স্মরণ করব সে আর কেউ নয়, স্বয়ং কুন্দনলাল সায়গল বা সংক্ষেপে শুধুই সায়গল—যে নামে সে বাঙালী ও ভারতবাসীর পরম প্রিয়।

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এই মানুষটির চোখে মুখে ছিল কৌতুক ও লাবণ্য, যদিও রূপবান্ বলতে যা বোঝায় সে তা ছিল না।

পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রেই গজল, ভজন ও ঠুংরীর উপর তার ছিল অধিকার। তার কণ্ঠ ছিল স্নেহময় মাধুর্যে ও একটি বিশেষ মজলিসী ভঙ্গিমায় অনুপম। প্রাণখোলা মানুষ—কণ্ঠচালনা, স্বরক্ষেপ ও স্বর-বিভঙ্গের অনায়াস কুশলতায় সে আশ্চর্যরকম সাবলীল ছিল। পরকে সে আপন করতে পারত, আশপাশের সকলকে সরস কৌতুকে বিভোর করে রাখত সে।

পঞ্জাব-তনয় কুন্দন জীবিকার প্রয়োজনে অল্প বয়সেই রেমিংটন কোম্পানীর চাকরি নিয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, ছুটি নিয়েই সে এসে পড়েছিল কলকাতায়। কিন্তু তার মন-প্রাণ সকলি ছিল সংগীতে সমর্পিত। অনুমান করা কঠিন নয়, সে তার জীবিকার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই মুক্তির উপায় চিন্তা করতো।

কুন্দনকে কে প্রথম আবিষ্কার করেছিল এ-নিয়ে নানান্ কৌতুকপ্রদ কথা শুনতে পাই। কিন্তু আমি জানি তার প্রায় সবই কপোল-কল্পিত। বস্তুত,

সে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেছিল। একদিন সে হঠাৎ কলকাতা বেতার অফিসে একা এসে উপস্থিত হয়েছিল। সে তখন বাংলা জানত না, হিন্দী-উর্দু বলত এবং ইংরেজিও জানত। সে যখন বেতারে এল তখন আমিও তরুণ। তবে 'সংগীতশিক্ষার আসর' এর শিক্ষক ও 'মহিষাসুরমর্দিনী'র সংগীত-পরিচালক হিসাবে তখন আমি প্রতিষ্ঠা পেয়েছি এবং বেতারে কিছুটা কর্তৃত্ব অর্জন করেছি।

কুন্দন ও আমি মোটামুটি সমবয়সী ছিলাম। পরবর্তী জীবনে আমরা সুমিষ্ট বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সংগীত-পরিচালক হিসাবে যেমন আমার ও বন্ধুবর রাইচাঁদের নাম লোকে এক নিঃশ্বাসে নিত, কণ্ঠ-শিল্পী হিসাবে ঠিক তেমনই সায়গল ও আমার নাম একই সংগে উচ্চারিত হতো।

সে যাই হোক, পাছে ভুলে যাই, আগে তার একটি রসনাতৃপ্তিকর মহৎ গুণের কথা বলে নিই। সে-ব্যাপারেও তার এবং আমার মধ্যে একটা সুমিষ্ট বন্ধন ছিল। সে ছিল পাকা রাঁধুনী, বিশেষত, পশ্চিম ভারতীয় ও ও মোগলাই রান্নায় সে ছিল যে কোনো পেশাদার বাবুর্চির সমকক্ষ। প্রায় রোজই স্টুডিওতে (নিউ থিয়েটার্স) আসার সময় সে সংগে করে আনত তার নিজের হাতে রাঁধা সুস্বাদু সব ব্যঞ্জন, অধিকাংশই মাংসের প্রিপারেশন। লান্‌চের সময় সে রোজই আমাকে লুকিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে সেই সব খাওয়াত। আজও আমার মুখে তার স্বাদ লেগে আছে।

কুন্দনের সংগে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা মনে করতে গিয়ে আর একটি কৌতুকপ্রদ স্মৃতি আমাকে খুব আনন্দ দেয় আজও। কুন্দন তখন শিল্পী হিসাবে যশোলাভ করেছে, অর্থাগমও হচ্ছে প্রচুর। সুতরাং একদিন সে একখানি মটর সাইকেল কিনে ফেললো এবং তাইতে চড়েই সে টালীগঞ্জ স্টুডিওতে যাতায়াত সুরু করে দিলো।

সেই থেকে প্রায়ই দিনান্তে আমাকে পিছনে বসিয়ে সে গৃহাভিমুখে লিফ্‌ট্‌ দিত। একদিন তার পিছনে বসে আসছি, মটর বাইকের একটানা ভট্‌ভট্‌ শব্দকে তাল ও ঠেকা করে সে গান ধরেছে—'শারদ প্রাতে আমার রাত পোহাল···'। ঐ সময়েই আমি এই রবীন্দ্র সংগীতটি সবেমাত্র তাকে তুলিয়েছিলাম। সে সেই ঝোঁকে ভট্‌ ভট্‌ শব্দের তালে তালেই গাইছে···বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে···আর বলছে—'পংকজ, ঠিক-ও গয়া।' আমি বলছি—'ঠিক করে কর,

ওখানটা ভুল হচ্ছে ··ঠিক হল না ··'। এমনি করতে করতে এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় মটর বাইকের ঝাঁকানিতে হঠাৎ কখন আমি ধপ্ করে পড়ে গেছি রাস্তায়। কুন্দন কিছুই বুঝতে পারেনি। সে মহানন্দে 'বাঁশি তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে' গাইতে গাইতে সশব্দে চলে গেল। অকস্মাৎ পড়ে গিয়ে যুগপৎ আঘাত ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তখন তাকে চেঁচিয়ে ডাকার শক্তি আমার ছিল না। কোনোমতে উঠে, হাত পা ঝেড়ে পথের লোকদের মুখে 'আহা লাগে নি তো?' ইত্যাদি শুনে ট্রামে উঠে পড়লাম। শুনতে পেলাম, কেউ কেউ চিনতে পেরে তখন বলছে—আরে, 'এতো পঙ্কজ মল্লিক, সায়গলের মটর সাইকেল থেকে পড়ে গেছে—ইত্যাদি।

যাই হোক, ভাগ্যক্রমে কেটে ছিঁড়ে যায় নি, অক্ষত দেহেই বাড়ি ফিরেছিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু উদ্বিগ্ন সায়গল আমাব বাড়িতে এসে উপস্থিত। অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়ে তার খেয়াল হয়েছিল যে আমি পিছনে নেই। তখন সে টালীগঞ্জ মুখো হয়ে আস্তে আস্তে ফিরতে থাকে। যেখানটায় আমি পড়ে গিয়েছিলাম তার কাছাকাছি আসতেই নিকটস্থ চায়ের দোকানের লোকেরা তাকে আমার পড়ে যাওয়ার এবং ট্রামে চড়ে বাড়ি ফেরবার বর্ণনা দেয়। তাই শুনে সে সোজা আমার বাড়িতে চলে এসেছে আমার কুশল জানতে।

আমার কিছু হয়নি দেখে তার উদ্বেগ নিরসন হলো। তাকে দেখে আমারও ব্যথার কিছুটা উপশম হলো। তারপর দুজনেই খুব একচোট হেসে নিলাম হো হো করে।

যাই হোক, আদি প্রসঙ্গে এবার ফিরি। অপরিচিত অবাঙালী তরুণটি যেদিন তার অভিলাষ নিয়ে বেতার অফিসে এসে উপস্থিত হলো, সেদিন সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর নৃপেন মজুমদার, অর্থাৎ আমাদের নেপেনদা আমাকে ডেকে বললেন—পঙ্কজ দেখো তো, এই ছেলেটি রেডিওতে গাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করছে, তুমি ওর অডিশন নাও তো একটু।

আমি অবাঙালী দেখে ইংরেজিতে শুধালাম—'কী ধরণের গান গেয়ে থাকেন অপনি?

সে বললো—গীত, ভজন, গজল, ঠুংরি এইসব ···।

গানের ঘরে ওকে নিয়ে গিয়ে বসালাম। গাইতে ইঙ্গিত করলাম। একটু ইতস্তত করে সে গান ধরল।

অপূর্ব কণ্ঠ, যেন ভগবদ্দত্ত! শুনে মুগ্ধ হয়ে ছুটলাম নেপেনদার কাছে। বললাম— 'নেপেনদা আপনি নিজে এসে একবার শুনে যান'।

নেপেনদা তখনই রাইচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। গান শুনলেন এবং চমৎকৃত হলেন। বললেন—'ওহে, ছেলেটাকে আজই মাইক্রোফোনে বসিয়ে দাও।' বলা বাহুল্য, রাইচাঁদও একমত ছিল।

তখনকার দিনে, বেতারের প্রথম যুগে, এমনই হতো। পূর্বাহ্নে টেপ করার রেওয়াজ ছিল না, নির্বাচিত শিল্পীকে সোজাসুজি মাইকে বসিয়ে দেওয়া হত। উপযুক্ত শিল্পী পেলে নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের হেরফেরও করে দেওয়া হতো।

কুন্দনলাল সায়গলের গান সেদিনই সন্ধ্যায় ব্রডকাস্ট করা হল। সে দুখানা গজল গেয়েছিল।...

এর কিছুদিন পরে বন্ধুবর রাইচাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে কুন্দনকে সিনেমায় নামার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সিনেমায় গায়ক-অভিনেতার তখন খুব প্রয়োজন। বুড়োদা অর্থাৎ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী খুব তাগিদ দিয়েছিলেন।

এদেশে তখনো প্লে-ব্যাক প্রথা চালু হয়নি। তখনো পর্যন্ত গায়ক-অভিনেতা বা গায়িকা-অভিনেত্রীর বিশেষ কদর ছিল। সেযুগে যখনকার কথা বলছি তার বয়েক বছর পরই, অভিনয় ও সঙ্গীত-কলায় সমভাবে নিপুণা শ্রীমতী কানন দেবীর সাফল্য ও যশোলাভ ক্রমে ক্রমে সম্ভাব্য সকল সীমানাকেই অতিক্রম করে গিয়েছিল। যাই হোক, আমরা গায়ক-অভিনেতার অভাবের জন্যই সায়গলকে নিউথিয়েটার্স'র মাধ্যমে সিনেমায় টেনে আনার চেষ্টা করেছিলাম।

কুন্দন প্রায় তৎক্ষণাৎ রাজি হয়েছিল এই আশায় যে সে রেমিংটনের চাকরি ছেড়ে এসে গান ও অভিনয়ের জোরে অন্তত সেইটুকু উপার্জন করে নিতে পারবে।

আমরা ওকে বুড়োদার কাছে নিয়ে গিছলাম। বুড়োদা বা প্রেমাঙ্কুর আতর্থীকে বাঙালী সমাজ সাহিত্যিক হিসাবে বেশি চেনেন।

'মহাস্থবির' ছদ্মনামে রচিত তাঁর ক্লাসিক সৃষ্টি 'মহাস্থবির জাতক' বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বুড়োদা এক সময়ে সিনেমা পরিচালকও ছিলেন।

গায়ক-অভিনেতা তিনি খুঁজছিলেন, কিন্তু কুন্দনকে দেখে তাঁর মন উঠলো না। খুঁত খুঁত করতে লাগলেন। বললেন—সবই তো ভালো, কিন্তু ছেলেটা রোগা যে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু এ-বাধা পার হওয়া গেল। কুন্দন দেশবিখ্যাত নিউ থিয়েটার্সের অংগনে প্রবেশাধিকার পেল। প্রথমে সে কয়েকটি হিন্দী ছবির নায়ক-রূপে অভিনয় করেছিল। পরে ধীরে ধীরে বাংলা শিখে, বাংলা ফিল্মে প্রবেশ করেছিল। তার প্রথম বাংলা ছবি—'দেবদাস'। শরৎচন্দ্রর কাহিনী অবলম্বনে প্রমথেশ বড়ুয়ার এই বিখ্যাত বাংলা ছবিতে গণিকা চন্দ্রমুখীর আলয়ে মোসাহেবের চরিত্রে সে দুটি গান গেয়েছিল—'কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা' এবং 'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তোমার রাঙা কপোলখানি।'

দুটি গানেই সে মাতিয়ে দিয়েছিল।

ছায়াচিত্রে তার প্রথম আত্মপ্রকাশ উর্দু ছবি 'মহাব্বৎ কী আঁসু'তে। পরবর্তীকালে যখন সে বাংলা শিখে একেবারে বাঙালীর মতো বাংলা বলতে পারত, তখনো কিন্তু সে বাংলা পড়তে শেখেনি। বাংলা ছবির ডায়ালগ্ বা বাংলা গানের বাণী (রবীন্দ্রসংগীতেরও) উর্দু অক্ষরে লিখে নিত।

নিউ থিয়েটার্সের বহু ছবিতে গায়ক-অভিনেতার ভূমিকায় সে প্রশংসা পেয়েছিল। অভিনয়ে সে ছিল মোটামুটি ভাল, কিন্তু গানে ছিল অসাধারণ। আমার সুরে তার গাওয়া গান বহু বাংলা-হিন্দী ছবিতে ছড়িয়ে রয়েছে।

এমন যার কণ্ঠ, তাকে রবীন্দ্রনাথের গান শেখাবার বাসনা আমার মনে ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠেছিল। কুন্দনও খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে, বিশেষ করে যুক্তাক্ষর উচ্চারণে ওর ত্রুটি একটু কান পাতলেই ধরা পড়ে যেত। তাই প্রথমে ধৈর্যসহকারে ওর উচ্চারণকে ত্রুটিমুক্ত করতে লাগলাম। অবশেষে আমি ওকে ওর জীবনের প্রথম রবীন্দ্রসংগীত শেখালাম—

প্রথম যুগের উদয় দিগংগনে প্রথম দিনের উষা
নেমে এল যবে
প্রকাশ-পিয়াসী ধরিত্রী বনে বনে শুধায়ে ফিরিল
সুর খুঁজে পাবে কবে।

মনে পড়ে, এই গানের তাৎপর্য তাকে বুঝিয়েছিলাম দীর্ঘ সময় ধরে। তার মুখে উচ্চারণের শুদ্ধতা আনতেও কম পরিশ্রম করতে হয়নি। সে-যুগের সিনেমায় যাঁরা তার গান শুনেছেন বা এখনো পুরানো ডিস্কে তার গান যাঁরা শুনতে পান তাঁরা সকলেই স্বীকার না করে পারবেন না যে নানা বিচিত্র রসের হিন্দী, উর্দু ও বাংলা গানেই শুধু নয় রবীন্দ্রনাথের গানেও সে কতখানি মরমী শিল্পী হয়ে উঠেছিল। বস্তুত আজও তার কণ্ঠ-সম্পদের জুড়ি মেলা ভার।

কুন্দনের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে একটা বিশেষ ঘটনা মনে পড়ে গেল। নিউ থিয়েটার্সের সে-যুগের বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'জীবন মরণ' ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করতে গিয়ে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এ ছবির নায়কের ভূমিকায় ছিল গায়ক অভিনেতা কুন্দনলাল সায়গল এবং নায়িকার ভূমিকায় ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী নৃত্যপটিয়সী শ্রীমতী লীলা দেশাই। কুন্দনের কণ্ঠের গানগুলি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ—'পাখি আজ কোন কথা কয় শুনিস কিরে' 'এই পেয়েছি অনল জ্বালা তারেই শুধু চাই' (গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য) এবং রবীন্দ্রনাথের 'তোমার বীণায় গান ছিল আর আমার ডালায় ফুল ছিল গো'।

ছবিটির প্রস্তুতির শেষে গানটি রেকর্ড করে নিয়ে কবিগুরুর কাছে আমি গিয়েছিলাম তাঁকে শুনিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে। গানটি যখন কবিকে বাজিয়ে শোনাচ্ছি, তখন দ্বিতীয় অন্তরার প্রথম কলিটি বেশ কয়েকবার শুনে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—'ফুল ফুরালো দিনের শেষে' এ কেমন করে সম্ভব?

কবির কথায় আমি হতবুদ্ধি হয়ে তাঁর গানের বই খুলে দেখালাম যে ছাপার অক্ষরে 'ফুল ফুরালো'ই আছে। কবি তখন যেন একটু দূরের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে উদাস বিষণ্ণ স্বরে বল্লেন—কি করে এটা হ'ল জানি না, কিন্তু ওটা তো 'সুর ফুরালো দিনের শেষে' হওয়াই উচিত ছিল।

ছায়াছবিটির কাজ তখন শেষ হয়ে গেছে, ডিস্‌ক্‌ রেকর্ডও প্রস্তুত। সুতরাং শব্দটি পরিবর্তনের আর কোন সুযোগ ছিল না। গানটি কবি অবশ্য সানন্দে অনুমোদন করলেন। তবু ওই শব্দটি নিয়ে তাঁর বিষণ্ণতা যেন রয়েই গেল।

আমার মনে একটা প্রশ্ন আজও থেকে গেছে। গীতবিতানে এখনো

পর্যন্ত ওই 'ফুল ফুরালো' কথাটি অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। কবি কি তাহলে বিস্ময় প্রকাশ করার পরও এর পরিবর্তন করেননি? পরে এই গানটি আমি স্বকণ্ঠেও রেকর্ড করেছি এবং গীতবিতানে যেমন ছাপা আছে তেমনই গেয়েছি। কবির সেদিনকার বিস্ময় ও বেদনার তাৎপর্য আমি আজও সম্যক-ভাবে বুঝে উঠতে পারিনি। আর কেউ এই গানটির বাণীর বিষয়ে কবির মনের কথা কিছু জানেন কিনা আমি জানিনা।

যাই হোক, কুন্দনের কথায় ফিরে আসি। এই অসাধারণ কণ্ঠশিল্পী অপরিণত বয়সে, পঞ্চাশের অনেক নীচেই আমাদের মায়া কাটিয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তার অকালমৃত্যুর মূল কারণ ছিল বোধকরি পানীয়ের ব্যাপারে তার অমিতাচার। মনে পড়ে, বন্ধু হিসাবে এনিয়ে তাকে অনেক অনুযোগ করতাম। কিন্তু বৃথাই।

আজ এতদিন পরে তার কথা লিখতে বসে আমার 'প্রাণের শ্রবণে' ধ্বনিত হচ্ছে তারই গাওয়া রবীন্দ্রগীতির সুমধুর কলি—

'সেই কথাটি কবি পড়বে তোমার মনে, বর্ষা মুখর রাতে ফাগুন সমীরণে'। তার চাইতে সার্থকভাবে এ-গান গেয়ে শোনাবার মতো আজ আর কোন্ শিল্পী আছেন?

১৩

ভারত-বিখ্যাত ইম্‌প্রেসারিও পরলোকগত হরেন ঘোষ মহাশয়কে সংস্কৃতিবান্ বাঙালীমাত্রই জানেন। এই অদ্ভুতকর্মা মানুষটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল আনন্দ-পরিষদ্-এ। সে আমার প্রথম যৌবনের কথা। তিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁকে 'হরেনদা' সম্বোধন করতুম।

আমি তখন বেতারের কণ্ঠশিল্পী। রাইচাঁদ ছিল বেতারের বেতনভোগী কর্মকর্তাদের একজন—অ্যাসিসট্যাণ্ট প্রোগ্রাম ডাইরেকটর। একদিন হঠাৎ হরেনদা বেতার অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। একটু ব্যস্ত-সমস্ত হয়েই তিনি আমাদের দুজনকে ডেকে বললেন—ওহে, তোমরা একটা বইতে মিউজিক দিতে পারবে?

'বই'তে 'মিউজিক' দেওয়া ব্যাপারটা আমাদের কেমন যেন খটমট ঠেকলো। তখনকার দিনে সাধারণ লোকের মুখে মুখে এখনকার মতো 'সিনেমা' বা 'ছবি' কথাটার চল ছিল না। লোকে বলতো—'বায়োস্কোপ দেখতে যাচ্ছি' অথবা 'জানো হে, অমুক হল্-এ একটা ভালো বই এসেছে।'

আবার নির্বাক যুগ যখন সবাক যুগকে পথ ছেড়ে দিলো, তখন লোকে বলতো—'টকী' দেখতে যাচ্ছি।

বয়োস্কোপে মিউজিক দেওয়া সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না তখন। আমি হরেনদাকে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলতে বললাম। হরেনদা বললেন—খুব সহজ। বায়োস্কোপ সুরু হবে পর্দায়। গল্প যেমন যেমন এগিয়ে চলবে, সিচুয়েশান বুঝে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তেমন তেমন বাজনা দিতে হবে।

হরেনদার কথায় বুঝলাম, ইংরেজি নির্বাক ছবিতে যেমন যন্ত্রশিল্পীরা মিউজিক দিতেন, হরেনদা তেমনটা চাইছেন। (উদাহরণস্বরূপ—তখনকার দিনে 'প্যালেস্ অভ্ ভ্যারাইটিজ্' হল্-এ—যে হল্-এর নাম পরে হয়েছিল 'এলিট'—মিউজিক দিতেন বায়রন হপার। তাঁর সঙ্গীতযন্ত্রের নাম ছিল 'ইউনিট অর্গান'। অপূর্ব বাজাতেন তিনি।)

আমি ও রাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। দুজনেরই নীরব প্রশ্ন—কী করা যায় বলো তো? শেষ পর্যন্ত দুজনেই এক উত্তরে এসে পৌঁছালাম—নিয়ে নেওয়াই যাক না।

কিন্তু কী বই? হরেনদা বললেন যে, শ্যামবাজারে 'চিত্রা' সিনেমা হাউসে একটা বই খোলা হবে শীঘ্র. নাম 'চোরকাঁটা'। সাইলেন্ট্ পিকচার, তুলেছে কলকাতার 'ইনটারন্যাশনাল ফিল্ম্ ক্রাফ্ট্' নামক এক কোম্পানী। আমাদের কাজ হবে বক্সে মিউজিক হ্যান্ড্স্দের নিয়ে বসে সেই ছবির সঙ্গে মিউজিক দেওয়া।

(একটা কথা বলে রাখি. এই ছবির পরিচালক কে ছিলেন, প্রফুল্ল রায় না চারু রায়, আজ ঠিক মনে পড়ে না আমার)

হরেনদার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত পাকা হয়ে গেল। ঠিক হলো যে আমরা দুজনে. অর্থাৎ রাইচাঁদ ও আমি, বইটা খুঁটিয়ে দেখে নেব আগে, তারপর কোন্ দৃশ্যের জন্য কী মিউজিক হবে তা ঠিক করে নেব। বেতারের সঙ্গে সংশ্লিস্ট নির্ভরযোগ্য যন্ত্রশিল্পীদের নিয়ে একটা ইউনিট তৈরি করে নেওয়া হবে। তারপর সবাই মিলে সিনেমা হাউসের মিউজিক বক্সে বসে মহলা দিয়ে নেব।

এই ছবির মিউজিকের পরিকল্পনা করতে গিয়ে একটা অভিনব আইডিয়া মাথায় এলো। ভাবের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আমাদের নিজেদের সুর ছাড়াও রবিবাবুর গানের টুকরো টুকরো সুর যথাসম্ভব ব্যবহার করলে কেমন হয়? তাছাড়া সেই সুরের রেশ টেনে আবার সৃষ্টি করেও তো ব্যবহার করা যায়!

ভাবনাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলাম আমরা। দুজনেই এ-বিষয়ে পূর্ণোদ্যমে লেগে পড়লাম। আমাদের দুজনের যুগ্ম সংগীত-পরিচালনার ইতিহাসের সূত্রপাত এই ভাবেই ঘটলো।

চোরকাঁটায় যে মিউজিক দেওয়া হয়েছিল, তাতে, যতদূর মনে পড়ে, দর্শক সাধারণ তৃপ্তই হয়েছিলেন। এই প্রথম রবিবাবুর সুর মিশে গিয়ে যন্ত্র সংগীতকে কেবল উন্নত ও পরিশীলিতই করলো না, দর্শকদেরও রুচি-বদল ঘটালো। ভারতীয় চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ অনিবার্যভাবেই ধীর পদসঞ্চারে প্রবেশ করলেন। 'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো / তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো।' এ-দেশের

ফিল্ম্-শিল্প তখন শিশিরের মতোই ক্ষুদ্র। কিন্তু সহস্র-রশ্মি রবি তাঁর কিরণসম্পাত থেকে ছোট-বড় কাউকেই তো বঞ্চিত করেন না!

ইনটারন্যাশনাল ফিল্ম্‌ক্রাফ্‌ট এর পরে তুললেন 'চাষার মেয়ে'। আগের মতো আমরা দুজনেই সংগীত-পরিচালক। সম্পূর্ণ মিউজিকই এবার আমরা অনেক ধীরভাবে গুছিয়ে কম্পোজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই কম্পোজিশনেও আমাদের সুরের সঙ্গে কিছু রবীন্দ্রসুর মিশ্রণ করেছিলাম, হয়তো বা আগেরটির চাইতে বেশি সাফল্যের সঙ্গে। এটাতেও, যতদূর জানি, দর্শকরা তৃপ্তই হয়েছিলেন।

এর অল্পকাল পরেই ইনটারন্যাশনাল ফিল্ম্ ক্রাফ্‌ট কোম্পানীর এক ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটলো। এদেশে তখন নির্বাক যুগ সবাক যুগে প্রবেশ করছে। সেই যুগান্তরের মুহূর্তে এই প্রতিষ্ঠান নতুন নামে অভিষিক্ত হলো—'নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড'। ভারতীয় ফিল্মের ইতিহাসে এ নামের গৌরব আজও অবিসম্বাদিত। নিউ থিয়েটার্সের প্রথম 'টকী' 'দেনাপাওনা' শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বন করে নির্মিত হয়েছিল। নতুন যুগের এই ছায়াছবির পরিচালক ছিলেন আমাদের বুড়োদা, অর্থাৎ সে যুগের প্রখ্যাত কথাশিল্পী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মহাশয়।

এ-ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন নীতীন বসু, পরবর্তীযুগের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক। নীতীন বসু ছিলেন আমাদের পাশের পাড়ার এক বিত্তবান্ পরিবারের সন্তান। নিজের গাড়ি করে তিনি প্রত্যহ স্টুডিওতে আসতেন ওঁর ডাক নাম অনুসারে ওঁকে 'পুতুলদা' বলে ডাকতাম। পুতুলদার ভাই মুকুল বসু তখন ছিলেন নিউ থিয়েটার্সের সাউন্ড বিভাগে। তিনি ছিলেন আমার সমবয়সী বন্ধু।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের বিখ্যাত এইচ্ বোস-এর পরিবারের সন্তান ছিলেন এঁরা। সে-যুগের নাম-করা কেশতৈল কুন্তলীন-এর প্রস্তুতকারক 'এইচ বোস এণ্ড্ কোম্পানী' ছিল এই পরিবারেরই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। কুন্তলীন ছাড়াও এঁদের ছিল 'দেলখোস' আতর এবং সুগন্ধি পানমশলা 'তাম্বুলীন'। সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্য পুরস্কার 'কুন্তলীন পুরস্কার' এঁরাই প্রবর্তিত করেন। এঁদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির জন্য এঁরা ভারি মজার মজার বিজ্ঞাপন দিতেন। একটি ছড়া বেশ মনে পড়ে—

'কেশে মাখো 'কুন্তলীন'
অঙ্গবাসে 'দেলখোস',
পানে খাও 'তাম্বুলীন'
ধন্য হোক এইচ. বোস !'

কার্তিক ও গণেশ বসু—ভারতীয় ক্রিকেটের এই দুই প্রখ্যাত খেলোয়াড়ও এই বাড়িরই ছেলে, নীতীন-মুকুলেরই সহোদর ভ্রাতা।

যাই হোক, পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। 'দেনাপাওনা' ছবির অভিনয়াংশে ছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, উমাশশী, নিভাননী, কুসুম কুমারী ও শিশুবালা প্রমুখ। এ ছবিতে উমাশশীর কণ্ঠে গাজনের গানটি ছিল ভারী মিষ্টি, এখনো খুব মনে পড়ে—'বাবা উদাস ভোলা, মোদের পাগলা ছেলে।'

দেনাপাওনার ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক-এ আমরা আমাদের পুরাতন ভঙ্গিই অনুসরণ করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের এবং আমাদের বিভিন্ন সুররচনাকে সোজাসুজিভাবে বা আথরযুক্ত করে ব্যবহার করেছিলাম। পূর্বেই বলেছি, এইভাবে সেই প্রথম যুগেই এদেশের সিনেমাশিল্প রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্পর্শে ধন্য হয়েছিল।

কথায় কথায় একটি ব্যক্তিগত কথা মনে পড়ে গেল। আমার সেই বয়সের এক গভীর আঘাতের স্মৃতি এটি। আজ অবশ্য সেই স্মৃতি আমাকে আর বেদনার্ত করে দিতে পারেনা, বরং এক বিচিত্র কৌতুকেরই উদ্রেক করে। তবু বলি।

নিউ থিয়েটার্সে আমি এবং রাই দুজনে ছিলাম যৌথভাবে সঙ্গীত বিভাগের দায়িত্বে! 'দেনা পাওনা' ছবিতেও আমরা ছিলাম যুগ্ম সঙ্গীত পরিচালক, সমমর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু কী আমার বিধিলিপি! ছবিটি যখন প্রথম দেখানো হলো, ক্রেডিট্ টাইটেল দেখেই আমি একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে বড় বড় অক্ষরে ভেসে উঠলো সহকর্মী রাইচাঁদ বড়ালের নাম, আর, তার নীচে, অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট অক্ষরে মন্দভাগ্য এই পঙ্কজকুমার মল্লিকের নাম।

আমি অধীর হয়ে পড়লাম। কেন? কেন এই বৈষম্য? কী অপরাধ আমার? বিভিন্ন ছবিতে তখন আমরা যৌথভাবে, সমমর্যাদাসম্পন্ন হিসাবেই

সংগীত পরিচালক থাকতাম। তথাপি এমন ঘটনা ঘটেছে। বিশেষত এই ছবির ব্যাপারে এটা খুবই মর্মান্তিক, কারণ কাগজে-কলমে যুগ্ম সংগীত পরিচালনার কথা থাকলেও, এ-ছবির সুর-রচনা সম্পূর্ণভাবে আমি করেছিলাম।

কেন এই অবিচার ?—এই মর্মভেদী প্রশ্ন আমাকে সেই মুহূর্তে আলোড়িত করেছিল। আজ প্রবীণ বয়সে যে কথা মনে পড়লে হাসি পায়, সেদিন সেকথা অশ্রুমোচন করিয়েছিল। তখন একবার মনে হয়েছিল বীরেন সরকার মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করি, কেন এমনটা হলো ? কিন্তু তিনি যদি এর প্রতীকার না করেন ? সে হবে আরো বড় আঘাত। অতএব তাঁর কাছে গেলাম না।

বুকভরা পুঞ্জিত অশ্রুবাষ্প তখন দুচোখ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাড়ি ফিরেই ছুটে গেলাম আমাদের গৃহদেবতার বিগ্রহের সম্মুখে। তিনি আমার প্রাণের ঠাকুর, জগন্নাথদেব। তাঁর সন্ধ্যারতির ঘণ্টা আজও প্রতি সায়াহ্নে আমার শ্রবণে ধ্রুবপদের মতো বেজে ওঠে।

কবি বলেছেন—'নাই যদি দরশন পেলে, আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ।' কোন্ আঁধার ? এ-আঁধার তো কেবল সূর্যাস্তজনিত দিনাবসানের অন্ধকার নয়, আমাদের জীবনের অন্ধকার মুহূর্তগুলিও বটে। আমি আমার জীবনের সেই তমসাহত মুহূর্তে তাঁর স্পর্শ ভিক্ষা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমায় ভেঙে-পড়া থেকে রক্ষা করেছিলেন।

"বাহিরের এই ভিক্ষা-ভরা থালি এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি
অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে প্রভু তোমার দানে······"

১৪

মুখরাং প্রকটিত মনুজমায়াং
বিধৃত নাটক নিসর্গ কায়াম্ ।
প্রসৃতাং চ ধবল যবনিকায়াম্
জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াম্ ।।

ভারতবর্ষের অগ্রণী চলচ্চিত্র-নির্মাণ-সংস্থা নিউ থিয়েটার্সের হাতি-মার্কা প্রতীকের নীচে লেখা থাকতো উপরের সংস্কৃত শ্লোকটির শেষ পংক্তিটি—'জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াম্'। নিউ থিয়েটার্সের প্রতীকের জন্য এই 'জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াম্'-পদটুকু লিখে দিয়েছিলেন পন্ডিতপ্রবর, রস-সাহিত্যিক কুলগুরু, স্বনামধন্য 'পরশুরাম' অর্থাৎ রাজশেখর বসু মহাশয়। পরে এই চরণটির পাদপূরণ করে দেন অপর এক পন্ডিতশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। একটি সুমধুর ও সুগভীর অর্থবহ শ্লোকের দ্বারা এই পাদপূরণ কেবল পাদপূরণই ছিল না, এটি একটি অনুপম সংস্কৃত কবিতায় পরিণত হয়েছিল। আমি ধন্য যে ১৯৩৪ খৃীষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায় সুনীতিকুমারের বাসগৃহে আমার উপস্থিতিতেই এই মৌক্তিকোপম শ্লোকটি রচিত হয়েছিল! তাঁর বাসভবনে আমার গমনের উদ্দেশ্যই ছিল নিউ থিয়েটার্সের জন্য একটি সম্পূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক তাঁকে দিয়ে রচনা করিয়ে নেওয়া।

সেই সন্ধ্যায় নানাবিধ আলাপ আলোচনা রসিকতার পর তিনি বললেন—ও বাবা, 'জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াম্' যে স্বয়ং পরশুরামের রচনা! এর পাদপূরণ করে কবিত্ব ফলাতে গেলে যে খড়্গাঘাতে ধরাশায়ী হবো।

আচার্যের সহধর্মিনীও ঘরে একবার ঢুকেছিলেন। সব শুনে তিনিও রঙ্গ করে বললেন—সংস্কৃত শ্লোক রচনা করবে, তুমি যে দেখি কালিদাস—ভবভূতি হয়ে উঠলে!

এমনি নানান্ রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও আলাপচারীর মধ্যে অকস্মাৎ সুনীতিকুমার উপরোক্ত সম্পূর্ণ শ্লোকটি রচনা করে ফেললেন। রাত তখন বারোটা পার

হয়ে গেছে। এটি করায়ত্ত করে যখন আমি সোল্লাসে বাড়ি ফিরলাম, কলকাতা মহানগরী তখন নিদ্রার গভীরে।

আলোছায়ার লীলাচঞ্চলতার মাধ্যমে মানুষের জীবনের যে প্রতিফলন ঘটছে চলচ্চিত্রে, তারই অর্থবহ ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে এই অভিনব শ্লোকটিতে।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার বলে মনে করি। নিউ থিয়েটার্সের প্রতীক যে হাতিটির ছবির নিচে এই শ্লোকের শেষ চরণটি মুদ্রিত থাকতো, সে-ছবিটির চিত্রকর ছিলেন সে যুগের যশস্বী শিল্পী ও ব্যঙ্গচিত্রী যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয়। এ-যুগের অনেক বাঙালী হয়তো তাঁর নাম বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু যদি একটি ছোট্ট সূত্র ধরিয়ে দিই তাহলে এঁকে সকলেই চিনতে পারবেন। পরশুরামের গল্পগ্রন্থগুলির ছবি ইনিই আঁকতেন। 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলি' প্রভৃতি বিখ্যাত বইগুলিতে লেখা থাকতো 'পরশুরাম বিরচিত' ও 'যতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত'।

যাই হোক, নিউ থিয়েটার্সের বহুবর্ণরঞ্জিত ইতিহাসের যে-টুকু আমার অভিজ্ঞতালব্ধ তার কথা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে 'মুক্তি' সিনেমার কথা আমার বার বার মনে পড়ে যায়। 'মুক্তি'র কথা বলতে আমি সর্বদাই প্রলুব্ধ হই। এই প্রলোভনের কারণ 'মুক্তি'র সঙ্গে সঙ্গীত-পরিচালক, কণ্ঠশিল্পী ও অভিনেতা হিসাবে আমার নিবিড় যোগাযোগ। আমার জীবনে এই ছবি অনেক বড় সুযোগ এনে দিয়েছিল। তাছাড়া, আমার নিজের ধারণা, এই ছবি নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানের জীবনেও এক নতুন প্রাণবেগ সঞ্চার করেছিল।

স্বনামধন্য পরিচালক-অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া (গৌরীপুর রাজ-পরিবারের কুমার প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়), 'মুক্তি' ছবির পূর্বে নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে 'রূপলেখা' ও 'দেবদাস' ছবি দুটি করেছিলেন। মুক্তির পরে তিনি আরও অনেক ছবি করেছিলেন। 'মুক্তি' ছবিতে তিনি তাঁর স্বকীয় অভিনবত্ব কিছু প্রয়োগ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিমাত্রই একথা জানেন।

ক্ষমতায় ও দুর্বলতায় মিলিয়ে বড়ুয়াসাহেব ছিলেন এক আশ্চর্য প্রতিভা। তাঁর অসাধারণ শৃঙ্খলাবোধ ও সময়ানুবর্তিতা আমাকে আকৃষ্ট করতো। নায়ক-অভিনেতা হিসাবে তিনি কত বড়ো, পরিচালক হিসাবে তাঁর ঐতিহাসিক

মূল্যায়ন কী হওয়া উচিত এ-নিয়ে আজ নানান্ মতামত শুনতে পাই। আমি তাঁর কাছের মানুষ, সমসাময়িক। ঠিক বস্তুনিষ্ঠভাবে তাঁকে পরিমাপ করা হয়তো আমার পক্ষে দুরূহ। কিন্তু একটা কথা আমি বিশেষভাবে অনুভব করি। ভারতীয় সিনেমার সে-যুগের নিরিখে তিনি ছিলেন এক যুগান্তকারী পরিচালক এবং সক্ষম নায়ক ও দক্ষ অভিনেতা। আজকের দৃষ্টিতে এ-সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করা হয়তো বা একটু কঠিন।

বড়ুয়া সাহেব ছিলেন সাতিশয় বুদ্ধিমান ও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। প্রবল নেতৃত্বগুণ তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে আমার জীবনে বিপুল সুযোগ তিনি এনে দিয়েছিলেন। তাঁর ঋণ আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

বড়ুয়া সাহেব নিজের স্ক্রিপ্ট্ সহজে কাউকে শোনাতে চাইতেন না। তবে মুক্তির সংগীত-পরিচালককে তিনি একদিন নিজে পড়ে পড়ে স্ক্রিপ্ট্ শোনাতে সুরু করলেন।

এই ছবির নায়ক এক নিঃসঙ্গ চরিত্রের মানুষ। তিনি চিত্রকর, আপন শিল্পকর্মে বিভোর হয়ে থাকেন, মেশবার মতো মানুষ তিনি সহজে খুঁজে পান না। কোন কিছুতেই যেন সম্পূর্ণ তৃপ্তি পান না তিনি। তাঁর চরিত্রটি যেন—'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে।'

একদিন স্ক্রিপ্ট্ শুনতে শুনতে আমি এই গানটিই গুন্ গুন্ করছিলাম। তার আগে প্রথম যেদিন উনি আমায় স্ক্রিপ্ট্ শোনালেন সেদিন একটি বিশেষ সময়ে আমার মুখ থেকে স্বতোৎসারিত হয়ে এসেছিল আর একটি গানের কলি—'কে সে মোর কেই বা জানে···মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায় পায় কি কথা'।

তারপর একদিন আর একটি দৃশ্যের শ্রবণকালে আমি গুন্‌গুন্ করে গাইছিলাম—'ঘরে যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে, পারে যারা যাবার গেছে পারে···'।

বড়ুয়া সাহেব সাধারণত স্ক্রিপ্ট্ পড়তে পড়তে নিজের থেকে থামতেন না, যদি না আলাদা ব্যাখ্যা বা টিপ্পনীর প্রয়োজন বোধ করতেন। আমি প্রায়ই গুন্‌গুন্ করতাম, উনি কিন্তু তার দিকে মন না দিয়ে স্ক্রিপ্ট্ পড়েই যেতেন।

একদিন এই 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটির আর একটি অংশ গুন্‌গুন্‌ করছিলাম তাঁর স্ক্রিপ্‌ট্‌ পড়ার সময়। বড়ুয়াসাহেব হঠাৎ স্ক্রিপ্‌ট্‌ পড়া বন্ধ করে বলে উঠলেন—'চোখের জল ফেলতে হাসি পায়'? কেন! চোখের জল ফেলতে আবার হাসি পাবে কী করে? এর মানে তুমি ঠিক বোঝ পঙ্কজ? একটু বলো তো?

আমি থতমত খেয়ে গান থামিয়ে বললাম—কী করে বলি বলুন তো? হয়তো কারুর কারুর এমন হয়। এর বেশি বলার সাধ্য আমার নেই। একথার ঠিক মানে যে কী তা একমাত্র কবিগুরুই বলতে পারবেন।

বড়ুয়াসাহেব বললেন—পুরো গানটা একবার গাও তো পঙ্কজ।

গাইলাম। শুনতে শুনতে তিনি বিভোর হলেন, অন্যমনস্ক হলেন। তারপর চিত্রনাট্য পাঠ বন্ধ করে বললেন—আজ এই পর্যন্তই থাক। কাল আবার বসবো দুজনে, কেমন?

পরদিন স্টুডিওতে এসে আমাকে ডেকে বললেন—পঙ্কজ, তোমার 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটি আমার ছবিতে দিতে চাই, বুঝলে?

একথা শুনে আমি একটু রোমাঞ্চিত হলেও, ভয় পেলাম। বললাম—কিন্তু এটা যে রবিবাবুর গান নয়। এটা ওঁর কবিতা। আমি নিজেই সুর দিয়ে গেয়ে থাকি। সে-গাওয়া আর সিনেমায় প্রয়োগ করা কি এক জিনিস? ওঁর অনুমতি চাইতে হবে। কিন্তু চাইবই বা কী বলে?

প্রমথেশচন্দ্র কিন্তু অবিচল। বললেন—যাওনা হে, তুমি গান গেয়ে যথেষ্ট নাম করেছ, কবিগুরুকে গিয়ে একটু মিনতি করো।

আমি একটু আমতা আমতা করে চুপ করে গেলাম। বড়ুয়া সাহেব বয়সে আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়ো ছিলেন, বয়সের তফাৎটা এমন কিছু নয়। কিন্তু সিনেমার কর্মক্ষেত্রে কর্তৃত্বের দিক থেকে তিনি ছিলেন অনেক বড়ো। ব্যক্তিত্বময় গুণী পুরুষ। তিনি অগ্রজের মতো যা বলতেন সমীহ করেই শুনতাম। তাঁর কথায় অবশেষে মনস্থির করে ফেললাম। দ্বিধা ও সংশয়ে কম্পমান অবস্থায় অবশেষে একদিন কবির চরণোপান্তে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

কবি তখন প্রশান্ত মহলানবীশ মহাশয়ের বরানগরের ভবনে (আম্রপালী), যে ভবনে পরে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে, অবস্থান

করছেন। সেখানে পৌঁছে তাঁর দর্শনলাভ করলাম এবং তাঁকে প্রণামান্তে অতিকষ্টে সাহস সঞ্চয় করে, 'কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে' আমার আগমনের উদ্দেশ্য নিবেদন করলাম। তাঁকে জানালাম, প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় ও আমার সংগীত নির্দেশনায় নিউ থিয়েটার্স একটি ছবি করতে চলেছেন। গল্পটা তাঁকে একটু শোনাবার অনুমতি ভিক্ষা করলাম। অসীম ধৈর্যশীল ও স্নেহময় তিনি প্রসন্ন মুখে অনুমতি দিলেন।

চলচ্চিত্রটির তখনো নামকরণ হয়নি। আমি সংক্ষেপে কাহিনীটি কবিকে বললাম, চরিত্রগুলি কেমন তার আভাস কবিকে দিলাম। ছবির সিকোয়েন্স-গুলি পর পর কী ভাবে আসবে তাও খানিকটা বললাম। হাতে করে কাগজপত্র কিছু নিয়ে গিছলাম। একাই গিছলাম, বড়ুয়াসাহেব যাননি।

আমার মুখে কাহিনী ও সিকোয়েন্স বর্ণনা কিছুটা শুনে কবি তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ শান্ত কোমল ভঙ্গিতে বললেন—পঙ্কজ, আমি দেখছি তোমাদের ছবির সুরুতেই দ্বার মুক্ত। তোমাদের কাহিনীর মূল চরিত্রটি যেন কিসের থেকে মুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।...

মনে পড়ে, কবির কাছ থেকে ফিরে গিয়ে যখন তাঁর এই মন্তব্যের কথা প্রমথেশবাবুকে বলেছিলাম, তখন তাঁর উল্লাস দেখে কে! তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছিলেন—আরে পঙ্কজ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকেই আমার ছবির নাম বেরিয়ে এসেছে ভাই। তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব। বুঝতে পারছ তো, কী নাম? 'মুক্তি', ছবির নাম দেব 'মুক্তি'। যাক, আর কী কী বললেন বলো।...

যাই হোক, কবির এই কথার পর আস্তে আস্তে গানের কথা পাড়লাম। বিনম্র কণ্ঠে তাঁর কাছে আমাদের বাসনার কথা নিবেদন করলাম। বললাম—আপনার কয়েকটি গান আমরা এই ছবিতে ব্যবহার করতে চাই। আর চাই 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটিও এই ছবিতে আমি স্বকণ্ঠে গাইতে।

'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'র কথা বলতেই কবি কৌতুকের সংগে হেসে পুরানো কথা স্মরণ করলেন। বললেন—এ গানটি তো আমায় শুনিয়েই তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে। অমন সুন্দর গলা তোমার, পালালে কেন?

আমি সংকুচিত হয়ে মাথা হেঁট করে রইলাম। কবি আমার সঙ্কোচ দূর করার জন্যই যেন বললেন—গানটি আজ একবার খালি গলায় শোনাও তো দেখি।

এমন সুযোগ মানুষের জীবনে আর কবার আসে? আর কী কখনো আসবে আমার জীবনে? এখন আমি পরিণত কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার। সেদিনের সেই সন্ত্রস্ত তরুণ আজ আর আমি নই। এখন আমি আত্মপ্রত্যয়ে সুস্থিত। কবির আদেশকে জীবনের এক পরম সুযোগ বলে মাথা পেতে গ্রহণ করে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস সহকারে মন প্রাণ ঢেলে গানটি তাঁকে গেয়ে শোনালাম।

কবি প্রসন্ন হয়ে বললেন—সুন্দর হয়েছে, তোমার এ গান সিনেমায় গাইতে পার, আমার সম্মতি আছে। •

তারপর একটু ভেবে বললেন একটা কথা, গানে কবিতাটির ভাষায় কোথাও কোথাও একটু বদল করলে ভালো হ'ত বলে মনে করি। 'ফুলের বার নাইকো যার ফসল যার ফললো না/চোখের জল ফেলতে হাসি পায়'—এর বদলে করে নাও 'ফুলের বাহার নাইকো যাহার ফসল যাহার ফললো না/অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়'। তুমি লিখে নাও।

কবির নির্দেশ আমি নোট করে নিলাম। আমি বুঝলাম এই শব্দ পরিবর্তনের ফলে সুরের সংগে বাণীর একাত্মতা আরো গভীর হলো। উচ্চারণের দিক দিয়ে শব্দগুলি আরো জোরালো হওয়ার জন্য সুর আরও অনেক সাবলীলভাবে বসে গেল।

সেদিন বিশ্বকবির চরণে অনেকক্ষণ বসে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। কথায় কথায় কবি নিজের থেকেই তাঁর দু'একটি গানের উল্লেখ করে বল্লেন যে আমরা ইচ্ছে করলে তাঁর সেই গানগুলি এই ছবিতে ব্যবহার করতে পারি। কবির এই স্বতঃ প্রণোদিত আগ্রহ যে আমার মধ্যে কী প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করেছিল তা ভাষায় বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই। কবি বিশেষ করে একটি গান সম্পর্কে তাঁর সবিশেষ দুর্বলতা প্রকাশ করলেন। গানটি হচ্ছে 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে'। কবি বল্লেন—এ গানটি তুমি ব্যবহার কর। আমি আনন্দ পাব।

কবির কথায় আমি মনে মনে কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে বিহ্বল হয়ে যাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম কখন আমি ফিরে গিয়ে প্রমথেশবাবুকে এই বার্তা জানাব।

কবির কাছ থেকে তাঁর অপূর্ব ভক্তিরসাশ্রিত বাউলাঙ্গের গান—'আমি

কান পেতে রই / আমার আপন হৃদয়-গহন-দ্বারে—এটিও সেদিন মুক্তি ছবিতে ব্যবহার করার অনুমতি পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। সেদিনের রবীন্দ্র-সান্নিধ্য আমাকে আশাতীত পুরস্কার দিয়েছিল। তাঁর অপর একটি অনুপম গীতিও তিনি ব্যবহার করতে বল্লেন। সেটি—'তার বিদায়বেলার মালাখানি আমার গলে রে…'।

'মুক্তি' ছবিতে শ্রীমতী কানন দেবীর কণ্ঠে গাইয়েছিলাম—'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' এবং 'তার বিদায়বেলার মালাখানি'। আমি নিজে গেয়েছিলাম—'আমি কান পেতে রই' এবং 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'।

সেদিন কবির সঙ্গে এত আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে, তাঁর দিক থেকে এত আগ্রহের পরিচয় পেয়ে এবং এত বিষয়ে অনুমতি লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে হয়েছিল। তাঁকে প্রণাম করে মনটি কানায় কানায় ভরে নিয়ে আমি ফিরেছিলাম।

*   *   *

প্রমথেশবাবু 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটি আমার গলাতেই গাওয়াতে চেয়েছিলেন। আমার কাছে কবি সন্দর্শনের বর্ণনা পেয়েই চিত্রকাহিনীতে আমার উপযোগী একটি চরিত্র তৈরী করে ফেল্লেন। বল্লেন—এই চরিত্রে তোমাকে অভিনয় করতে হবে।

অভিনয়ে কোনদিনই আমি পটু নই। অনেক ওজর-আপত্তি করলাম। কিন্তু তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য আমার ছিল না। বাধ্য হয়ে তাঁর ব্যবস্থা আমায় মেনে নিতে হ'ল।

কবির যে দুটি গান আমি গেয়েছিলাম সে দুটি, বিশেষত 'আমি কান পেতে রই' গানটি আমার অভিনীত চরিত্রকে বেশ একটু মহত্ত্ব ও মর্যাদা দান করেছিল এমন অভিমত অনেকের মুখেই পরে শুনেছি। তাছাড়া দুটি গানই বিপুল ভাবে জনসমাদৃত হয়েছিল এও জানি। 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটি তো 'মুক্তি' সিনেমার মাধ্যমেই ভবিষ্যতের জন্য প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। প্রসঙ্গত বলি, সাম্প্রতিককালে বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী স্নেহভাজন শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় আমার সম্মতি নিয়ে এই গানটি স্বকণ্ঠে গেয়ে তাঁর ছবিতে প্রয়োগ করে গানটির পুনঃ প্রচার করায় আমি আনন্দিতই হয়েছি।

'মুক্তি'তে রবীন্দ্রনাথের গানের বাইরে আমি গেয়েছিলাম বন্ধুবর অজয় ভট্টাচার্য রচিত 'কোন লগনে জনম আমার এ দুনিয়ার ঘরে/মাণিক বলে চাইরে যারে ধূলি হয়ে ঝরে/সুখের সাথে বিবাদ আমার হ'ল চিরতরে···' এবং অগ্রজপ্রতিম সজনীকান্ত দাস মহাশয় রচিত—'তুমি ভুল করো না পথিক/শোন শোন মিনতি···'।

মনে পড়ে, পরে একদিন অজয়-এর লেখা ওই গানখানির প্রশংসা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে করেছিলেন। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে তিনি বলেছিলেন—'মাণিক বলে চাইরে যারে ধূলি হয়ে ঝরে···' বাঃ, সুন্দর কথা লিখেছে অজয়।

শ্রীমতী কানন ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়ার বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথের গান দুটি ছাড়াও তিনি গেয়েছিলেন সজনীকান্ত-রচিত একটি গান—'ওগো সুন্দর, মনের গহনে তোমার মুরতিখানি, ভেঙে ভেঙে যায় মুছে যায় বারে বারে / বাহির বিশ্বে তাইতো তোমারে টানি···' এই গানটিও সেযুগে বিপুল জনসম্বর্ধনা লাভ করেছিল।

অভিনয়কুশলতা ছাড়াও শ্রীমতী কাননের কণ্ঠে ছিল বিধাতার অকৃপণ দান। আমি তাঁকে কেমন করে 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' গানখানি শিখিয়েছিলাম সেকথা তিনি তাঁর 'সবারে আমি নমি' গ্রন্থে লিখেছেন। আমার শিক্ষকতা ও সঙ্গীত পরিচালনার প্রতি তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আমার শুধু আজ মনে পড়ে এই গান শেখাতে গিয়ে আমি তাঁকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাব্যসঙ্গীত বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বুঝিয়ে তাঁর রবীন্দ্ররুচিকে উন্মেষিত হ'তে সাহায্য করেছিলাম। ভক্তি ও নিষ্ঠারগুণে তিনি আমার প্রয়াসকে সফল করেছিলেন। শিক্ষার্থীর আদর্শ বিনয় ও নম্রতা মিশে থাকতো তাঁর আচরণে। তাঁর মধ্যে ছিল সঙ্গীত-পূজারিণীর আত্মনিবেদন। 'মুক্তি' ছবির রবীন্দ্রগীতিগুলি তিনি কেমন গেয়েছিলেন তা সেদিনকার বাঙালিসমাজ জানেন। অমন প্রাণঢালা দরদ দিয়ে আজ পর্যন্ত খুব কম শিল্পীই ঐ গানগুলি গাইতে পেরেছেন।

আমি যতদূর জানি, আমারই মতন শ্রীমতী কানন তাঁর জীবনে নানান্ নিন্দা, অপবাদ ও ঈর্ষার লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন। কিন্তু প্রত্যাঘাত কখনও করেননি। এই এক জায়গায় আমাদের খুব মিল।

১৫

কথায় কথায় মনটা হঠাৎ এগিয়ে আসে নিউ থিয়েটার্সের শেষ দিনগুলির স্মৃতিতে। শুনেছি, এ যুগের মহাবিজ্ঞানীর মতে, সময় সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণাশক্তি তা নিছকই একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। আসলে নাকি 'মহাবিশ্বে মহাকালে' চলমান সময় বলে কিছু নেই। সময় নাকি একটি স্থির মাত্রা, আমাদের ত্রিমাত্রিক ধারণার অতীত এক বস্তু—আধুনিক আপেক্ষিকতাবাদের ভাষায় চতুর্থ মাত্রা', এবং মহাবিশ্বের রূপবিচারের ক্ষেত্রে অপর তিনটি মাত্রার মতো এটিও অপরিহার্য। এ-তত্ত্বকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা আমার সাধ্যের অতীত, কিন্তু আজ যখন আমার জীবনসায়াহ্নে পিছন ফিরে তাকাই তখন সেই সব অতীত দিনগুলির অপসৃয়মান রূপটি আর ঠিক তেমন ভাবে দেখতে পাইনে। আজ মনে হয়, আগের ও পরের নানান্ ঘটনা যেন একাকার হয়ে এত স্তব্ধ উদ্যান রচনা করেছে। যেন কোনো নিগূঢ় নিয়মে কালানুক্রমকে অস্বীকার করে তারা সেই উদ্যানে যে যেখানে পেরেছে স্থান করে নিয়েছে। একদিন যারা আমার জীবনে কর্মবেগ সঞ্চার করেছিল, আজ তারা কোন্ অদৃশ্য শক্তির আদেশে যেন এক অচঞ্চল রূপ পরিগ্রহ করেছে।

তাই, কী জানি কেন, নিউ থিয়েটার্সের প্রথম যুগের কথা বলতে গিয়ে তার পাশাপাশি শেষের দিনগুলির স্মৃতি আমার কাছে এই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মনে পড়ে, বোধ করি ১৯৪০ সালেই হবে, বোম্বাই চিত্রজগৎ থেকে তার পক্ষে উপযুক্ত একটি অফার পেয়ে বন্ধু রাইচাঁদ চলে গেল। আমার তখন মনে হয়েছিল তার সঙ্গীত রুচি কি বোম্বাই ফিল্মের স্থূল চাহিদা মেটাতে পারবে? সে কি পারবে সেখানে টিকতে?

কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পেরেছিলাম। রাই সেখানে থাকতে পারে নি, ফিরে এসেছিল।

কিছুকাল পরে, ১৯৪৩ সালে বোম্বাই থেকে আমার কাছেও অনুরোধ এসেছিল। তখন নিউ থিয়েটার্সের 'কাশীনাথ' ছবি মুক্তি পেয়েছে। খুবই মোটা অঙ্কের অফার—যে-পরিমাণ অর্থের কথা ক্রমক্ষীয়মাণ নিউ থিয়েটার্সের ফ্লোরে বসে কল্পনাই করা যেত না তখন।

একবার মনে হলো, চলেই যাই, নিউ থিয়েটার্স আমায় এখন কীই বা দিতে পারছে? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, একী ভাবছি আমি? নিউ থিয়েটার্সই তো আমার অর্থাৎ সংগীত পরিচালক পঙ্কজ মল্লিকের স্রষ্টা! আমার জীবন ও জীবিকাকে মিলিয়ে নেবার সাধনক্ষেত্র তো এই নিউ থিয়েটার্সেরই অঙ্গন! আজ অর্থের মোহে একে ছেড়ে যাব?

সরকার সাহেব, অর্থাৎ বীরেন্দ্রনাথ সরকার (নিউ থিয়েটার্স এর কর্তা) বললেন—আপনাকে ওদের মতো টাকা দেবার ক্ষমতা আজ আমার নেই। আপনি যান, সুযোগ না ছাড়াই ভালো।

কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত যেতে পারলাম না। আমার বিবেক আমায় নিষেধ করেছিল। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় আর মোটা ভাতই আমার ভালো। প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে গৃহদেবতার কাছে আত্মসমর্পণ করে আকুল আবেদন করেছিলাম—ঠাকুর আমায় মোহজালে জড়িয়ো না, আমার সংশয় ঘোচাও।

অন্তর্যামীও একই উত্তর দিয়েছিলেন। আমি যাইনি। বোম্বাই-ফিল্মে নিবেদন করার মতো রস আমার ভাণ্ডারে ছিল না। মনে পড়েছিল—

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া।
বিতর তানি সহে চতুরানন ॥
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্।
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥

অর্থাৎ, হে চতুরানন ব্রহ্মা, তুমি আমায় ক্ষুদ্র শোকতাপ যতো ইচ্ছা দাও, তা আমি সয়ে নিতে পারব। কিন্তু তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, অরসিকের নিকট রস নিবেদন করার মতো দুর্ভাগ্য আমার ললাটে তুমি লিখো না, লিখো না, লিখো না।

সেই সময় অধিক অর্থাগমের আশায় একে একে অনেকেই নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কেবল আমি আর আমার মতো কয়েকজন তখনো বন্ধ মেহের আলির মতো প্রাসাদ আগলিয়ে আছি।

জার্মান চলচ্চিত্র-পরিচালক পল্ জিলস্ কলকাতায় এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' অবলম্বনে হিন্দী ছবি 'জলজলা' তুলতে।

আমার কাছে তিনি সংগীত পরিচালনার অনুরোধ নিয়ে আসতেই আমি বললাম যে এ-ছবির গান ও আবহসংগীত কলকাতায় রেকর্ড করতে হবে। আমি বোম্বাই যেতে পারব না। পল জিল্‌স্‌ বুঝেছিলেন আমার মনোভঙ্গিটা কী। তিনি আমার কথা গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দী ছবি 'সম্রাট' প্রস্তুতির সময় পরিচালক জ্ঞান মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আমার অনুরূপ ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছিলেন।

শ্রীমতী গীতা রায় (দত্ত) বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে জলজলা'র গান রেকর্ড করেছিলেন। কলকাতার আমার গৃহেই সেই গানগুলির তালিম নিয়েছিলেন তিনি। 'সম্রাট' ছবির গানগুলি সংগীত পরিচালক আমি ও কলকাতার দুতিন জন মহিলা কণ্ঠশিল্পী কলকাতাতেই রেকর্ড করেছিলাম।

ভারতীয় ফিল্ম-জগতে নিউ থিয়েটার্স তথা কলকাতার গৌরবময় নেতৃত্বের কথা আর কোনো কোনো সমসাময়িকের মতো আমিও ভুলতে পারিনি কখনো। আমার মন কেবল মহাকবির ভাষায় গুঞ্জরণ করতো—

> 'যা আমার সবার হেলা-ফেলা, যাচ্ছে ছড়াছড়ি—
> পুরানো ভাঙা দিনের ঢেলা, তাই দিয়ে ঘর গড়ি।'

নিউ থিয়েটার্সকে ছেড়ে যাব না, এই ছোট্ট সিদ্ধান্তটুকু যে-মুহূর্তে চূড়ান্ত হয়েছিল আমার মনে, সেই মুহূর্তে যে কী অপার মুক্তির অনুভূতি আমাকে লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল 'আলোয় আলোয় এই আকাশে' তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। তবু আজ মনে পড়ে, যে নিউ থিয়েটার্সের প্রাঙ্গণকে এত ভালবেসেছিলাম, সেখানেও অবহেলা কম জোটে নি। আমি সেখানে ছিলাম বেতনভোগী সংগীত পরিচালক। সেই হিসাবে গোড়ার থেকেই সমমর্যাদাসম্পন্ন আমাকে কর্তৃপক্ষ প্রায়ই আমার সহকর্মী বন্ধুর কোনো এক সময়ের অধীনস্থ বলে বর্ণনা করেছেন। এ-রহস্যের কারণ আমার অজ্ঞাত। এই তথ্যবিকৃতি যদিও অবহেলার যোগ্য, তথাপি সমসাময়িকদের মুখে এমন কথা শুনলে মনঃপীড়া হয়।

আর একটা কথাও মনে হয়, সংগীত পরিচালক হিসাবে বেতনভোগ করেছি বটে, কিন্তু কণ্ঠশিল্পী ও অভিনেতা হিসাবে কখনো কিছু পেয়েছি বলে মনে

পড়ে না। মাঝে মাঝে মনে হতো, কর্তৃপক্ষ নাই বা পারলেন দিতে, সেকথা মুখেও তো একবার বলতে পারতেন।

কিন্তু না, সেকথা থাক। নিউ থিয়েটার্স আমার ধাত্রীমাতা, তার সুখ-স্মৃতিতেই ফিরে আসি।

পুতুলদা অর্থাৎ নীতীন বসু মহাশয়ের উল্লেখ আগেই আমি করেছি। প্রথম দিকে উনি ছিলেন নিউ থিয়েটার্সের আলোকচিত্র পরিচালক অর্থাৎ ক্যামেরা-বিভাগের দায়িত্বে। পরে তিনি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ চিত্র পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ওঁর এই উন্নতিতে আমার খুবই আনন্দ হতো। আমার পাশের পাড়ার লোক তিনি। আমি থাকতাম মানিকতলার কাছে চালতাবাগানে, উনি থাকতেন কাছেই, আমহার্স্ট স্ট্রীটে তখন মর্টন ইনস্টিটিউশান নামে এক বিদ্যায়তন ছিল, তারই উত্তরে। প্রতিদিন স্টুডিওতে যাবার সময় পুতুলদা আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতেন আমাদের বাড়ির থেকে। এর ফলে আমাদের একটা বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

পুতুলদার প্রথম ছবি হিন্দী 'দেবদাস'। দ্বিতীয় ছবি বাংলা 'ভাগ্যচক্র' ও তার হিন্দী-রূপ 'ধূপছাঁও'। যতদূর স্মরণ করতে পারি, সেটা ছিল ১৯৩৫ সাল। নায়ক ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল, নায়িকা উমাশশী দেবী। বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও অমর মল্লিক মহাশয়দ্বয় ছবির দুটি বড়ো চরিত্রে ছিলেন। ছবির নায়কের নাম আগেই বলেছি, তিনি পাহাড়ী সান্যাল, আমার প্রায় সমবয়সী। অভিনয়কলা, সংগীতচর্চা ও বিদ্যাচর্চায় সারাজীবন ধরে আপন বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে, বাঙালীর হৃদয়ে তাঁর জনপ্রিয়তার আসনখানি অবশেষে শূন্য করে দিয়ে কিছুকাল আগে তিনি ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন।

'ভাগ্যচক্র' ছবির পরিচালক হিসাবে পুতুলদার কাজের চাপ খুব বেড়ে গিয়েছিল। ফলে সে সময় তিনি খুব সকাল সকাল স্টুডিওতে যাওয়া আরম্ভ করেছিলেন, আমাকেও তাই খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে হতো।

একদিন পুতুলদা যথারীতি গাড়ি নিয়ে এসে পড়েছেন, আমি তখন উপরের ঘরে বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। পাশের বাড়িতে সেকালের একটি বিখ্যাত ইংরেজি গানের রেকর্ড বাজছিল। গানটি তখনকার এক নামকরা ইংরেজি ছায়াছবির গান, ছবিটির নাম PAGAN—প্রসিদ্ধ গায়ক Ramon Novarc-র গাওয়া Pagan Love Song—কথাগুলি, যতদূর মনে পড়ে, এই ছিল—

Come with me where moonbeams
Light Tahitian skies
And the starlit waters
Linger in your eyes…
Native hills are calling.
To them we belong
And we will cheer each other
With the Pagan Love Song…

এই গান আমার ঘর থেকে শুনতে শুনতে আমি গলা মিলিয়ে গেয়ে চলেছি। শুনতে পাচ্ছি না যে পুতুলদা আমায় ডাকছেন।

হঠাৎ কানে এলো—পংকজ, পংকজ।

তবু রেকর্ডটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি থামতে পারছি না। এমন সময় বাবা এসে খবর দিতে আমি তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এলাম। দেখি, পুতুলদার মুখখানি গম্ভীর ও চিন্তামগ্ন। দেখেশুনে আমি বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। পিছনে আমি আর সামনে পুতুলদা ও ড্রাইভার মহাশয় অর্থাৎ পুতুলদারই ভাই মুকুল।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো। পুতুলদার নীরব-গম্ভীর বদনটি দেখে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। আমতা আমতা করে সুরু করলাম—পুতুলদা, কিছু মনে করবেন না, আপনার ডাকে সাড়া দিতে পারিনি। একটা ইংরেজি গানের রেকর্ড বাজছিল, তার সঙ্গে গাইতে গাইতে এমন মেতে উঠেছিলাম যে…

পুতুলদা নিরুত্তর। সিগারেট টানতে লাগলেন। তথাপি আরও দু-একবার আমি গায়ে পড়ে তাঁকে কৈফিয়ৎ দেবারচেষ্টা করলাম কিন্তু ওঁর চিন্তান্বিত ভাবটি অটুট রইলো। সাড়া দিতে বিলম্ব হওয়ার জন্যই কি পুতুলদা ক্ষুব্ধ?

চৌরঙ্গীতে লাইট হাউসের কাছে আসতেই ট্রাফিক পুলিশের ইঙ্গিতে গাড়ি থামলো। পুতুলদা টপ করে নেমে পড়ে ফুটপাথের দিকে চলে গেলেন। ভাইকে বলে গেলেন মিউজিয়ামের কাছে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে।

যথাস্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখি পুতুলদা ফিরছেন, হাতে কয়েকটি ইংরেজি ম্যাগাজিন। পুতুলদা উঠতে গাড়ি চললো স্টুডিওর দিকে।

তিনি সেই একই রকম ভাবগম্ভীর ভঙ্গিতে ধূম্রজাল বিস্তার করতে করতে চললেন। তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ রঙ্গরস আজ গেল কোথায়? কী এমন দোষ করেছি রে বাবা…?

গাড়ি টালিগঞ্জ পৌঁছে স্টুডিওতে ঢুকতেই পুতুলদা নেমে হন্ হন্ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমিও অগত্যা আমার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। মুকুলও গাড়ি রেখে তাঁর নিজের জায়গায় যাবার উদ্যোগ করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আমার ডাক পড়লো। পুতুলদা লোক দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি ভয়ে ভয়ে গিয়ে হাজির হলাম। ওঁর সামনে গিয়ে আমি আমতা আমতা করে বলতে গেলাম—পুতুলদা, সকালের ব্যাপারটায় কিছু মনে করবেন না যেন, আমি, মানে…

এইবারে পুতুলদা বলে উঠলেন—চুপ কর তো তুই এখন। আমার মাথায় এখন একটা নতুন আইডিয়া ঘুরছে আর তুই সেই থেকে একঘেয়ে বকে যাচ্ছিস্! চুপ করে দাঁড়া।

এই বলেই পুতুলদা গ্রামোফোনে একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিলেন। চৌরঙ্গী থেকে যে ম্যাগাজিনগুলি তিনি এনেছিলেন তার একটির মধ্যে এই রেকর্ডটি ছিল। বেজে উঠতেই বুঝলাম এটি সেই Pagan Love Song!

পুতুলদা সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন—পঙ্কজ, শিগগির ওটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গা, ঠিক বাড়িতে যেমন গাইছিলি—নে, নে, কুইক্……

আমি তো প্রথমে ব্যাপারটির কিছুই বুঝতে পারিনি। কিন্তু পুতুলদার তাড়া খেয়ে রেকর্ডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে সুরু করে দিলাম। গান শুনতে শুনতে পুতুলদা একবার এদিক থেকে একবার ওদিক থেকে আমাকে তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর এই আচরণের তাৎপর্য তখনো ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছি না।

কিন্তু তাঁর আসল উন্মাদনা সুরু হলো গান শেষ হবার পর। গান থামার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন। স্থান-কাল-পরিবেশ ভুলে সে কী প্রলয় নাচন! নাচতে নাচতে তাঁর চীৎকার চললো —পেয়েছি রে পঙ্কজ, পেয়েছি! এতদিনে যে কত বড়ো সমস্যার সমাধান হলো! তোকে কী বলে অভিনন্দন জানাব ভাই। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম রে…কী শুভক্ষণেই না তুই তোর বাড়ীতে এই রেকর্ডটার সঙ্গে

গাইছিলি···কী বিরাট আইডিয়াই যে তুই আমার মাথায় খেলিয়ে দিলি ভাই···

আমি তো তাঁর নর্তনের ধাক্কায় হিম্‌ সিম্‌ খাচ্ছি। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝলাম কয়েক মুহূর্ত পরে এবং ভারতীয় সিনেমার এমন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের প্রথম ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে রইলাম, যে-মুহূর্তে প্লে-ব্যাক পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটলো। শুধুই কি সাক্ষী! নিজের অজ্ঞাতেই আমি এই ঘটনার প্রধান চরিত্র হয়ে গেলাম, যদিও এই আইডিয়ার আবিষ্কর্তা আমি নই, স্বয়ং চিত্র-পরিচালক নীতীন বসু মহাশয়। একটা যুগান্তর ঘটে গেল নিঃশব্দে, অথবা অতি সামান্য শব্দেই। একা পুতুলদার চীৎকার কতটুকুই বা শব্দ-তরঙ্গ তুলতে পেরেছিল! ভারতীয় ফিল্‌ম্‌-শিল্পে প্লে-ব্যাক প্রথার জনক হিসাবে সেই দিন থেকেই তিনি অমরত্ব লাভ করলেন।

রুপালী পর্দায় এক নতুন যুগের সূচনা হলো। এখন থেকে গায়ক-অভিনেতা বা গায়িকা-অভিনেত্রী আর না হলেও চলবে। নায়ক-নায়িকার চরিত্রের জন্য সুন্দর মুখের অভাব আর বোধহয় হবে না, তাঁরা কেবল অভিনয়-পটু হলেই চলবে। সুকণ্ঠ গায়কের কণ্ঠনিঃসৃত গান চলবে ফিল্‌মে, গানের সঙ্গে নায়ক-নায়িকা প্রয়োজনমতো ঠোঁট মিলিয়ে যাবেন কেবল। আর তাঁদের ঠিক-ঠিক ছন্দ-বোধ থাকলে তো কথাই নেই। নেপথ্যে ভালো গায়ক-গায়িকার কণ্ঠ বাজবে লাউড-স্পীকারের মাধ্যমে, গায়ক-চরিত্র বা গায়িকা-চরিত্র ঠোঁট মিলিয়ে যাবেন, ক্যামেরা নির্ঝঞ্ঝাটে এগিয়ে চলবে, মিউজিক-হ্যান্ড্‌সদের ছবিতে এসে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। ইচ্ছামতো লঙ শট্‌, মিড শট্‌, ক্লোজ-আপ সবই স্বচ্ছন্দে নেওয়া চলবে।

একটা কথা বলি এখানে। আজকের দর্শকের কাছে যে প্লে-ব্যাক অত্যন্ত সহজ বলে মনে হয়, সেদিন তা তেমন ছিল না। এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ, বলা বাহুল্য, পুতুলদার ছবি 'ভাগ্যচক্র'তেই করা হয়েছিল। ভারতীয় সিনেমার ঘূর্ণায়মান ভাগ্যচক্র নিউ থিয়েটার্সের অঙ্গনেই অনেক শুভ মুহূর্তকে উদ্বোধিত করেছিল। এটা ছিল তারই একটি। বাংলা ও হিন্দী দ্বিভাষিক ভাগ্যচক্র ও ধূপছাঁও ছবির দুখানি সখিদের গান দিয়ে ভারতবর্ষে প্রথম প্লে-ব্যাক পদ্ধতির প্রয়োগ আরম্ভ হলো। বাংলা গানটি ছিল, বাণীকুমার রচিত—'মোরা পুলক যাচি, তবু সুখ না মানি/যদি ব্যথায় দোলে তব হৃদয়খানি···'।

আর এর হিন্দী রূপান্তর ছিল পণ্ডিত সুদর্শন রচিত—'মৈ খুশ হোনা চাহু, খুশ্ হো ন সকূ/জব তক হৈ তেরা চেহরা উদাস…'।

ছবিতে এই গানগুলি গেয়েছিল সখিরা অর্থাৎ কিছু সুন্দরী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে যাদের পুতুলদা সখি সাজাবার জন্য সংগ্রহ করিয়েছিলেন। নিউ থিয়েটার্সেরই জনৈক কর্মচারী এঁদের সংগ্রহ করতেন। এই ধরণের প্রয়োজনে বাঙালী বা ভারতীয় মেয়েদের দরকার হলে এই কমচারীটি বিভিন্ন নিষিদ্ধ পল্লী থেকে সংগ্রহ করে আনতেন। এ-ক্ষেত্রে অবশ্য অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের পাড়া থেকেই এদের এনেছিলেন। সে-যুগের নামী গায়িকাদের দিয়ে গাইয়ে এই সব মেয়েদের ঠোঁট মেলাবার মহলা দেওয়া হয়েছিল অনেকবার। তারপর ছবি তোলা হয়েছিল। সখিদের এই সমবেত সঙ্গীতে প্রকৃতপক্ষে যাঁদের কণ্ঠ ছিল, তাঁরাই এ-দেশের প্রথম প্লে-ব্যাক গায়িকার সম্মান দাবি করতে পারেন। এঁরা হচ্ছেন শ্রীমতী সুপ্রভা ঘোষ (পরে সরকার) শ্রীমতী পারুল চৌধুরী (পরে ঘোষ) ও শ্রীমতী উমাশশী দেবী।

১৬

গানের নেশায় প্রথম যৌবনে যখন বিভোর হয়ে আছি তখন একদিন গান রেকর্ড করার বাসনা আমাকে পেয়ে বসলো। সেই বয়সে যে কোন গায়কের পক্ষে এই বাসনাই স্বাভাবিক। ১৯২৭ সালে রেডিয়োতে (ইনডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী) গান ব্রডকাস্ট করার পর বাসনাটি তীব্র হয়ে উঠল। অনুসন্ধান করে জানলাম উত্তর কলকাতায় চিৎপুর রোড অঞ্চলে বিষ্ণুভবন নামক একটি গৃহে গ্রামোফোন কোম্পানীর শিল্পীদের গান শেখানো হয়, রিহার্সালও হয়। সেখানে শিল্পীদের রেকর্ডিং এর ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থাপনার কর্মকর্তা ছিলেন ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়। একদিন সাহস করে বিষ্ণুভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার মনোবাসনা নিবেদন করলাম। তাঁর কাছে জানলাম, সেই সময়ে বিমল দাশগুপ্ত (পরবর্তীকালের স্বনামখ্যাত সুরকার কমল দাশগুপ্তের অগ্রজ), কে, মল্লিক, জমীরুদ্দিন খাঁ এবং ধীরেন দাস মহাশয়গণ সেখানে সংগীতশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের নির্দেশে আমি এই শিক্ষক-চতুষ্টয়ের কাছে প্রার্থী-রূপে উপস্থিত হয়েছিলাম। তাঁরা নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী যে যখন সাক্ষাৎ করতে বলেছেন, করেছি। গান শোনাতে আদেশ করলে শুনিয়েছি। কিন্তু প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ওজর দেখিয়ে এড়িয়ে গেছেন। কেউ বললেন—'আপনি হিন্দী ভজন ও গীত করুন, সেটাই আপনার গলায় ভালো হবে, অতএব ওঁর কাছে যান।' কেউ বললেন—'আপনার তো কীর্তনের গলা, কীর্তন রেকর্ড করুন, আপনি বরং ওঁর কাছে যান।' ইত্যাদি ইত্যাদি…।

বার বার ধরনা দিয়ে এবং সকলের কাছেই এই ধরণের মিথ্যা স্তোক শুনে বিরক্তি জন্মে গেল। অবশেষে ক্ষুব্ধ হয়ে বিষ্ণুভবনে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম।

যতদূর মনে পড়ে, কয়েকমাস পরে ধর্মতলা স্ট্রীটে Violophone Company নামে একটি প্রতিষ্ঠানের খবর পাই। সুহৃদপ্রবর বাণীকুমারকে নিয়ে একদিন সন্ধ্যায় সেখানে উপস্থিত হলাম। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার মহাশয় ছিলেন বাঙালী,—আজ আর তাঁর নামটি স্মরণ করতে পারছি না,—প্রকৃতই সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর কাছে আমার বাসনা নিবেদন করলাম এবং গান শোনালাম।

তিনি স্পষ্টই বললেন যে গান শুনে তিনি প্রীত হয়েছেন এবং আমাকে রেকর্ড করার সুযোগ দিতে তিনি প্রস্তুত। একটি দিন স্থির করে তিনি আমায় আসতে বললেন রেকর্ডিং-এর উদ্দেশ্যে।

আজ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি, তাঁর প্রদত্ত সুযোগের ফলেই আমার জীবনের প্রথম ডিস্‌ক্‌ রেকর্ডিং সম্ভবপর হয়েছিল। নির্দিষ্ট দিনে আমি উপস্থিত হয়ে বাণীকুমারের বাণী ও আমার সুরে দুটি বর্ষার গান গেয়েছিলাম। প্রথম গানটি ছিল—'নেমেছে আজ নবীন বাদল ব্যথার গুরুভারে'। দ্বিতীয় গানটির বাণী ভুলে গেছি, ডিস্‌ক্‌খানিও আমার সঞ্চয়ে আজ নেই।

একটি মানুষের মাথা গলানো যায় এমন একটি চোঙার ভিতর সম্পূর্ণ বদনমণ্ডল প্রবিষ্ট করিয়ে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইতে হলো—সে যুগে ম্যাট্রিক্স্-এর উপর রেকর্ডিং এইভাবেই হতো, মাইক্রোফোন সিস্টেম তখনো চালু হয়নি। মাইক্রোফোন হওয়ার পর ম্যাট্রিক্স্ রেকর্ডিং আরো সহজ ও সুন্দর হয়েছিল, কিন্তু সে আরো পরের কথা।

যাই হোক চোঙের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে হারমোনিয়ম বাজিয়ে রেকর্ড করলাম। রেকর্ডটি বাজারে বেরিয়েছিল, কিন্তু বাণিজ্যিক সাফল্য বিশেষ হয়েছিল বলে শুনি নি। কোম্পানীটিও এই বিষয়ে বিশেষ তৎপর ছিলেন না। কবিকে বা গায়ককে তাঁরা কোনো পারিশ্রমিক দেন নি। বস্তুত, এই স্বল্পায়ু প্রতিষ্ঠানটি কিছুদিন পরেই উঠে গিয়েছিল বলে শুনেছিলাম।

* * *

বিলাতে ই, এম, আই নামে একটি বিরাট রেকর্ডিং প্রতিষ্ঠান আছে। এর শাখা-প্রশাখা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে। আমাদের দেশে তখন এর শাখা ছিল—গ্রামোফোন কোম্পানী—যা সাধারণভাবে H.M.V. নামে পরিচিত। বহু পুরাতন এই প্রতিষ্ঠান।

যতদূর মনে পড়ে, ১৯৩৩ সালে ই এম্ আই এর অপর একটি শাখা—Columbia Graphophone Co. কলকাতায় এসে অফিস খুলেছিল। ওয়াটার্লু স্ট্রীটে একটি বাড়ির অংশ ভাড়া নিয়ে এঁদের অফিস সুরু হয়েছিল এবং ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস-এর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এঁরা ১, গার্স্টিন প্লেস-এর বাড়িতে বেতারের বৃহত্তম ঘরটি এবং তৎসংলগ্ন ছোট আর একটি কক্ষ

ভাড়া নিয়ে রেকর্ডিং-এর কাজ আরম্ভ করেন। কলাম্বিয়ার জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন, L. A. Wright নামক জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক।

বেতারে গান ব্রডকাস্ট করে ও সংগীতশিক্ষার আসর পরিচালনা করে তখন আমি গায়ক ও সংগীত শিক্ষক হিসাবে সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ করেছি। এই Columbia Company র প্রাথমিক অবস্থায় একদিন আপনিই প্রস্তাব এলো তাঁদের সংগীত শিক্ষকের কার্যভার গ্রহণ করার।

এখনকার অনেকেই জানেন না হয়তো, পরবর্তী যুগের বাংলা নাট্য-আন্দোলন-ক্ষেত্রের বিশিষ্ট পুরুষ তুলসী লাহিড়ী মহাশয় সংগীতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কলাম্বিয়া আমার এবং তাঁর কাছে সংগীত শিক্ষকের কর্ম গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমাদের কাজ হবে রেকর্ড-শিল্পী নির্বাচন এবং তারপর তাঁদের রেকর্ড করার জন্য যথাযথভাবে গানের ট্রেনিং দেওয়া। আমরা উভয়েই সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করি এবং বিভিন্ন বেতার-শিল্পী বা অন্যান্য শিল্পী —যাঁরা অন্য কোনো রেকর্ডিং কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ নন্—তখনকার রীতিই ছিল এই রকম—তাঁদের দিয়ে কলাম্বিয়ার রেকর্ডিং সুরু করি। গীত-রচয়িতা হিসাবে সুহৃদবর বাণীকুমার তো ছিলেনই, আরো কয়েকজনও ছিলেন।

কয়েক মাস পরে কলাম্বিয়ার রিহার্সাল রুম স্থানান্তরিত হয় এবং অবশেষে HMV-এর দমদম্ স্টুডিয়োতে ভাড়ার বিনিময়ে কলাম্বিয়ার রেকর্ডিং করার স্থায়ী ব্যবস্থা হয়। কলাম্বিয়া ব্যবসায়িক দিক থেকে ক্রমেই বিভিন্নমুখী সাফল্য অর্জন করতে থাকে। আমাদেরও উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন গ্রামোফোন কোম্পানীর পূর্বোক্ত ভগবতী ভট্টাচার্য মহাশয় রিহার্সাল রুমে এসে আমাকে গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে শিক্ষক ও শিল্পী হিসাবে চুক্তিবদ্ধ হবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

আমি তখন তাঁকে ১৯২৭ এর সেই বিষ্ণুভবনের অভিজ্ঞতার কথা সবিনয়ে নিবেদন করলাম। তাঁর মনে পড়লো কিনা জানি না। আমি তাঁকে জানালাম আমি তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে অক্ষম, কারণ সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা তখনো আমার স্মৃতিকে পীড়া দিচ্ছে।...

• •

এই কলাম্বিয়ায় আমার রেকর্ডিং-এর ইতিহাসে একটি বেশ মজার ঘটনা

আছে। রেকর্ডশিল্পীদের মধ্যে অনেকা ছিলেন শ্রীমতী পঙ্কজিনী। একবার তাঁর রেকর্ডিং-এর জন্য তাঁকে আমি দুটি গান তুলিয়ে দিয়েছিলাম—সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায় রচিত আমার সুরে দুটি গান—"ও কেন গেল চলে, কথাটি নাহি বলে" এবং "আমারে ভালবেসে আমারি লাগিয়া সয়েছ কত ব্যথা, বেদনা, অপমান"। (শেষের গানটির একটি প্যারডি করেছিলেন নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়—"আমারে ভালবেসে আমারি লাগিয়া খেয়েছ কত আতা, বেদানা মিঠেপান")।

কথা ছিল, সৌরীনদা রচিত এই গানদুটি শ্রীমতী পঙ্কজিনীর কণ্ঠে রেকর্ডিং হবে দমদম্ স্টুডিয়োতে। কিন্তু দু একজন ছাড়া সকলেই ভুল বুঝেছিলেন। আমি আর রেকর্ডিং ম্যানেজার সরকারমশাই যথাস্থানে পৌঁছে অপেক্ষা করছিলাম। ওদিকে তুলসীবাবু, বাদকের দল এবং স্বয়ং গায়িকা কলকাতা বেতার স্টুডিয়োতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। দমদমে রেকর্ডিং-এর জন্য সব ব্যবস্থা নিয়ে আমরা অধীর হয়ে পড়ছি, গায়িকা ও অন্যান্যদের দেখা নেই। অবশেষে সরকার মশাই প্রায় ভেঙে পড়ে বললেন—পঙ্কজবাবু, আপনারই শেখানো গান তো, পঙ্কজিনী যদি না এসে পৌঁছায় আপনিই গেয়ে রেকর্ড করে দিন। তবু লোকসান থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। (এই সরকার মহাশয়ের পুরো নামটা আজ আর স্মরণ করতে পারছি না।)

পিতামহ ব্রহ্মার কী বিচিত্র কৌতুক। পঙ্কজিনীর পরিবর্তে সেদিন একই গানের রেকর্ড করলাম আমি অর্থাৎ পঙ্কজকুমার। যে গান মহিলাকণ্ঠের উপযোগী পুরুষকণ্ঠে তা পরিবেশিত হলো।

কলাম্বিয়ার ছাপমারা এই ডিস্ক্ রেকর্ডখানি সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, একথা আজকের প্রবীণরা নিশ্চয় স্মরণ করতে পারবেন।···

প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। যতদূর মনে করতে পারছি কলাম্বিয়ার এরও পূর্বে আমার প্রথম রেকর্ডিং হয়েছিল। গানটি বাণীকুমার রচিত 'নমো নমো হে রুদ্র সন্যাসী'। ডিস্ক্ এর অপর পিঠে ছিল একটি বাউলাঙ্গের গান। সেটিও বাণীকুমার-রচিত।

* * *

কলাম্বিয়া, গ্রামোফোন বা হিন্দুস্থান, কোনো রেকর্ডিং কোম্পানীর সঙ্গেই আমি কখনো চুক্তিবদ্ধ হইনি। সর্বত্রই গান করার ও রেকর্ড করার স্বাধীনতা

আমি বজায় রেখেছিলাম। সে যাই হোক, হিন্দুস্থান রেকর্ড প্রসঙ্গে এখন চণ্ডীচরণ সাহা মহাশয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ১৯৩৪ (১৯৩৫?) সালে এম এল সাহা কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী চণ্ডীচরণবাবু জার্মানী থেকে ডিস্‌ক্‌ রেকর্ডিং এর আধুনিকতম বিদ্যা অর্জন করে দেশে ফিরেছিলেন। বাংলা সংগীত রেকর্ডিং এর জগতে এই উদ্যোগী ও নিরলস মানুষটি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি অক্রুর দত্ত লেনে হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্‌ট্‌স্‌ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শব্দযন্ত্রের আধুনিক কলাকৌশল—যা তিনি জার্মানী থেকে শিক্ষা করে এসেছিলেন—তাকে নিপুণ-ভাবে প্রয়োগ করে এদেশে সংগীত রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে গ্রামোফোন কোম্পানীর সমকক্ষতা অর্জন করা।

একদিন সহসা তিনি কলকাতা বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে রাইচাঁদ, বাণী-কুমার ও আমাকে তাঁর অফিসে যেতে অনুরোধ করলেন। মাইক্রোফোন সহ-যোগে আধুনিক ম্যাট্রিক্স্‌ পদ্ধতিতে তিনি রেকর্ডিং ট্রায়াল দেবেন, আমাদের সহযোগিতা তাঁর কাম্য।

আমরা সম্মত হলাম। রেডিও থেকে বেরিয়ে প্রত্যহ রাত নটা সাড়ে নটা নাগাদ চণ্ডীবাবুর স্টুডিওতে যেতাম। একতলার অঙ্গনে বসে আমি মাইক-এ গান করতাম অর্গান বাজিয়ে, রাই তবলায় ঠেকা দিত—আর, দোতলায় বসে চণ্ডীবাবু ম্যাট্রিক্‌স্‌-এ রেকর্ড করতেন। টেপ্‌ রেকর্ডিং প্রথা তখনো অজ্ঞাত। মোমের ম্যাট্রিক্‌স্‌-এর ছাঁচ থেকেই হার্ড ডিস্‌ক্‌ প্রস্তুত করে নেওয়া হতো সে-যুগে।

চণ্ডীবাবুর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর নবলব্ধ শিক্ষাকে নিপুণ ও ত্রুটিহীনভাবে কাজে লাগানো। প্রভূত সতর্কতা সহকারে তিনি নানা ঢঙের, নানা যন্ত্রের ও নানা কণ্ঠের রেকর্ডিং করার উদ্যোগ করেছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত ও বিভিন্ন লঘু সংগীতের সার্থক রেকর্ডিং করার প্রতিজ্ঞা তিনি নিয়েছিলেন। এই কর্মেই তিনি বন্ধুবর রাইচাঁদ ও আমার সহায়তা চেয়েছিলেন। আমি রাইচাঁদের তবলা সংগত সহ নানা কবি রচিত নানান্‌ ধরণের গান গাইতাম। প্রত্যেক গান চার পাঁচ বার করে গাইতাম। প্রত্যেক রেকর্ডিং এর শেষে চণ্ডী বাবু গানটি প্লে ব্যাক করতেন ত্রুটি সংশোধন বা উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে।

কোনো রেকর্ডিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি চুক্তিবদ্ধ হইনি, একথা আগেই

বলেছি। চন্ডীবাবু একথা জানতেন। রেকর্ডিং-বিষয়ে যখন তাঁর অভিজ্ঞতা সার্থক হয়ে উঠল তখন একদিন তিনি আমায় বললেন যে প্রতিদিন আমার কণ্ঠের যে সব গান তিনি রেকর্ড করে গেছেন তার একটি ছিল রবীন্দ্রনাথের "তপতী" নাটকের বিখ্যাত গান "প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে হে নটরাজ"। গানটি সেই দৈনিক রেকর্ডিং ট্রায়ালের শেষের দিকে গাওয়া এবং তাঁর বিশ্বাস গানটির পরিবেশন এবং রেকর্ডিং দুই-ই খুব মনোজ্ঞ হয়েছিল, তাই সেটি তিনি আর প্লে-ব্যাক করেন নি, ম্যাট্রিক্সটি অক্ষতই থেকে গেছে। সুতরাং তাঁর অনুরোধ, আমি যদি কবিগুরুর আর একটি গান গাই তাহলে তিনি একটি ডিস্ক রেকর্ড প্রস্তুত করে বাজারে বের করতে পারেন। বিনয়ী মানুষ তিনি, আমায় বললেন, আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলে তিনি অনুগৃহীত হবেন।

তাঁর অনুরোধ গ্রহণ করে আমি সানন্দে "তপতী" নাটকের আর একটি গান "তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ করো" রেকর্ড করলাম।

দু পিঠে এই দুটি গান নিয়ে রেকর্ডখানি প্রকাশিত হলো। হিন্দুস্থানের কয়েকটি রেকর্ড ইতিপূর্বেই বাজারে বেরিয়ে গেছে ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আমার এই রেকর্ডটির ক্রমিক সংখ্যা ছিল—নয়। আমার এই রেকর্ডটি সে যুগে বিপুল সমাদর পেয়েছিল মনে পড়ে। সমসাময়িক প্রবীণ যাঁরা আছেন আশা করি তাঁরা আমার এই উক্তিকে অহমিকাজাত অতিরঞ্জন বলে ধরবেন না।

* * *

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা মনে পড়ছে। নিউ থিয়েটার্সের খ্যাতি তখন চলচ্চিত্র-জগতে প্রায় সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। নিউ থিয়েটার্সের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও অভিনেতা কুন্দনলাল সায়গল তাঁর মধুক্ষরা কণ্ঠের জন্য তখন সারা ভারতে সমাদৃত। চণ্ডীবাবু তখন একদিন বীরেন সরকার মহাশয়ের কাছে প্রস্তাব করলেন যে তিনি সায়গলের ডিস্ক রেকর্ড প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। আলোচনান্তে সরকার মহাশয়ের সঙ্গে চণ্ডীবাবুর একটি চুক্তি হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল যে সায়গলের রেকর্ড হিন্দুস্থান প্রকাশ করবেন, তবে যেগুলি ফিলমের গান সেগুলিতে নিউ থিয়েটার্স-এর লেবেল থাকবে এবং তার নীচে ছোট অক্ষরে হিন্দুস্থানের নামোল্লেখ থাকবে মাত্র। কিন্তু ফিলমের বাইরে যে সব গান সায়গল রেকর্ড করবেন সেগুলি পুরোপুরি ভাবেই হিন্দুস্থানের লেবেল-যুক্ত হবে।

* * *

কলাম্বিয়ার জেনারেল ম্যানেজার রাইট সাহেবের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। বড়ো ভালো লোক ছিলেন সাহেবটি। তাঁর সঙ্গে বেশ একটা প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক আমার গড়ে উঠেছিল। তাঁর ফ্ল্যাটে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছি অনেকবার। এঁরই আমলে বিভিন্ন সময়ে Columbia ও HMV-র কাছ থেকে সর্বাধিক প্রচারিত রেকর্ডের গায়ক হিসাবে কয়েকটি উপহার পেয়েছিলাম। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু রকমের দুটি গ্রামোফোন ও একটি রেডিও সেট।

আর একটি সাহেবের কথা প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি ছিলেন Francisco Casanova—Calcutta Symphony Orchestra-র অন্যতম Conductor।

E.M.I. কর্তৃপক্ষ এক সময়ে চিন্তা করছিলেন যে বিলাতি অর্কেস্ট্রা সহযোগে রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করতে পারলে জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্যিক সাফল্য অনেক বেশি পাওয়া যাবে এবং ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও বিলাতে এ গান ভালো বাজার পেয়ে যাবে। এই বিষয়ে তাঁরা ক্যাসানোভার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। কিন্তু বিশ্বভারতীর কাছ থেকে এরকম অর্কেস্ট্রা-সহযোগে রেকর্ড করার সম্মতি পাওয়া দুরাশামাত্র—একথা আমি তাঁদের বলেছিলাম। তখন তাঁরা মতলব করলেন, কবির গান হিন্দীতে অনুবাদ করিয়ে রেকর্ড করাতে পারলে বিশ্বভারতীর কাছে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না, সুতরাং তখন গানের সঙ্গে বিলাতি অর্কেস্ট্রা ব্যবহার করা যাবে, ফলে সহজেই বিদেশে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করা যাবে। এই পরিকল্পনা অনুসারেই 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' গানটির হিন্দী অনুবাদ রেকর্ডিং হয়েছিল। এখানে একটা কথা অকপটে বলি—এই রেকর্ডিং করে আমি আদৌ কোনো তৃপ্তি লাভ করিনি। কিন্তু সে কথা থাক। এ প্রসঙ্গ অবতারণার কারণটা বলি।

ক্যাসানোভা প্রায়ই আমায় প্রশ্ন করতেন—'আচ্ছা, প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়' এর মানেটা আমায় বুঝিয়ে বলতে পার?

আমি আমার অক্ষম ভাষায় তাঁকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারতেন না। একদিন হয়েছে কি, আমি আর ক্যাসানোভা ট্রামে করে ফারপোর হোটেলের দিকে যাচ্ছি, মহলার উদ্দেশ্যে। আমাদের ঠিক পিছনের সীটে এক সুন্দরী ইউরোপীয় ললনা বসেছিলেন। আমি

ওঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু ক্যাসানোভা যেখানে বসেছিলেন, তাতে তাঁর পক্ষে মহিলাটিকে দেখা অসুবিধাজনক ছিল।

দেখতে হলে মাথাটি সম্পূর্ণভাবে ঘোরাতে হয়। আমি তবু একপাশে বসে আছি বলে কিছুটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ক্যাসানোভা সাহেব মহিলাটির ঠিক সামনে থাকায় তাঁর পক্ষে দেখার বড়ই অসুবিধা, নির্লজ্জের মতো ঘাড়-খানিকে অতখানি ঘোরানো মোটেই ভদ্রতাসম্মত নয়, অথচ প্রাণ তাঁর চাইছে, এটা বেশ বুঝতে পারছিলাম আমি।

চুপি চুপি বললাম—কি, দেখতে পাচ্ছ না? দেখই না ঘাড় ঘুরিয়ে, কিছু হবে না।

সাহেব সলজ্জভাবে বললেন—আরে না না, তা কী করে হয়, কী যে বলো, দেখতে গেলে অসভ্যতা হয়।

বেচারি!

আমি তখন ফিস্ ফিস্ করে বললাম—সাহেব, এবারে বুঝছ তো আমাদের কবির সেই গানটির অর্থ? প্রাণ চাইছে কিন্তু চক্ষু চাইতে পারছে না, এমন অবস্থাও মানুষের জীবনে আসে। এবারে ক্লীয়ার?

সাহেব তখন যুগপৎ লজ্জায় ও পুলকে বলে উঠলেন—রাইট্ মিঃ মল্লিক, নাউ দি লিরিক ইজ্ অ্যাবসোলিউটলি ক্লীয়ার টু মি!... আশ্চর্য, তোমাদের কবি একেবারে প্রাণের কথাটি লিখে দিয়েছেন।

* * *

সুহৃদোত্তম বাণীকুমার একটি সুন্দর পালা রচনা করেছিলেন—"শ্রীরাধা"। এই পালাটি একদল শিল্পী নিয়ে আমি মেগাফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করেছিলাম। তা ছাড়া মন্মথদা (মন্মথ রায়) রচনা করেছিলেন আর একটি পালা—নাম "শ্রীশ্রীসারদা মা"। এটিও এক শিল্পীগোষ্ঠী সহ রেকর্ড করেছিলাম হিন্দুস্থান-এ। সংগীতপ্রধান এই পালা দুটি তখন বিশেষভাবে জন-সমাদৃত হয়েছিল।

'মুক্তি' সিনেমার কথা তো অনেক বলেছি। এই সিনেমার সময় থেকেই ডিস্ক্ রেকর্ডিং-এর জগতে রয়্যালটি সিস্টেম প্রচলিত হয়েছিল। পূর্বে শিল্পীদের জন্য রয়্যালটির কোনো বালাই ছিল না। শিল্পী রেকর্ড করার

সময় রেকর্ডিং কোম্পানীর নিকট থেকে এককালীন টাকা পেতেন। সেই টাকার পরিমাণ পারস্পরিক সম্মতি অনুসারে স্থিরীকৃত হতো।

আমরা যারা ডিস্ক রেকর্ডিং-এর সেই প্রভাত-কালের শিল্পী, তাঁদের মধ্যে আজও যাঁরা জীবিত বা জীবিতা, তাঁরা আমার কথার সাক্ষ্য দেবেন। কিন্তু ১৯৩৫/৩৬ এর পর অবস্থার পরিবর্তন এলো। এ-ব্যাপারে আমার নিজেরও কিছু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছিল। সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের শিল্পীরা সেই প্রচেষ্টার শুভ ফল লাভ করেছেন, আমিও করেছিলাম। অবশ্য একথা বললে অনুতভাষণ হবে যে রয়্যালটি প্রথা প্রচলনের ব্যাপারে আমার প্রয়াসই ছিল সব। এ-ব্যাপারে অন্যান্যদের মধ্যে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে বুলাদা (প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ) এবং নিউ থিয়েটার্সের প্রডাকশন্ ম্যানেজার পি. এন্ রায় মহাশয়ের কথা। বস্তুত, তাঁদের প্রারম্ভিক প্রয়াস ও সহায়তা ছাড়া শিল্পী-কুলের উপকারার্থে এই যুগান্তর ঘটানো সম্ভব ছিল না। বিশেষত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বুলাদা একদিকে রেকর্ড কোম্পানীদের সঙ্গে ও অপর দিকে বিশ্বভারতীর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছেন, ছুটোছুটি করেছেন শিল্পীদের জন্য একটা কিছু করার উদ্দেশ্যে। আমিও বুলাদার সঙ্গে লেগেছিলাম পরমোৎসাহে। আর বিভিন্ন সিনেমার গান রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে শিল্পীদের আর্থিক দাবিকে প্রতিফলিত করেছিলেন পি এন রায় মহাশয়।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল, অ-রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে শিল্পী রেকর্ড বিক্রয়ের হিসাব অনুসারে স্থায়ীভাবে একটা শতকরা লভ্যাংশ পেতে থাকবেন।

আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে শিল্পী নিজে ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান উভয়েই একটা নির্দিষ্ট লভ্যাংশ পেতে থাকবেন।

এই রয়্যালটি প্রথার প্রচলন শিল্পী হিসাবে আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দ-দায়ক ছিল, বলা বাহুল্য। কিন্তু শিল্পী হিসাবে শুধু কেন? শিল্পীকুলের অন্যতম মুখপাত্র হিসাবে আমি এই বিজয় গৌরবের অংশীদার ছিলাম। অবশ্য পি, এন রায় অথবা বুলাদার অক্লান্ত সাহায্য ব্যতিরেকে শিল্পীদের জন্য এই জয়ের মালা আদায় করা আমার বা অন্যান্যদের পক্ষে কঠিন হতো।

* * *

সঙ্গীত রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে, বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করেই জীবনে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করেছি। 'এমন দিনে তারে বলা যায়/এমন ঘন

ঘোর বরিষায়', 'ওগো স্বপ্নস্বরূপিনী, তব অভিসারের পথে পথে স্মৃতির দীপ জ্বালা', 'আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি, মম জল ছল্ ছল্ আঁখি মেঘে মেঘে', 'বর্ষণমন্দ্রিত. অন্ধকারে এসেছি তোমারি দ্বারে', 'সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণধারা', 'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব', 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর', 'বাণী মোর নাহি, স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি', 'আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে" 'তুমি কি কেবলি ছবি', 'ওরে সাবধানী পথিক', 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না', 'দিন যদি হল অবসান' ইত্যাদি কত নাম করব!

শুনতে পাই, কবিগুরুকে বলা হয় 'বর্ষার গীতিকার', কারণ তাঁর শ্রেষ্ঠ সংগীত-সম্ভার রচিত হয়েছে বর্ষা-ঋতুকে কেন্দ্র করে। কবিগুরুর এই দীন সেবককে কোনো কোনো বন্ধু 'বর্ষার গায়ক' এই অভিধা দিয়ে থাকেন। জানি না এই অভিধা লাভের যোগ্যতা আমার মতো অধমের আছে কি না, তথাপি বলি, কবির বর্ষাসংগীতগুলি গেয়ে ও রেকর্ড করে অবশ্যই এক অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি লাভ করেছি। আনন্দ কতটা বিতরণ করতে পেরেছি জানি না, তবে মহাকবির প্রসাদাৎ যা ভোগ করে নিয়েছি তা আমিই জানি। কবির ভাষায়—'তার অন্ত নাই গো…'।

সে যাই হোক, ঠিক কোন গান বা কী ধরণের গান গেয়ে কতটা তৃপ্তিলাভ করেছি, তার গুণগত বা পরিমাণগত হিসাব করা অসম্ভব। পুজা বা প্রেম পর্যায়ের গান, এমনকি অনেক অ-রবীন্দ্রসংগীত গেয়েও অপরিসীম আনন্দ লাভ করেছি। কোনো কোনো হিন্দী গীত ও ভজন গেয়েও নিজেকে সার্থক মনে হয়েছে। নিজের সুরে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে যখন গান করে গেয়েছি, তখনও কি আনন্দ কিছু কম পেয়েছি? প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' আমাকে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে পড়ে গগন হরকরার বিখ্যাত বাউল গান 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে।' গানটি আমি নানান্ অনুষ্ঠানে বার বার গেয়েছি ও রেকর্ড করেছি। এই গানের গভীর বাণী ও তত্ত্ব এবং মর্ম-স্পর্শী সুর স্বয়ং বিশ্বকবিকে কী পরিমাণে ব্যাকুল করেছিল, তা সকলেই জানেন। (এরই আদলে কবি রচনা করেছিলেন—'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি')। এই মহৎ গানের স্রষ্টাকে আমি এই সুযোগে আমার প্রণতি জানাই।

লালন ফকিরের একটি গান গেয়েও প্রভূত আনন্দলাভ করেছিলাম। গানটি —'কথা কয়, কাছে দেখা যায় না।'

শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ, তিনিই প্রথম এই গান দুটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর প্রাক্‌কালেই অনুজপ্রতিম অগ্রগণ্য রবীন্দ্র-শিল্পী সন্তোষ সেনগুপ্ত মহাশয়, যিনি তখন গ্রামোফোন কোম্পানীর সংগীত বিভাগের কর্মকর্তা, আমায় অনুরোধ করলেন শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ হিসাবে কয়েকটি গান রেকর্ড করতে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে এই ছিল আমার শেষ আত্মপ্রকাশ। আমি গেয়েছিলাম চারখানি গান—'হে মোর দেবতা', 'যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি', 'বাহির পথে বিবাগী হিয়া' এবং 'বাহিরে ভুল হানবে যখন'। শুনেছিলাম, 'হে মোর দেবতা' সম্বলিত ডিস্‌ক্‌খানি রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে গ্রামোফোন কোম্পানীর সর্বাধিক প্রচারিত রেকর্ডের মর্যাদা লাভ করেছিল।

* * *

রবীন্দ্র সংগীত ব্যতিরেকে অন্যান্য যে সমস্ত বাংলা ও হিন্দী গান রেকর্ড করেছি, আগেই বলেছি, সেগুলির মধ্যে অনেক গানই আমার বড় আদরের বস্তু। কয়েকটি গানকে বিশেষভাবে স্মরণ না করে পারছি না। যেমন বাণীকুমার-রচিত----'প্রভু, আঁধার পারাবারে ফোটাও আলোর শতদল' অজয়-রচিত 'যবে কণ্টকপথে হবে রক্তিম পদতল / অন্তরে ফুটিবে কি সুন্দর শতদল' এবং 'ওরে চঞ্চল, এপথে এই যাওয়া, এ সুরে এই গাওয়া শেষ নয়, সেকথাটি বলু,' 'শেষ হ'ল তোর অভিযান' প্রভৃতি।

হিন্দী গীতের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণ করি—'পিয়া মিলনকো জানা' (গানটি একটি কথক নৃত্যের বোলের উপর রচিত হয়েছিল—রচয়িতা আরজু লখনোবী) 'তেরে মন্দির কা হুঁ দীপক জল্ রহা' (রচয়িতা পণ্ডিত মধুর), 'তু ঢুঁঢতা হৈ জিসকো, বস্তীমেঁ য়া কী বন মেঁ বো সাঁবরা সালোনা, রহতা হৈ তেরে মন মেঁ' (রচয়িতা—পণ্ডিত ভূষণ), 'য়ে রাতে য়ে মৌসম্ য়ে হঁসনা হঁসানা / মুঝে ভুল জানা / ইন্‌হে ন ভুলানা' (রচয়িতা - ফৈয়াজ হসেমী)

কিন্তু তালিকা দীর্ঘ না করাই ভাল। কবির নিজের পক্ষে যেমন তাঁর শ্রেষ্ঠ

রচনাগুলি বেছে দেওয়া কঠিন, গায়কের পক্ষেও তাই। আমার শ্রোতারা একাজ অনেক বেশি সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারবেন বা হয়তো পেরেছেন।

বাংলা বা হিন্দী গানের শেষ রেকর্ডিং আমার ছিল ১৯৭৮-এ 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' ছায়াচিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা যখন করি তখনই আমার জীবনের শেষ ডিস্ক্-রেকর্ডিং হয়েছিল সংস্কৃত 'চরৈবেতি' ও 'দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে' মন্ত্র দিয়ে। আমার সঙ্গে এতে কণ্ঠদান করেছিলেন শ্রীমানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী শেফালি ঘোষ, শ্রীমতী উৎপলা সেন, শ্রীমতী ইলা বসু এবং আমার কন্যা, আমার জীবনের নানান্ কর্মে যার সহযোগিতার কথা সম্পর্কের কথা ভেবেই বিস্তারিতভাবে বলতে সঙ্কোচ বোধ করি, সেই পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী অরুণলেখা।

সুদীর্ঘ জীবনে চার দশকের উপর ডিস্ক রেকর্ডিং করেছি। আজ 'যৌবন বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি'র সেই সব ডিস্ক্ নিজেই ঘুরিয়ে যখন শুনি, তখন 'অনেক দিনের আমার যে গান আমার কাছে ফিরে আসে'। মনে মনে কবির ভাষায়, তাদের শুধাই—'তুমি ঘুরে বেড়াও, ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াও, কোন্ বাতাসে?'

১৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার দপ্তরের অধীনে লোকরঞ্জন শাখা নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা আছে। এই শাখার কাজ হচ্ছে অভিনয়, নৃত্যকলা, সঙ্গীতাদির মাধ্যমে লোক-সংস্কৃতির জগতে সুস্থ ও আনন্দময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করা। সাধারণ গ্রামীন মানুষ, যাদের জীবনে বৈচিত্র্যের নিতান্ত অভাব, দিনগত পাপক্ষয়ের মধ্যে যাদের বিবর্ণ ও প্রায়ান্ধকার জীবনযাত্রায় কোনো আলোকরেখার আভাস নেই, দারিদ্র্য ও অনশন যাদের নিত্যসহচর সেই বিপুল জনমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন ও সাংস্কৃতিক মনোন্নয়নের প্রথম সরকারী প্রয়াসের বাস্তব রূপ এটি।

গ্রামীন লোকসমাজের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে পরিকল্পনা তখন সারা দেশ জুড়ে সুরু হয়েছিল। সেটা ১৯৫৩ সালের কথা। উন্নয়ন প্রকল্পগুলি তখন আজকের মতো এত ব্যাপক রূপ ধারণ করেনি। তখন সবেমাত্র এদের ভূমিকা রচিত হচ্ছিল। পশ্চিম বাংলায় এর রূপকার ছিলেন সেই শালপ্রাংশু মহাভুজ ব্যক্তিটি—যাঁর নাম আজ কিংবদন্তীতে পরিণত—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

স্বনামখ্যাত, বহুমানিত এই চিকিৎসকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল চিকিৎসকরূপেই।

১৯৩৫ সালের কথা। তখন তাঁকে লোকে চিনত চিকিৎসককুলশ্রেষ্ঠ ধনন্তরী হিসাবে। আমিও সেই ভাবেই তাঁকে চিনেছিলাম, তবে সেই স্মৃতিটা আমার কাছে বিশেষ মধুর ছিল না।

তারপর ১৯৫৩ সালে যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলাম, তখন অন্য এক রূপে তিনি সংস্থিত। সে-রূপ পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার মুখ্যমন্ত্রীর এবং এক অবিসম্বাদিত দেশনেতার রূপ।

এরপরেও তাঁকে অন্যভাবে ভাব দেখেছি। সেটা তাঁর সহজ অন্তরঙ্গ রূপ, সে-ভাবে তাঁকে বড়ো সহজে পাওয়া যেত না। এটাকে আমার ভাগ্যগুণে বলতে হয়।

এই ভাবে ক্রমে ক্রমে চিকিৎসক ডাঃ রায় থেকে মানুষ বিধানচন্দ্রে পৌঁছে-

ছিলাম আমি। এই দুই প্রান্তের মাঝখানে ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সুরু হয়েছিল রাগ দিয়ে, শেষ হয়েছিল সশ্রদ্ধ অনুরাগে। কী ভাবে, তাই বলি।

১৯৩৫ সাল। আমার পরমারাধ্যা জননী তখন দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে শয্যাশায়িনী। শত চেষ্টাতেও তাঁর যন্ত্রণার কোনো উপশম নেই। অবশেষে আমাদের গৃহচিকিৎসক ডাঃ দত্ত পরামর্শ দিলেন বিধান রায় মহাশয়কে দেখানোর জন্য। আমরা রাজী হলাম। আমাদের তরফ থেকে তিনিই ডাঃ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

নির্দিষ্ট দিন অপরাহ্নে আমাদের সদর দরজায় এসে নামলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। প্রবেশ করলেন আমাদের গৃহে।

কিন্তু তাঁর চোখে মুখে ভঙ্গিতে কেমন যেন তাচ্ছিল্যের ভাব লক্ষ করলাম। আমার এবং আমার জ্যাঠতুতো দাদার, কারুরই তাঁর এইরকম হাবভাব পছন্দ হলো না। আমাদের ডাক্তারবাবু অবশ্য যথোচিত বিনয়সহকারে তাঁকে আনতে লাগলেন এবং সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই তাঁকে মায়ের অসুখের বিষয়টা বোঝাতে লাগলেন।

বিধানবাবুর চোখে মুখে কিন্তু সেই একই দম্ভ মিশ্রিত অভিব্যক্তি। আমি তখন মনে মনে ভাবছি—বাবা! বড়ো ডাক্তার তাহলে এই রকমই হয়! ভিজিট তো' এদিকে কিছু কম নিচ্ছেন না! সেই বাজারেই চৌষট্টি টাকা!

নিরুপায় আমরা তটস্থ হয়ে রইলাম। ডাঃ রায় আসবেন বলে মায়ের খাটের পাশে চেয়ার এনে রাখা হয়েছিল। তিনি কিন্তু ঘরে ঢুকে রোগীকে স্পর্শ করা দূরের কথা, চৌকাঠের বাইরে থেকেই কর্তব্য সারলেন, চেয়ারটি আর অলংকৃত হলো না।

ডাঃ রায় দূর থেকে রোগিনীকে আদেশ দিলেন – পাশ ফিরে শোন্।

কিন্তু কোনো সাড়া নেই।

ডাঃ রায় ঘরে ঢুকলেন না দেখে আমি তাড়াতাড়ি চেয়ারখানি ঐখানেই এনে দিতে চেষ্টা করলাম। ডাঃ দত্ত চোখ টিপে বারণ করলেন আমায়।

ডাঃ রায় আরো একবার গম্ভীর স্বরে বললেন—পাশ ফিরে শোন্। মা আমার তথাপি নিঃসাড় হয়ে রইলেন।

ডাঃ রায় তখন ঘরে প্রবেশ করে দু'এক পা এগিয়ে একটা হাত মায়ের

দিকে বাড়ালেন। বললেন—ধরুন তো আমার হাতখানা। মা তথাপি কোনো সাড়া দিলেন না। ডাঃ রায় তখন মা'র হাতটা একটু ধরলেন এবং তারপর যেভাবে এসেছিলেন সেই ভাবেই নেমে যেতে লাগলেন। নামতে নামতে আমাদের গৃহচিকিৎসককে কিছু বললেন মনে হলো।

তাঁকে বিদায় জানিয়ে ডাঃ দত্ত উঠে আসতেই আমরা আমাদের যতো ক্ষোভ উদগীরণ করতে লাগলাম। বললাম, এত টাকা নিয়ে এ কী রোগী দেখার ধরণ!

ডাঃ দত্ত কিন্তু বলতে লাগলেন—তোমরা মিছিমিছি রাগ করছ। মস্ত ডাক্তার উনি, ও'র রোগী দেখার রীতিই এঁইরকম। এইভাবেই অতি অল্প সময়ে তিনি যে-কোনো রোগ নির্ভুল ভাবে ধরে ফেলেন। আমার দর্জিপাড়ার বাড়িতে আগামীকাল ভোরে অবশ্যই একবার এসো। মায়ের অসুখের একটা বিশদ বিবরণ লিখে আনবে। সেটি দেখে আমি একটা রিপোর্ট লিখে দেব—তোমরা রিপোর্ট নিয়ে সকালেই ৭টার মধ্যে ও'র ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে চলে যাবে, উনি দেখবেন।

নির্দেশমতো সবই করলাম। সকাল সাড়ে ছটার মধ্যে ডাঃ রায়ের বাড়ি পৌঁছে দেখি এর মধ্যেই লোক গিজ্‌গিজ্‌ করছে।

কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময় ডাঃ রায় নামলেন। চেয়ারে বসে প্রত্যেকের রিপোর্ট এক এক করে উলটাতে লাগলেন। দুপাশে দুখানি ফোন ক্রমাগত বাজছিল। উনি রিপোর্ট দেখছেন, ফোনও সামলাচ্ছেন।

আমাদের রিপোর্টখানি যখন তাঁর হাতে, তখনো ফোনে কথা চলছে। একটু কথা বলার ও প্রশ্ন করার চেষ্টা করলাম, উনি কিন্তু তেমন আমল দিলেন না। রিপোর্টটা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দেখে, তার মধ্যে দু এক জায়গায় দাগ দিয়ে আমার দিকে অবহেলার ভঙ্গিতে ঠেলে দিলেন। রিপোর্টখানা মুঠোয় নিয়ে ক্ষুব্ধ অন্তরে বেরিয়ে এলাম।

ডাঃ দত্তর কাছে সোজা চলে গিয়ে বললাম—এই দেখুন ডাক্তারবাবু আপনার দেশবিখ্যাত ডাক্তারের কাজের নমুনা। রিপোর্টটা ভালো করে দেখলেন না পর্যন্ত।

ডাঃ দত্ত কিন্তু বিশেষ বিচলিত হলেন না। রিপোর্টখানা উলটে পালটে দেখে বললেন—কে বললে উনি রিপোর্ট দেখেননি? আগাগোড়াই দেখেছেন,

দাগ দিয়েছেন, কী কী করতে হবে তাও নির্দেশ করেছেন।···দাঁড়াও একটা ওষুধ দিচ্ছি, মাকে খাওয়াবে গিয়ে, একটু আরাম পাবেন।

কয়েকদিন পরেই মা আমার চিরশান্তির কোলে নিদ্রিত হলেন। ক্যানসার রোগের নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করলেন তিনি। কয়েকদিন পরে এই মৃত্যু-শোক কিছুটা প্রশমিত হলে ডাঃ দত্ত আসল কথাটি ভাঙলেন। বললেন, ডাঃ রায় নাকি সেদিনেই জানিয়েছিলেন যে আমার মায়ের পরমায়ু আর বড় জোর দিন সাতেক। তাঁর আর কিছু করার ছিল না।

ঠিক সাতদিনের মাথাতেই মা ইহলোকের মায়া কাটিয়েছিলেন। ডাঃ রায়ের হিসাব অব্যর্থ সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে এমন দাম্ভিক ব্যবহার কেন ?······

এই স্মৃতিটা প্রায় বিস্মৃতিতে পরিণত হয়েছিল। এমন সময় একদিন, ১৯৫৩ সালে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে একটি নিমন্ত্রণপত্র পেলাম। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একটি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে দেশের কয়েকজন শিল্পী-সাহিত্যিকের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। দিন নির্ধারিত হয়েছিল ১৫ আগস্ট ১৯৫৩। স্থান –রাইটার্স বিলডিংস্—রোটান্ডা হল্।

১৯৫৩-র এই চিঠি ১৯৩৫ এর সেই ঘটনাকে বিস্মরণমুক্ত করলো। মাতৃ-শোক-মিশ্রিত সেই মনঃক্ষোভ আমার পথরোধ করে দাঁড়ালো। আমার মনে হলো—ডাকুনগে উনি, আমি যাব না। তারপরেই মনে হলো –না, ডেকেছেন যখন, সৌজন্যের দিক থেকে যাওয়াই তো কর্তব্য।

এমনি এক বিচিত্র দোলাচলচিত্ততার মধ্যে কাটালাম কয়েকটা দিন। অবশেষে দিনটি এসে গেল এবং আমিও গিয়ে পড়লাম শেষ পর্যন্ত রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর রোটান্ডায়। সেখানে সেদিন দেশের অনেক সাহিত্যিক শিল্পী বুদ্ধিজীবীর সমাবেশ হয়েছিল। দেখলাম, সঙ্গীতজগৎ থেকে একমাত্র আমিই আমন্ত্রিত।

১৮

সেদিন ডাঃ রায়ের এক নতুন মূর্তি দেখেছিলাম। ১৯৩৫ এর পর ১৯৫৩ সালে তাঁর সঙ্গে এই আমার সাক্ষাৎ—মাঝে দীর্ঘ আঠারো বছরের ব্যবধান। দুঃস্থ পশ্চিমবঙ্গকে সুস্থ করে তোলার জন্য এই চিকিৎসকটি এখন কয়েক বছর হলো মুখ্যমন্ত্রীরূপে অবতীর্ণ! দরিদ্র, দুর্বল, রোগজীর্ণ বঙ্গভূমির রোগ নির্ণয় করে তার সুচিকিৎসা করার জন্য তাঁর চাইতে যোগ্যতর মানুষ যে আর কেউ ছিল না, একথার ঐতিহাসিক প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন। রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ সেদিন তাঁর চোখে মুখে যা দেখেছিলাম তা আমার সেই পুরাতন স্মৃতিকে মুছে দিয়েছিল। তাঁর জনকল্যাণকামী দার্ঢ্যকে সেদিন তাঁর মুখে উদ্ভাসিত হতে দেখেছিলাম।

তিনি বললেন তাঁর সোনারপুর-আরাপাঁচ পরিকল্পনার কথা। এই পরিকল্পনা সফল হলে ওখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাটচাষের উপযোগী হয়ে উঠবে, অসংখ্য কর্মহীন কৃষিমজুরের দারিদ্র্যমোচন হবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি হবে।

তিনি চাইলেন এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দেশের শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত্যিক সকলে এগিয়ে আসুন নিজ নিজ মাধ্যমের হাতিয়ার নিয়ে, সাধারণ মানুষকে আপন ভাগ্যরচনায় উদ্বুদ্ধ করুন।

(প্রসঙ্গত বলে রাখি, সোনারপুর-আরাপাঁচ অঞ্চলের এক বিরাট অংশ পতিত অবস্থায় ছিল। সেই পতিত ভূখণ্ডকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তিনি সম্পূর্ণ আবাদযোগ্য করে তুলেছিলেন। তাঁর এই কর্মে একটি চলচ্চিত্র-শিল্পী গোষ্ঠীর সাহায্যও তিনি নিয়েছিলেন একটি নির্বাক চলচ্চিত্রের জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষিজীবীরা ও ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা এই পরিকল্পনায় আশানুরূপ সাড়া দেন্‌নি। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের চটকলের চাকুরির জন্যই বেশি উদ্‌গ্রীব ছিলেন।)

সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্ব স্ব মত প্রকাশ করতে লাগলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাশ প্রমুখ অনেকেই ভাষণ দিলেন।

আমি তখন নির্বাক হয়ে অন্য এক বিধান রায়কে নিরীক্ষণ করছি—সেই বিশাল ব্যক্তিত্বটিতে তখন এক দেশহিতব্রতীর স্বপ্নময়তা মাখানো রয়েছে।

আমার যে ঠিক কী করণীয় তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আকাশ পাতাল ভাবছিলাম বসে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল চারণকবি মুকুন্দদাসের কথা। তিনি তো গান গেয়েই বাঙালীর ঘুম ভাঙাতে চেয়েছিলেন! মনে পড়ে গেল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কথা। তাঁর গানের কলি মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল—

ফিরে চল্ ফিরে চল্ ফিরে চল্ মাটির টানে—
যে-মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে—
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে
হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে
ডাক দিলো যে গানে গানে।.........

মনে পড়লো—

হারে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দেরে

ভাবছি আর আলোচনা শুনছি বসে বসে। বুদ্ধিজীবীরা সকলেই আশ্বাস দিলেন পূর্ণ সহযোগিতার। কিন্তু কেমন করে, তা অস্পষ্টই রয়ে গেল।

ডাঃ রায় সকলকে বললেন—আপনাদের কোনরূপ অসুবিধা না হলে আপনাদের সময় ও সুযোগ অনুসারে আমি আপনাদের সোনারপুর-আরাপাচ অঞ্চলটি দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারি। আপনাদের শারীরিক কোন ক্লেশ যাতে না হয় তেমন ব্যবস্থা থাকবে।

এই ভাবে বেলা বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। বক্তৃতা, পালটা বক্তৃতা ও গুরুগম্ভীর কথার ভারে রোটাণ্ডা হলের আবহাওয়া তখন খুবই ভারী হয়ে উঠেছে, অথচ কোনো বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় নি। ডাঃ রায় সভার কাজ শেষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, এমন সময়ে তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় নাট্যকার মন্মথ রায় মহাশয় উঠে দাঁড়ালেন।

প্রসঙ্গত বলি, এই সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমি যে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, তা এসেছিল এঁরই উদ্যোগে। ইনি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার

বিভাগের পাবলিসিটি প্রোডাকসান অফিসার এবং নিজে যেহেতু ছিলেন সাহিত্য জগতের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরুষ, সেই হেতু এই সভার জন্য, কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায়ক্রমে, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নিমন্ত্রণ তালিকা তিনিই প্রস্তুত করেন বলে পরে তাঁর কাছে শুনেছিলাম। প্রচার অধিকর্তা প্রকাশস্বরূপ মাথুর মহাশয় পদমর্যাদায় যাই হোন না কেন, সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপারে মন্মথ বাবুকেই বেশি চিন্তাভাবনা করতে হতো।

যাই হোক, মন্মথবাবু উঠেই বললেন, অনেক গুণীর মুখে আজ আমরা অনেক কথা শুনলাম, কিন্তু সংগীতজগতের একমাত্র প্রতিনিধি পঙ্কজবাবু এখানে উপস্থিত রয়েছেন, তিনি এখনো কিছু বলেননি।

একথা শুনেই ডাঃ রায় আমাকে কিছু মন্তব্য করতে অনুরোধ করলেন।

মুহূর্তের মধ্যে সকলের লক্ষবস্তু হয়ে উঠলাম আমি।

একটু বিহ্বল হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম আমি—আমি তো বক্তা নই, গুছিয়ে বলতে পারি না। তবে এই সভায় নানাবিধ আলোচনা শুনতে শুনতে আমার নিজের মনে কিছু ভাবনার উদ্রেক হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যদি অনুমতি করেন তো তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারি। এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের দু একটি গানের কথাও আমার মনে পড়েছে। অনুমতি পেলে গেয়ে শোনাতে পারি।

ডাঃ রায়ের অনুমতি পেয়েই আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে কবিগুরুর 'ফিরে চল মাটির টানে' এবং 'হারে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে' গান দুটি গেয়ে শোনালাম সকলকে।

গান শেষ হলে ডাঃ রায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা ভংগ করলেন। আমার নিজের মুখে বলা হয়তো ঠিক হবে না, রোটাণ্ডা হলের সেদিনকার ক্লান্তি-কর গুরুগম্ভীর আবহাওয়া যে আমার গানে শুধু প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল তাই নয়, লক্ষ করেছিলাম যে গান দুটির মর্মবাণী যেন উপস্থিত সকলকে আপ্লুত করে দিয়েছিল। গানের শেষে দেশের গণ্যমান্য সাহিত্যিকরা সকলে আমাকে ঘিরে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন এবং আমি কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই গুঞ্জনের ফলে, ডাঃ রায় যাবার সময় ঠিক কী বলে গেলেন, তা আমার শ্রুতিগোচর হয়নি। মন্মথবাবু (যাঁকে আমি পরবর্তীকালে 'মন্মথদা' বলেই সম্বোধন করেছি) আমাকে বললেন —ও পঙ্কজবাবু, ডাঃ রায় যে আপনাকে ওঁর ঘরে দেখা করতে বলে গেলেন।

তিনি আমাকে সঙ্গে করে ডাঃ রায়ের ঘরে নিয়ে গেলেন। সসম্ভ্রমে প্রবেশ করে তাঁর ইঙ্গিতে আমরা আসন গ্রহণ করলাম।

ডাঃ রায় বললেন—বলুন আমাকে আপনার কী বক্তব্য।…

প্রসঙ্গত বলি, সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় আমার এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে ললিতকলা শিল্পক্ষেত্র দৈব-রক্ষিত। ললিত-কলানুশীলনে যাঁরা নিযুক্ত তাঁরা আমার এই কথায় নিশ্চয় সাক্ষ্য দেবেন। শিল্পীর জীবনে সৃষ্টির সুবর্ণ মুহূর্ত যখন আসে, তখন সমস্যাও আসে অনেক। কিন্তু সেই সব সমস্যার সমাধানও হয়ে যায় দৈবানুকূল্যে। বহু কবি ও সাহিত্যিকের অনুপম সৃষ্টি এই ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে, বহু অপরূপ চিত্রশিল্প এই ভাবেই মূর্ত হবার সুযোগ লাভ করেছে। লোকরঞ্জন শাখারূপ শিল্পক্ষেত্রটির জন্মের পিছনেও ছিল এই শিল্প-দেবতার আশীর্বাদ ও নির্দেশ।

ডাঃ রায় যখন প্রশ্ন করলেন—বলুন আপনার কী বক্তব্য, তখন কয়েক. সেকেণ্ডের জন্য আমি ও মন্মথদা চুপ করেছিলাম। মন্মথদার সঙ্গে আমার সাধারণভাবে আলাপ পরিচয় ঘটেছিল ১৯৩৫-৩৬ সালে যখন নিউ থিয়েটার্সে ওঁর গল্প 'মীনাক্ষী'র চিত্রায়ণে আমি সঙ্গীতপরিচালনায় নিযুক্ত ছিলাম। সেই তিনিই শিল্পদেবতার কী এক নিগূঢ় ইচ্ছায় এক অভিনব শিল্পকর্মপ্রবাহে এই দিন থেকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন। 'কী ছিল বিধাতার মনে', ডাঃ রায় আমাদের দুজনের দিকে চেয়ে আমরা কোন কিছু উত্তর দেবার আগেই বলে উঠলেন - তোমরা তো গান আর নাটকের লোক। তোমাদের যা পুঁজি তাই দিয়েই একটা সম্পূর্ণ স্কীম তৈরি করে যত শীঘ্র সম্ভব আমায় দাও।

বয়ঃকনিষ্ঠকে ডাঃ রায় রেশিক্ষণ 'আপনি' সম্বোধন করতে পারতেন না। আমি যথোচিত বিনয়সহকারে বললাম—যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি একটি চারণদল গঠন করে নেব। নতুন নতুন গান রচনা করিয়ে ও যথাযথ সুর-সংযোগ করে আমি তাদের শিখিয়ে নেব। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে গেয়ে বেড়াবে, গানের ভিতর দিয়ে গ্রামবাসীদের মঙ্গলের উপায় বোঝাবে।

ডাঃ রায় বললেন—বেশ, ভালো কথা। কিন্তু নতুন নতুন গান লেখাতে হবে কেন? বাংলায় কী গানের অভাব?

আমি বললাম—কিন্তু এই ধরণের পরিকল্পনার উপযোগী গান তো কখনো লেখা হয়নি, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন বলে বোধ হয় না।

ডাঃ রায় তখন চট্ করে বলে উঠলেন—কিন্তু পঙ্কজ, সেদিন যখন টালিগঞ্জের পথে একদল লোক তোমায় ঘিরে ধরেছিল, তখন কী গান গেয়ে তুমি তাদের শান্ত করেছিলে? তখন কি সঙ্গে সঙ্গে নতুন গান রচনা করেছিলে!

কী আশ্চর্য! আমি বললাম, আপনি এখবর জানলেন কী করে?

মৃদু হেসে ডাঃ রায় বললেন – সব খবরই আমায় রাখতে হয় হে। বলো না কী গান সেটা।

আমি বললাম—রবীন্দ্রনাথের 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'।

ডাঃ রায় বললেন—তবে?

সে প্রায় বছর খানেক আগেকার কথা। নানান্ অভাব অভিযোগ নিয়ে কলকাতার বুকে তখন প্রবল রাজনৈতিক আলোড়ন সুরু হয়েছে। পথে পথে বিক্ষোভ, ব্যারিকেড, দাবি, মিছিল, মত্ত জনতার রোষ।

একদিন দ্বিপ্রহরে টালিগঞ্জে স্টুডিওর দিকে যাচ্ছি আমার নিজের গাড়িতে। এমন সময় হঠাৎ এক ক্ষুব্ধ জনতা আমার গাড়ির পথরোধ করলো। অত্যুৎসাহী কেউ কেউ গাড়ির উপর চড়-চাপড় মারতে আরম্ভ করলো। সেই সঙ্গে প্রমত্ত চীৎকার—নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন, গাড়ি যেতে দেওয়া হবে না।

ক্ষুব্ধ ও কিছুটা শঙ্কিত হয়ে গাড়ি থেকে নামলাম। নামার সঙ্গে সঙ্গেই পঙ্কজ মল্লিককে অনেকে চিনে ফেলেছে। আর যাই কোথায়? সমবেত চীৎকার কানে এলো—যেতে দেওয়া হবে না এখন, আগে গান শোনান আপনি, গান শোনান।

গান না শোনালে যেতে দেওয়া হবে না? এরা ভেবেছে কী? মানুষের পথরোধ করে বিক্ষোভ প্রকাশের এ কী রীতি? কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবলাম, হ্যাঁ পঙ্কজ মল্লিকের গান ওরা শুনতে পাবে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষাও কিছু দেব।

উন্মুক্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলাম—'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে শিক্ষিত যুবক ছাত্র অনেকেই ছিলেন। কবির এই বহুশ্রুত গানের মর্মবাণী তাঁদের অজানা নয়। গান গাইতে গাইতে দেখতে পেলাম জনতার এক বৃহৎ অংশ 'মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো' নতশির হয়ে এলো।

গান শেষ হতে তারা নম্র ও সংযত ভঙ্গিতে আমার পথ ছেড়ে দিলো।

পরে জেনেছিলাম, এই ঘটনা ঘটে যখন, তখন ডাঃ রায় আমেরিকায়

ছিলেন। ওখানে বসেই সংবাদপত্র বা অন্য কোন সূত্রে এই খবর তিনি পেয়েছিলেন।

ডাঃ রায় বললেন—তুমি যাঁর গান গেয়ে সেদিন ওই মারমুখী জনতাকে শান্ত করেছিলে, তাঁর গান দিয়েই তো কাজ হতে পারে। তাছাড়া রবিবাবুর গান ছাড়াও তো বাংলায় আরো কত গান রয়েছে—বাংলায় গানের অভাব! আমাকে একটা পরিষ্কার স্কীম তৈরি করে দাওতো। আচ্ছা পঙ্কজ, সেদিনের সেই গানটা একবার গেয়ে শোনাও দেখি এখানে।

এমন সময়ে দরজা ঠেলে ঢুকলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়। ডাঃ রায় বলে উঠলেন—এসো প্রফুল্ল, পঙ্কজের গান শোনো।

গান শোনালাম। ডাঃ রায় ও প্রফুল্লবাবু নীরব শ্রদ্ধাসহকারে কবিগুরুর এই মহৎ সঙ্গীতটি শ্রবণ করলেন। এর পর ও'দের সঙ্গে কিছু কথাবার্তার আদান প্রদান হলো।

আলোচনান্তে বেরিয়ে এসে দেখি করিডরে অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে সজনীকান্ত দাস মহাশয় দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন—খুব গান টান হলো বড়কর্তার ঘরে মনে হচ্ছে। মোটা কিছু হলো নাকি পঙ্কজবাবু?

আমিও সকৌতুকে জবাব দিলাম—এই দেখুননা, পকেট ঝন্‌ঝন্ করছে। স্বয়ং ডাঃ রায় রবিঠাকুরের গান শুনতে চাইলেন—টাকা কামাবার সুযোগ মিলে গেল!

সজনীকান্ত অবাক হয়ে বললেন—বলেন কী মশাই, বিধান রায় তাঁর কামরায় বসে গান শুনতে চাইলেন? তাজ্জব ব্যাপার!

১৯

ডাঃ রায় একটি পূর্ণাঙ্গ স্কীম চাইলেন বটে, কিন্তু আমি পড়লাম অথই জলে। ঠিক এ-অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আবার এত বড়ো দায়িত্ব ভার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার কথাও ভাবতে পারছিলাম না। সুতরাং তাঁর নির্দেশ মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। পরবর্তী একাধিক সাক্ষাৎকারে ডাঃ রায় আমাকে অনুপ্রাণিত করলেন আর এ বিষয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন মন্মথ রায় মহাশয়। তাঁর সংগে দিনের পর দিন পরামর্শ করেছি এই স্কীম রচনার বিষয়ে। মনে পড়ে, আমার বাসভবনে একদিন দুজনে বসে চূড়ান্ত পরিকল্পনাটির রূপরেখা রচনা করেছিলাম এবং অবশেষে তা ডাঃ রায়ের কাছে নিবেদন করেছিলাম। আমরা এই প্রস্তাবিত সংস্থার নামকরণ করলাম 'লোকরঞ্জন শাখা' বা 'Folk Entertainment Section'। এই অভিনব প্রয়াসে খসড়া রচনা ও প্রাথমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে মন্মথদার সঙ্গে এক প্রীতিনিবিড় সম্বন্ধে বাঁধা পড়ে গেলাম।

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ তারিখে সমগ্র পরিকল্পনাটি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের অনুমোদন লাভ করলো। ১ অক্টোবর, ১৯৫৩ তারিখে মন্ত্রী-সভার বৈঠকে 'লোকরঞ্জন শাখা' গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হলো।

এই সংস্থায় ডাঃ রায়ই আমার পদটি সৃষ্টি করে দিলেন—পদটির নাম Adviser বা উপদেষ্টা। আমার জন্য মাসিক একটা সম্মানমূল্য বা honorarium স্থির করে দিলেন তিনি। আমার ফিল্‌ম্‌-এর কাজে যাতে কোনরূপ বিঘ্ন না হয়, তার ব্যবস্থা তিনিই করে দিলেন। দেড়শো জন শিল্পী নিয়ে লোকরঞ্জন শাখা গঠিত হয়ে গেল।

অবশ্য খসড়াটি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করার আগে থেকেই আমি ও মন্মথদা কর্মী ও শিল্পী সংগ্রহের কাজ সুরু করে দিয়েছিলাম, কারণ কাজের তাড়া ছিল। আমাদের কাজ প্রথমে সুরু হয়েছিল ওয়েলেসলি স্ট্রীটের এক সরকারী গুদাম খানার দ্বিতলে। সেখান থেকে পরে আমরা গিয়েছিলাম নবমহাকরণের ষষ্ঠ তলে। সে-বাড়ি তখন নির্মীয়মান এবং বৈদ্যুতিক উত্তোলন-যন্ত্রটি তখনো

সম্পূর্ণাঙ্গ হয়নি। মনে আছে, ডাঃ রায় শিল্পীদের মহলা দেখার জন্য একাধিকবার সিঁড়ি ভেঙে উঠেছিলেন এই ষষ্ঠ তলে। তাঁর প্রথম আগমনের দিন তো এমন একটি কৌতুককর ব্যাপার ঘটলো যা মনে পড়লে আজো আমার হাসি পায়। ডাঃ রায় কয়েকদিন আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে উনি অমুক দিনে মহলা দেখতে আসবেন। যেহেতু তখনো লিফ্‌ট্ তৈরি হয়নি, ডাঃ রায় কী ভাবে ষষ্ঠ তল পর্যন্ত উঠবেন এই কথা ভেবে ইনজিনিয়াররা অবশেষে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে কোনমতে অসম্পূর্ণ খাঁচাটিতে তারের দড়ি সংযোগ করে একটা কাজচলা গোছের লিফ্‌ট্ বানালেন।

নির্দিষ্ট দিনে ডাঃ রায় এসে নামতেই তাঁরা তো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। ডাঃ রায় জানতেন, এ বাড়িতে তখনো লিফ্‌ট্ তৈরি হয়নি। সুতরাং তিনি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। ইনজিনিয়াররা তখন তাঁকে বললেন—স্যার, এদিকে আসুন, লিফ্‌টের ব্যবস্থা আমরা করেছি।

ডাঃ রায় বললেন—সে কি, লিফ্‌ট্ আবার কোথা থেকে এলো?

তাঁরা বললেন—আজ্ঞে আপনি আসবেন বলে কাজ চালানোর মতো একটা ব্যবস্থা করেছি।

ডাঃ রায় বললেন—না হে না, সিঁড়িই ভালো, ওসব হাতুড়ে লিফ্‌ট্-এ চড়ে শেষকালে মাঝরাস্তায় খাঁচায় বন্দী হয়ে ঝুলব?

বলেই হন্ হন্ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলেন। ফলে ইনজিনিয়ার প্রভৃতির পুরো দলটাই তাঁর পিছনে পিছনে উঠতে লাগলেন। সিঁড়ি দিয়ে ষষ্ঠ তল পর্যন্ত উঠতে গিয়ে তরুণ ইনজিনিয়াররা অনেকে হাঁপাতে লাগলেন। অফিসারদের মধ্যে যাঁরা একটু স্ফীতোদর ছিলেন তাঁদের অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। ডাঃ রায় কিন্তু ঋজু ভঙ্গিতে অনায়াসে উঠে গেলেন, ক্লান্তির কোনরূপ চিহ্ন দেখা গেল না। ইনজিনিয়ারদের বেশ কয়েক দিনের পরিশ্রম বিফল হলো।

জন্মলগ্ন থেকে আগস্ট ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত লোকরঞ্জনের কর্মপ্রবাহ ছিল অক্ষুন্ন। কিন্তু অকস্মাৎ বিচিত্র এক প্রশাসনিক অনুশাসনে সাময়িকভাবে এটি বন্ধ হয়ে গেল। তবে এও যেন ছিল শিল্পদেবতারই আশীর্বাদ। লোকরঞ্জন আবার নব-নির্বাচিত শিল্পী ও কর্মীসম্ভার নিয়ে নতুন সাজে পূর্ণোদ্যমে কাজ সুরু করলো ১ এপ্রিল, ১৯৫৫ থেকে, ডাঃ রায়ের অকুণ্ঠ

আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে। এটা যেন ছিল লোকরঞ্জনের 'উপনয়ন' বা 'দ্বিজত্ব' লাভ।

লোকরঞ্জনের প্রাথমিক অবস্থার শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল মন্মথদার 'মহাভারতী' এবং 'যাত্রা হলো সুরু'—এই দুটি নাটকের প্রযোজনা। আর পুনর্গঠিত ও ও সম্প্রসারিত লোকরঞ্জনের প্রথম নিবেদন ছিল কবিগুরুর 'মুক্তির উপায়'। মহাভারতী নাটকটি যে বিশেষ অবস্থায় লোকরঞ্জন কর্তৃক প্রযোজিত হয়েছিল, তার কথা মনে পড়ছে। মন্মথ রায়ের এই নাটকটিকে তখন রঙমহলে মঞ্চস্থ করার তোড়জোড় চলছে। বিশিষ্ট নট ও চিত্রাভিনেতা জহর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তখন রঙমহলের কর্তা এবং তাঁর পরিচালনায় নাটকটির মহলা সুরু হয়ে গেছে। সেই সময় কল্যাণীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশন শীঘ্রই আরম্ভ হবে, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতারা আসবেন। বিপুল আয়োজন চলছে। ডাঃ রায় লোকরঞ্জনকে এই উপলক্ষে কল্যাণীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য বললেন এবং অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন, আমরা দুজনে যেন লোকরঞ্জন-শিল্পীবৃন্দের সাহচর্যে কল্যাণী কংগ্রেসে মাননীয় অতিথিবৃন্দের সাংস্কৃতিক আপ্যায়নের ভার গ্রহণ করি। 'মহাভারতী' নাটকটি ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের সাধারণ মানুষ যে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তারই একটা সুসংবদ্ধ নাট্যরূপ। মন্মথদা ডাঃ রায়কে এই নাটকটির কথা বলায় ডাঃ রায় ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে কল্যাণীতে এ নাটকটিই মঞ্চস্থ হোক।

এ অবস্থায় মন্মথদা জহর গাঙ্গুলি মহাশয়ের কাছে ছুটলেন ডাঃ রায়ের অভিপ্রায় জানাতে। জহরবাবু একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন, কারণ বাণিজ্যিক প্রযোজনার জন্য নাটকটির মহলা তখন পূর্ণবেগে চলেছে। যাইহোক, ডাঃ রায়ের ইচ্ছার সম্মানে জহরবাবু সম্মত হলেন। ঠিক হলো, লোকরঞ্জন শিল্পী-গোষ্ঠীকে জহরবাবুই মহলা দেওয়াবেন এবং তাঁরই পরিচালনায় কল্যাণী কংগ্রেসে 'মহাভারতী' পরিবেশিত হবে। তাই হয়েছিল এবং অভাবিত সাফল্যের সঙ্গে তা সমবেত সকলের অভিনন্দন লাভ করেছিল। জওহরলাল তো উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। মনে পড়ে, অভিনয়শেষে তিনি আমার হাত দুখানি জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম—Bengal's idea is unique! It

can be produced in Bengal only and by the artistes of Bengal alone !

'মুক্তির উপায়' নাটকটির প্রথম অভিনয় হয়েছিল ২৫ বৈশাখ, ১৩৬২ সনে, ৮ নং থিয়েটার রোডে। এটিও খুবই সাফল্য অর্জন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে লোকরঞ্জন শাখার প্রতিটি প্রযোজনাই বিপুল জনসম্বর্ধনায় ধন্য হয়েছিল। প্রতিটির নামোল্লেখ করা এখানে সম্ভবপর নয়, তবে সকল সাফল্যের মূলেই ছিল সেই 'অমৃতময়ূরীতমতী বাণী, নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি'র শুভাশীর্বাদ একথা আমি বিশ্বাস করি। নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে যা আমরা পেয়েছিলাম তা শিল্পদেবতারই দান। 'নটে নাটঃ পাতু নঃ'।

লোকরঞ্জন শাখা আনন্দের মাধ্যমে লোকশিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে নাট্যকলা ত্যাগ করতে নিষেধ করে বলেছিলেন—ওটা ছাড়িস না, ওতে লোকশিক্ষা হয়।

ঠাকুরের এই কথায় গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন যে নাট্যকলাচর্চা কখনোই ঈশ্বরসাধনার প্রতিবন্ধক নয়। তিনি নাট্যকলা ছাড়েননি।

শিল্পদেবতার অসীম করুণায় এই লোকশিক্ষাভিত্তিক আনন্দ যজ্ঞের প্রথম সংগঠনের দায়িত্বভার আমি পেয়েছিলাম ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আশীর্বাদে। একথাও স্মরণ করি যে মন্মথদার প্রীতিসিক্ত সাহচর্য লোকরঞ্জনের প্রাথমিক সংগঠনের গুরুভারকে অনেকটাই সহনীয় করে দিয়েছিল।

* * *

১৯৬৮ সালে সরকারী চাকুরি থেকে তাঁর অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত লোকরঞ্জনের বিভিন্ন ব্যাপারে মন্মথদার সহায়তা নানাভাবে পেয়েছি। তাঁর অবসর গ্রহণে উপলক্ষে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ প্রচার বিভাগের সহকর্মীরা তাঁর জন্য যে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, তাতে উপস্থিত থেকে সংগীত পরিবেশনের কথা ছিল আমার। কিন্তু আমি তাতে উপস্থিত থাকতে পারিনি। পারিনি, কারণ এ-ধরণের অনুষ্ঠানে অশ্রু সংবরণ করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে মন্মথদার সংগে কাজের মধ্য দিয়ে আমার যে প্রীতিনিবিড় সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল, তাতে, আমি জানতাম যে, আমি নিজেকে সামলাতে পারব না।

আমার অনুপস্থিতির ফলে কিন্তু সকলেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন বলে শুনে-ছিলাম। মন্মথদা নিজে তো পরের দিনই অনুযোগ করে ফোন করলেন।

এর উত্তরে আমার না-যাওয়ার কারণটি ও'কে বলতেই ও'র মনোবেদনা প্রশমিত হলো, বুঝতে পারলাম।

ভেবে আনন্দ পাই যে, আমাদের দুজনের এই আত্মীয়তা, যা গড়ে উঠেছিল লোকরঞ্জনের মঞ্চে, আজও তা অমলিন রয়ে গেছে।

কাঠমাণ্ডুতে রাজা মহেন্দ্র ও রাণী রত্নাকে গান শোনানোর পর

দিল্লীতে ফিল্ম্ সেমিনারে শ্রীমতী দেবিকারাণীর সঙ্গে। ১৯৫৫

২০

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর লোকরঞ্জনের উপদেষ্টা পদে কর্ম করেছি। সংগীত-নৃত্য-নাটক এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ে লোকরঞ্জন শাখায় ব্যবস্থাপনা, বিষয় নির্বাচন, শিক্ষণ, পরিচালনা ও প্রযোজনার সামগ্রিক দায়িত্ব ছিল আমার। এই কর্ম করতে গিয়ে যেমন পরিচালক ও শিক্ষকের ভূমিকায় অপার আনন্দ লাভ করেছি, ঠিক তেমনই আবার নীরস সরকারী ফাইলের কাজেও অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। এ অভিজ্ঞতা আমার কাছে অভিনব।

সে যাই হোক, লোকরঞ্জনের কর্মকাণ্ড বিষয়ে আর কিছু বলার আগে কেমন করে এর সংগে আমার সম্পর্কের অবসান হলো সেই ঘটনা একটু বলে নিই। কৌতুক, বিস্ময় ও বেদনা তিনটি রসই এই ঘটনায় মিশে আছে।

১৯৫৩ সালে তদানীন্তন তথ্যমন্ত্রী মহাশয়ের তরফ থেকে আমার কাছে তিনটি নাটক পাঠানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য, লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক এগুলির প্রযোজনা।

নাটক তিনটিই ছিল অত্যন্ত নীচু মানের। শিল্পগুণ তো ছিলই না, উপরন্তু রুচির দিক থেকেও ছিল আপত্তিকর। এদের সংলাপগুলি পাঠ করে আমি অপছন্দ করেছিলাম এবং আমার মতামতের নোট ফাইলে দিয়েছিলাম। আমার সিদ্ধান্ত ছিল, নাটকগুলি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রসঙ্গত বলি, ১৯৫৩ সালে এই নূতন তথ্যমন্ত্রী মহাশয় যখন কর্মভার গ্রহণ করলেন, তখন আমি বার বার তাঁকে টেলিফোনে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকরঞ্জনের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন সমস্যা তাঁর সংগে আলোচনা করা এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার মতামত তাঁর কাছে নিবেদন করা। এই আলোচনার জন্য দুঘণ্টা বা কমপক্ষে এক ঘণ্টা সময় আমি যাচ্‌ঞা করেছিলাম। দুর্ভাগ্য, মন্ত্রীমহোদয় আমায় বার বার বলে গেলেন যে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের বেশি সময় তিনি আমাকে দিতে পারবেন না। ফলে, আমি ক্ষুন্ন হয়েছিলাম। স্বয়ং বিভাগীয় মন্ত্রী লোকরঞ্জন

শাখার মতো এমন এক বৃহৎ সৃষ্টিধর্মী সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপদেষ্টাকে বড় জোর দশ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারবেন না !

আর বেশি উচ্চবাচ্য না করে অবশেষে আমি নীরব হয়ে গিয়েছিলাম।

কিছুদিন পরে অকস্মাৎ এক প্রভাতে উক্ত মন্ত্রীমহাশয়ের টেলিফোন এলো আমার বাসগৃহে। তিনি আমায় বললেন যে পূর্বোক্ত তিনটি নাটকের লেখকরা তাঁর কাছে সেদিনই আসবেন। তিনি চান যে আমি যেন সেই সময়ে তাঁর ঘরে উপস্থিত থাকি, কারণ তাঁর ও আমার সামনেই নাটক তিনটি পাঠ করা হবে। তিনি তাড়া দিয়ে হুকুম -করলেন—আপনি এখুনি চলে আসুন।

তাঁর বক্তব্য ও ভঙ্গি দুটিই আমার পক্ষে দুষ্পাচ্য ছিল। তিনটি নাটক তিনি শুনবেন, অর্থাৎ বেশ কয়েক ঘণ্টা তিনি তাঁর মূল্যবান সময় থেকে খরচ করবেন, অথচ……

আমি জবাব দিলাম—আজ্ঞে না. আমার পক্ষে এখন যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নাটক তিনটি যে প্রযোজনার যোগ্য নয়, সেকথা লিখে আমি তো আগেই নোট দিয়েছি, ফাইলেই পাবেন। সুতরাং নাটকগুলি আমার পুনর্বার শোনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে আপনি আমাকে লোকরঞ্জন বিষয়ে আলোচনার জন্য দু-একঘণ্টা দূরের কথা, দশ মিনিটের বেশি সময় দিতে সম্মত হননি বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও। আর আজ কিনা আপনি এই তিনটি অযোগ্য নাটক শোনবার জন্য এত সময় দিতে পারবেন !

মন্ত্রীমহোদয় বোধকরি কুপিত হলেন। বললেন—বেশ, তাহলে আপনি আসতে পারছেন না।

আমি বললাম—আজ্ঞে না।

ঝনাৎ ক'রে শব্দ ছিটকে এলো। তথ্যমন্ত্রীমহোদয় সশব্দে রিসিভার রেখে দিলেন।

আমার পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ করতে আর কোনো দ্বিধা হলো না।

অচিরেই পদত্যাগপত্র লিখে পাঠিয়ে দিলাম। লোকরঞ্জন শাখার সঙ্গে উপদেষ্টা হিসাবে আমার সুদীর্ঘ ও সুনিবিড় সম্পর্কের অবসান ঘটলো।

* * *

আমার সময়ে লোকরঞ্জন শাখার কর্মবিভাগ ছিল নিম্ন প্রকারের।

তিনটি নাট্যবিভাগ। একটিতে শিল্পীসংখ্যা বেশী, অন্য দুটিতে কিছু কম। প্রথমে বড় নাট্যবিভাগটি গঠিত হয়েছিল, পরে দুটি ছোট আকারের নাট্যবিভাগ গঠন করা হয়।

দুইটি নৃত্য বিভাগ—একটি বড় এবং পরে অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি।

দুইটি তরজা বিভাগ।

প্রতিটি বিভাগেই একজন করে পরিচালক ছিলেন, বিভাগীয় ম্যানেজাররাও ছিলেন। সমগ্র দপ্তরটির অফিস পরিচালনার জন্য ছিলেন একজন Administrative Officer, তাঁর সহকারী দুতিন জন clerk ও একজন typist।

প্রতি বৎসর চারখানি নূতন নাটক রচনা করিয়ে ক্রয় করা হতো এবং শহরে ও গ্রামাঞ্চলে অভিনয় করা হতো। নাটকগুলির মূল সুর ছিল দেশহিতৈষণা। নৃত্যনাট্যগুলিও দেশাত্মবোধক ছিল। এগুলিও রচনা করিয়ে ক্রয় করা হতো এবং অনুরূপভাবেই মঞ্চস্থ করা হতো। প্রতি বছর দুখানি নৃত্যনাট্য প্রযোজনা করা হতো।

বছরে চব্বিশখানি দেশাত্মবোধক সংগীত রচনা করিয়ে ক্রয় করা হতো। গ্রামোফোন কোম্পানীর মাধ্যমে দুশো ডিস্ক্ প্রস্তুত করে সরকারী প্রচার বিভাগ দ্বারা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে জেলাগুলির বিভিন্ন ব্লক বিতরণ করা হয়েছিল। প্রতি বছর চারখানি করে রেকর্ডনাট্য রচনা করানো হতো এবং সেগুলিও ডিস্কে রেকর্ড করিয়ে প্রচার বিভাগের সাহায্যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ব্লকে বিতরণ করা হতো। লোকরঞ্জন শাখার প্রথম প্রযোজনা ছিল মন্মথদার 'মহাভারতী' এবং 'যাত্রা হলো সুরু'। এ দুটি ১৯৫৪ সালে যথাক্রমে বাইশে ও পঁচিশে জানুয়ারি এবং একুশে ও ছাব্বিশে জানুয়ারি, কল্যাণী কংগ্রেসের অধিবেশন শেষে বিশেষ মণ্ডপ নির্মাণ করে জওহরলাল নেহরু, বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে অভিনয় করা হয়েছিল।

জওহরলাল নেহরু কী পরিমানে অভিভূত হয়েছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। তাঁর বিশেষ অনুরোধে পর পর কয়েক বছর চার-পাঁচখানি নাটকের হিন্দী রূপান্তর এবং কয়েকটি নৃত্যনাট্যেরও হিন্দী রূপান্তর দিল্লীর বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। সুবিশাল তালকাটোরা বাগিচার মুক্তাঙ্গন

অভিনয়মঞ্চেও বিভিন্ন গুণিজন, মন্ত্রীমহোদয় ও বহু দর্শকের সমাবেশে আমরা আমাদের নাটকগুলি বেশ কয়েকবার প্রযোজনা করেছিলাম।

দিল্লীর আকাশবাণী ভবন প্রাঙ্গনেও পর পর দুদিন দুখানি নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ দুটি মন্মথদার রচনা 'যাত্রা হলো সুরু' এবং 'গঙ্গাবতরণ'। এই দুদিনই জওহরলাল এবং তাঁর সহকর্মীদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। প্রথমটির বিষয়বস্তু ছিল জমি ও সেচব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল বাঁধ নির্মাণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন। দ্বিতীয় দিন অভিনয়ান্তে নেহরু আমার করমর্দন করে প্রগাঢ় আনন্দে বলেছিলেন—

Bengal has appreciated the concept of my idea about modern pilgrimage in India.

১৯৫৩ সালের ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস যে-উৎসবের আয়োজন করেন তার একটি অঙ্গ ছিল ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের সার্ধ-দ্বিসহস্র বার্ষিকী উদ্‌যাপন। চৌরঙ্গী থিয়েটার রোড সংযোগস্থলে সুরম্য মণ্ডপ রচনা করে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। এই আয়োজনে 'গৌতমবুদ্ধ প্রশস্তি' নামক অনুষ্ঠানটি মঞ্চস্থ করেছিল লোকরঞ্জন শাখা। স্বভাবতই আমি ছিলাম সুরকার ও প্রযোজক।

পালি ধর্মগ্রন্থ থেকে ভগবান্ বুদ্ধের প্রশস্তিবাচক শ্লোকাবলী উৎকলন করে সেই শ্লোক সমূহকে বিন্যস্ত ও সুরাশ্রিত করে পরিবেশন করা হয়েছিল। পঞ্চশীল আদর্শসমূহের প্রচারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল তখন। সেই পটভূমিতেই গৌতম বুদ্ধ প্রশস্তির এই অনুষ্ঠানটি করা হয়েছিল।

যে সমস্ত শ্লোকে সুর-সংযোজন করে পরিবেশন করেছিলাম, তার দু-একটি উদ্ধার করতে প্রলুব্ধ হচ্ছি—

ত্যাজি তরি পুরি ভাবি ধনি মণি কনকা
সখি প্রিয়সুত মহি সনগর নিগমা।
শিরমপি ত্যাজি স্বকু করচরনয়না
জগতি য হিতকরু নিজগুণনিরতা ॥

অর্থাৎ, হে মহাপ্রাণ, তুমি তোমার পূর্বতন জীবনে তোমার স্বর্ণ, রত্ন ও যাবতীয় সম্পদ্ দান করেছিলে। তোমার স্ত্রী, প্রাণাধিক পুত্র, রাজ্য, নগর,

জনপদ সকলই ত্যাগ করেছিলে। তোমার সকল গুণরাজিও দান করেছিলে—সকলই এই জগতের হিতার্থে।

ন হিংসে পাণভূতানি বিক্কমানে পরক্কমে
মুসা চ ন ভণে জানং অদিন্নং ন পরামসে ।।

অর্থাৎ, জীবকে আঘাত দেবার অভ্যাস করো না, যতই তুমি পরাক্রান্ত হওনা কেন। জ্ঞাতসারে মিথ্যা বলো না। যে বস্তু তোমার প্রীতি প্রদত্ত নয়, তা স্পর্শ করো না।

রূপং দ্রষ্টব্যরত্নং তে শ্রব্যরত্নং সুভাষিতম।
ধর্মো বিচারণারত্নং গুণরত্নাকরো হ্যসি ।।

অর্থাৎ, তুমি রূপে রত্ন, বাক্যে রত্ন, অনুশাসনে রত্ন। অজস্র গুণরাজি-রত্নের তুমিই আগার।

* * *

'মহাভারতী' নাটকটি হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করে অভিনয় করা হয়েছিল, আগেই বলেছি। এর অনুবাদক ছিলেন হংসকুমার তেওয়ারি মহাশয়।

লোকরঞ্জন শাখার যাঁরা গীতিকার ছিলেন, তাঁদের নামোল্লেখ করাও কর্তব্য বলে মনে করি। ভরসা করি, স্মৃতির দুর্বলতা হেতু যদি কোনো নাম বাদ পড়ে যায়, তাহলে পাঠক আমায় মার্জনা করবেন।

গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন সুরেন চক্রবর্তী, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ ভট্টাচার্য, সুস্বর বাণীকুমার, শান্তি পাল, শৈলেন রায়, রূপচাঁদ চক্রবর্তী, শচীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈল চক্রবর্তী, শান্তি ভট্টাচার্য, অনন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবানী দেবী, বাণী বসু প্রভৃতি।

হিন্দী গীতিকার ছিলেন—হংসকুমার তেওয়ারি ও উদয় খান্না। যাঁরা গায়ক ছিলেন ও যাঁদের গান রেকর্ড করা হয়েছিল, তাঁরা হচ্ছেন—

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, ধীরেন বসু, শচীন গুপ্ত, মৃণাল চক্রবর্তী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, অমর পাল, প্রভাতকুমার মিত্র, অপরেশ লাহিড়ী, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং মীরা মিত্র, মায়া সরকার, শেফালি নিয়োগী প্রীতি দাশগুপ্ত,

উৎপলা সেন, সুমিত্রা সেন, শোভা ও মীরা রায়চৌধুরী, মঞ্জুলা সেনগুপ্ত, মীনাক্ষী সেনগুপ্ত, বাঁশরী লাহিড়ী প্রভৃতি।

এক্ষেত্রেও যদি কোন নাম বাদ পড়ে থাকে তো মার্জনা ভিক্ষা করে রাখি।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি নৃত্যনাট্য 'শতাব্দীর সাধনা,' লোকরঞ্জনের প্রযোজনায় বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। এর বিষয়বস্তু ছিল ভারতের জাতীয় জাগরণের একশো এক বছরের ইতিহাস (১৮৫৬-১৯৪৭)।

এছাড়া নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় রচিত 'ভারতের সাধক কবি' নামক একটি নৃত্যনাট্যও বিপুল সমাদর ও সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করেছিল। এর বিষয়বস্তু গুলি ছিল শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দম্, পদকল্পতরু, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কবীর, মীরাবাঈ, তুকারাম, রামপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ। এই নাটকের হিন্দী রূপান্তর সারা ভারতে প্রদর্শিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রও এটি দেখানো হয়েছিল। সেখানে এটি বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছিল। এছাড়া লোকরঞ্জনে আমার প্রযোজনায় 'মহুয়া', 'শবরী'ও 'মহাউদ্বোধন' প্রভৃতি নাটক (নৃত্যনাট্য) বিশেষভাবে স্মরণীয়।

২১

কথায় কথায় একটি বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। সম্ভবত ১৯৫৪ সালের কথা। পরবর্তী যুগের বিশ্ববিশ্রুত ফিল্ম্-পরিচালক সত্যজিৎ রায় মহাশয় তখন 'পথের পাঁচালী' ছবির কিছু অসম্পূর্ণ দৃশ্য তুলে অর্থাভাবে আর অগ্রসর হতে পারছিলেন না। অবশেষে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে তিনি সরকারী অর্থানুকূল্যের জন্য আবেদন জানিয়াছিলেন। ডাঃ রায়ের অনুকূল্য তিনি পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্রজগৎ একটি অভূতপূর্ব শিল্পকর্ম উপহার পেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাণ্ডারেও এছবি অজস্র অর্থ এনে দিয়েছিল একথা আজ সকলেই জানেন।

সে সময় আমি লোকরঞ্জনে জড়িত ছিলাম বলেই এই ব্যাপারে আমার কিছু যোগাযোগ ঘটেছিল। সেই কথা বলি।

মন্মথদার মুখে শুনেছিলাম, একদিন রাইটার্স বিলডিংসে তাঁর ঘরে একজন দীর্ঘদেহী যুবক প্রবেশ করলেন, হাতে একটি আবেদনপত্র। ডাঃ রায়ের উদ্দেশে লেখা। দরখাস্তটির মাথায় কোনাকুনিভাবে ডাঃ রায়ের হাতের লেখা 'Manmatha', নীচে তাঁর ইনিশিয়াল। মন্মথদা বুঝতে পারলেন ডাঃ রায় দরখাস্তটি তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য। দরখাস্তটিতে সেই যুবক (অর্থাৎ সত্যজিৎ রায় মহাশয়) যা লিখেছিলেন তার মর্মার্থ এই যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' অবলম্বনে তিনি চলচ্চিত্র তুলছেন, কিছুটা তুলতে গিয়েই তিরিশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, এবং ছবিটা শেষ করার মতো আর্থিক সংস্থান তাঁর মিলছে না। এ-অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে আর্থিক সহায়তা দিলে তিনি ছবিটা সম্পন্ন করতে পারেন।

এত বড়ো একটা ব্যাপার প্রচার বিভাগের কর্তা প্রকাশস্বরূপ মাথুর মহাশয়ের কাছে না পাঠিয়ে ডাঃ রায় সোজাসুজি মন্মথদাকে পাঠাতে মাথুর নাকি একটু অবাক হয়েছিলেন এবং পরে তাঁর নিজের নোট্-এ মন্তব্য করেছিলেন যে এই করুণরসের ছবিতে কেবল দারিদ্র্যজর্জরিত একটি দুঃখী

বাঙালী পরিবারকে দেখানো হয়েছে—এই ছবি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজনা করলে সরকারী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। সুতরাং এই ছবির দায়িত্ব নেওয়া যায় যদি হাজার ফুটের মতো একটা সিকোয়েন্স যোগ করা হয়, যার বক্তব্য হবে বিভূতিভূষণের সময় বাংলা দেশের এই অবস্থা ছিল বটে তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী হলে এমনটা আর থাকবে না। মন্মথদার মুখে শুনেছিলাম, মাথুরের প্রস্তাব ছিল যে ঐ সিকোয়েন্সটি হয় মন্মথদা না হয় অন্য কোনো খ্যাতনামা সাহিত্যিক লিখবেন, কিন্তু মন্মথদা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে পথের পাঁচালীর ব্যাপারে, তিনি 'খোদার উপর খোদকারী' করতে পারবেন না।

সে যাই হোক, প্রকাশস্বরূপ মাথুর এবং মন্মথ রায় এই দুজনেরই রিপোর্ট ডাঃ রায় দেখেছিলেন এবং ছবিটি যেটুকু হয়েছে তা নিজে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখন এই অসমাপ্ত চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছিল ডাঃ রায়ের বাসভবনে। সেখানে ডাঃ রায় ও তাঁর পরিবারের লোকেরা তো ছিলেনই, আর ছিলেন মন্মথদা ও মাথুর মহাশয়। তদুপরি ডাঃ রায়ের অভিপ্রায়ক্রমে এবং মন্মথদার আহ্বানে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

যে ছবি একদিন সারা পৃথিবীর সামনে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছিল সেদিন সেই ছবির কয়েকটি সিকোয়েন্স মাত্র দেখেছিলাম ডাঃ রায়ের বাসভবনে। মন্মথদার মুখে যাই শুনে থাকি না কেন আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে ছবিটির মধ্যে যে অসাধারণ সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল তা সেদিন কয়েকটি টুকরো টুকরো সিকোয়েন্স দেখে আমি অন্তত বুঝে উঠতে পারি নি। খণ্ড চিত্রগুলি খুবই ভালো লেগেছিল, এই পর্যন্ত। কিন্তু ছবিটি সম্পূর্ণ হলে যে চলচ্চিত্রজগতে একটি যুগান্তর ঘটে যাবে তা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা সেদিন সম্ভব হয়নি। পরে যখন সম্পূর্ণ ছবিটি একাধিকবার দেখেছি, তখন বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়েছি, মনে হয়েছে ফিল্মের এই নবযুগের সূচনা আমরা প্রবীণরা দেখে যেতে পারলাম, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য!

কিন্তু সেকথা থাক। সেদিন মন্মথদার সঙ্গে আমারও আন্তরিক অভিলাষ ছিল যে মাথুর মহোদয় যাই লিখুন না কেন, ডাঃ রায় যেন ছবিটির প্রতি সদয় এবং অকৃপণ হস্তে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য দেন।

এখানে একটা কথা বলি। লোকরঞ্জন শাখার পরিকল্পনায় ফিল্মু

প্রয়োজনা বাবদ তিরিশ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। আমরা জানতাম, কাজে না লাগাতে পারলে টাকাটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, পর পর কয়েক বছর যদি এই বরাদ্দ অব্যবহৃত থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত নিষ্প্রয়োজন বোধে এই বরাদ্দ চিরকালের মতো বন্ধ করে দেওয়া হবে। লোক-রঞ্জন যদি ফিল্‌ম্‌ তুলতে না পারে, তাহলে ফিলমের জন্য বরাদ্দ বলে আর কিছু থাকবে না শেষ পর্যন্ত। অথচ, ফিল্মের লোক হিসাবে সব সময়ই কামনা করতাম ফিল্‌ম্‌ ইন্‌ডাস্‌ট্রি সরকারী সাহায্য লাভ করুক। অর্থাভাবে কোনো ছবির কাজ যেন কখনো রুদ্ধ হয়ে না যায়। তাই যখন ছবিটি দেখে ডাঃ রায় উপরে উঠে গেলেন, আমি ও মন্মথদা দুজনে বলাবলি করতে লাগলাম যে সরকারী বরাদ্দের টাকাটা চলচ্চিত্রের পিছনেখরচ করার একটা ভালো সুযোগ মিলে গেল।

সারাজীবন ভারতীর সিনেমার সঙ্গে সংযুক্ত থেকে সিনেমার প্রতি আমার একটা নির্বিশেষ দুর্বলতা ছিল, আজও আছে। শুনেছিলাম, মন্মথদা আগেই ছবিটি সম্পর্কে অনুকূল রিপোর্ট ডাঃ রায়কে দিয়েছিলেন। ডাঃ রায় যখন মৌখিকভাবে আমার কাছে জানতে চাইলেন কেমন লাগলো আমি ছবিটিকে সমর্থন করে তাঁকে বলেছিলাম। পরে একদিন শুনলাম, ডাঃ রায় শেষ পর্যন্ত মাথুর সাহেবের রিপোর্ট নাকচ করে দিয়েছিলেন এবং ছবিটির জন্য ষাট হাজার টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়েছিল।

সত্যজিৎ তাঁর অসাধারণ প্রতিভা-বলেই শিল্পদেবতার করুণায় ডাঃ রায়ের মতো মহৎ ব্যক্তির স্নেহদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। আমার ভাবতেও ভালো লাগে যে সর্ব অর্থেই দীর্ঘদেহী এই দুটি প্রবীণ ও নবীন প্রতিভার প্রারম্ভিক পরিচয়ের একটি খণ্ডচিত্র অবলোকন করার সুযোগ আমার জীবনে এসেছিল।

২২

লোকরঞ্জনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে নানা দিক থেকে নানা সম্পদ্ এনে দিয়েছিল। প্রধানত রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং সিনেমা ও বেতার শিল্পের সংগে দীর্ঘকাল ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম তার উপরে নতুন কিছু সংযোজন ঘটিয়ে দিলো লোকরঞ্জন শাখা। প্রত্যক্ষভাবে লোকগীতি ও লোকসংস্কৃতির সংগে সম্বন্ধযুক্ত এক বিরাট শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করে এবং সেই সংগে সরকারী ফাইলের কর্মে জড়িয়ে পড়ে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, রোমাঞ্চ ও আনন্দ সঞ্চয় করেছিলাম তা আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়।

কিন্তু এই কি সব? এ সব কিছুর উপরেও আমার একটা পাওনা হয়েছিল। তা হচ্ছে ডাঃ রায়ের মতো এক মহীরূহ সদৃশ ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য ও স্নেহপ্রীতি লাভ। আমার জীবনের প্রিয়তম মন্ত্র—'চরৈবেতি'। অক্লান্ত ভাবে পথ-চলাকেই যিনি জীবনচর্যা হিসাবে গ্রহণ করেন, তিনি তাঁর চলার পথেই নানা সম্পদ্ প্রাপ্ত হন্। আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনে সৃষ্টি যদি কিছু নাও করতে পেরে থাকি, পথ চলা কখনো থামাইনি। তাই বোধকরি ভাগ্যবিধাতার করুণায় নিন্দা-বিদ্রূপের সাথে সাথে আনন্দ-সম্পদও কম লাভ করিনি। কাঁচের সংগে কাঞ্চনকণাও আমার বিমুগ্ধ ভাণ্ডারকে বার বার সম্পন্ন করে তুলেছে। আপন সঞ্চয় থেকে এক কণা তণ্ডুল যদি চলার পথে কাউকে দিয়ে থাকি, তা অনেক ক্ষেত্রেই সুবর্ণময় হয়ে ফিরে এসেছে। আজ জীবনের প্রান্তসীমায় এসে হৃদয়ের বন্ধ তালা খুলে দেখি সেখানে রয়েছে 'আনন্দ নিকেতন'—সাজানো রয়েছে 'গোপন রতনভার'।…

ডাঃ রায় ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মহাতেজা পুরুষ। কিন্তু সংগীত সম্বন্ধে তাঁর কোনো আগ্রহের কথা কখনো শুনিনি। তাঁর অবচেতন মনে যদি কোথাও সেই আগ্রহ থেকে, তবে তা উন্মোচিত হয়েছিল 'লোকরঞ্জন' নিয়ে আমার সংগে ঘনিষ্ঠ হবার পর। আমার মনে তাই একটা গোপন শ্লাঘা ছিল। এখন তা নির্লজ্জের মতোই প্রকাশ করছি। আমার

মনে হয়, তাঁর মধ্যে সংগীতপ্রীতিকে আমিই প্রথম জাগিয়ে দিয়েছিলাম। সেই যে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ বসে তিনি আমার গান শুনলেন সেই থেকে সংগীত, বিশেষত রবীন্দ্রসংগীত, আরো বিশেষ করে বলতে গেলে কবিগুরুর পূজা, স্বদেশ ও আনুষ্ঠানিক প্রভৃতি বিভাগের গানগুলি তাঁকে মাতিয়ে দিয়েছিল। তাঁকে গান শোনাবার জন্য প্রায়ই আমার ডাক পড়তো। বিশেষ বিশেষ পারিবারিক অনুষ্ঠানে তো বটেই, সাধারণভাবেও ডেকে পাঠাতেন বার বার। এমন কি কাশ্মীরে সদলবলে ছুটি কাটাতে গিয়েও তিনি আমায় ভোলেননি। সেখান থেকেই ডেকেছেন—পারো তো চলে এসো।

পেরেছিলাম। গুলমার্গ, খিলানমার্গ, পহলগাঁও প্রভৃতি স্থানে তাঁর সংগে ঘুরেছি, হাউসবোটে থেকেছি, শ্রীনগরে মহারাজার প্রাসাদে ডাঃ রায়ের প্রসাদাৎ আতিথ্য পেয়েছি। ডাঃ রায় ছিলেন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এক অতীব মান্য-গণ্য মুখ্যমন্ত্রী, স্বয়ং জওহরলালও তাঁর পাশটিতে তাঁর অনুজ বলে প্রতীয়মান হতেন। তাঁর খাতিরের ব্যবস্থাও ছিল সর্বত্রই নিখুঁত। তাঁর সংগী হিসাবে নির্গুণ আমি বা আমার মতো অনেকেই সেই খাতিরের প্রতিফলিত গৌরব অংগে মেখে নেবার সুযোগ পেতাম।

কাশ্মীরে প্রত্যহই ডাঃ রায়কে আমি গান শোনাতাম। যুবরাজ করণ সিং তখন নিতান্তই তরুণ, তাঁর প্রাসাদেও তিনি আমার গান শুনেছেন। একদিন মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের গৃহেও গানের আসর বসেছিল! বক্সী সাহেব সোৎসাহে তবলা নিয়ে বসে গিয়েছিলেন। বুঝেছিলাম যে তাঁর এককালে গান-বাজনার শখ ছিল। তবলাবাদক হিসাবে তিনি খুব কিছু নন, তবে ঠেকা দিলেন মন্দ নয়।

কাশ্মীরের সেই রাজসমারোহময় পরিবেশে, যেখানে স্বয়ং ডাঃ বিধান রায় মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করছেন, কী উল্লাসের সংগে দিনগুলি কেটেছিল কী বলব। ওখানে মাঝে মাঝে মনে খেদ জাগতো আমার স্ত্রী সংগে এলেন না বলে! বার বার বলেছিলাম তাঁকে, কিন্তু তাঁর ঐ এক কথা—আমি যে ইংরিজি জানি না। আমি তাঁকে বুঝিয়েছিলাম—ইংরিজি জানার দরকারটা কী? ডেকেছেন স্বয়ং ডাঃ রায়, তিনি নিতান্তই বাঙালী, বিউলির ডাল খান, শুক্তো খান।

আমার স্ত্রী তথাপি বলেন—না বাবা, রাজারাজড়া সাহেবসুবোদের ভীড় সেখানে। ও তুমি একলাই যাও।

আমি যতো বলি 'তবে, এবার যে যেতে হবে'
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে 'না না না'।

অগত্যা একাই যেতে হলো! একাই কাশ্মীরের রাজভোগ লুঠ করলাম আর কাশ্মীর উপত্যকার হ্রদে, অরণ্যে পর্বতে হিন্দী-উর্দু গানের সঙ্গে বিশ্বকবিরও নাম-গান গেয়ে বেড়ালাম।

* * *

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে, আমি যতদূর দেখেছি, বিধানচন্দ্র ছিলেন একটি পরিপূর্ণ বাঙালী। খাদ্য রসিক ছিলেন খুবই, কিন্তু তাতে বিলাস বাহুল্য ছিল না। কোন দিন কী খাবেন এ বিষয়ে তাঁর নানান নিয়ম ছিল। যেমন, হয়তো, সোমবারে তাঁর ভাতের সঙ্গে মুগডাল চাই, মঙ্গলবারে মুসুর ডাল ইত্যাদি। বাঙালী গৃহস্থ ঘরের পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খেতে ভালবাসতেন। সময়নিষ্ঠ মানুষ, ঘড়ি ধরে সব কিছু করতেন। পোলাও-কালিয়া যে খেতেন না তা নয়। তবে পরিমিত, কোনো অমিতাচার ছিল না।

দাঁতগুলি তাঁর বাঁধানো ছিল, আমি তাই দেখেছি। মধু ছিল তাঁর খুব প্রিয়। গুড় খেতেও খুব ভালবাসতেন, টাটকা খেজুর বা আখের গুড়, যে ঋতুতে যেমন পাওয়া যায়। আখের গুড় তো তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। রোজ রাত্রে লুচি-পরোটা বা রুটির সঙ্গে গুড় একটু চাই-ই। বলতেন—রোজ একটু গুড় খেয়ো হে, শরীর ভালো থাকবে।

জলে গোলা খয়ের খেতে বারণ করতেন। বলতেন—মোটেই খাবে না, গুঁড়ো খয়ের খাবে। নিজে আহারের পর বাঁধানো দাঁত খুলে ফেলে মুখের ভিতর গুঁড়ো খয়ের দেওয়া পান-ছেঁচা ভালো করে মাখিয়ে নিতেন। তারপর রসটা টেনে নিয়ে ছিবড়ে ফেলে দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতেন।

* * *

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের দু একটি বিশেষ চিত্র আজও আমার চোখের সামনে জ্বল্-জ্বল্ করছে। একটি হচ্ছে লোকরঞ্জনের শিল্পী নিয়োগের ব্যাপারে তৎকালীন চীফ্ সেক্রেটারী সত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন এবং অন্যটি হচ্ছে জনৈক বিভাগীয় সেক্রেটারী (সম্ভবত আই, এ, এস—নামটি

মনে নেই) প্রেরিত একটি নোট সংক্রান্ত ব্যাপার, যে নোটে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একজন কেরানীর সাসপেনসান-এর জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

এই দুটি ঘটনারই আমি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম।

লোকরঞ্জন শাখায় শিল্পীদের নিয়োগ করার ব্যাপারে সরকারী নীতি কী হবে এই নিয়ে ডাঃ রায়ের কামরায় একদিন আলোচনা হচ্ছিল। অন্যান্যদের মধ্যে ডাঃ রায়ের সামনে উপস্থিত ছিলাম আমি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন চীফ্ সেক্রেটারী এস্, এন্, রায়, আই, সি, এস, মহোদয়। এই আলোচনায় চীফ্ সেক্রেটারী অভিমত দিলেন যে শিল্পীদের শিল্পগত যোগ্যতা তো দেখা হবেই, উপরন্তু তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার একটা ন্যূনতম মান স্থির করে দিতে হবে। অর্থাৎ, আবেদনকারীকে তাঁর মতে, অন্তত ম্যাট্রিকুলেট হতে হবে।

আমি কিন্তু এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করছিলাম।

কিছু বলব বলে মনে করেছি, এমন সময় ডাঃ রায়ই বলে উঠলেন—কেন? যিনি যে বিষয়ে শিল্পী, তাঁকে সেই বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। অভিনয়, গান, ইত্যাদির ব্যাপারে সেটাই তো যথেষ্ট!

চীফ্ সেক্রেটারী তথাপি কিছু বলার চেষ্টা করলেন। ডাঃ রায় তখন বললেন—ওহে সত্যেন, তুমি তো বিদ্বান্ লোক, আই, সি, এস,··· বলেই আবার আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা পঙ্কজ, তোমাদের কী কী সব রাগ রাগিনী আছে বল তো।

আমি বলতে শুরু করলাম—আজ্ঞে, টোড়ি, ভৈরবী, পূরবী, মালকোষ···

আমাকে আর বলতে না দিয়ে ডাঃ রায় আবার সত্যেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, তুমি তো বিদ্বান্ লোক, আই, সি, এস,—বল দেখি মালকোষ কাকে বলে? বল দেখি কত রকমের রাগ-রাগিনী আছে? শুনেছি কে একজন মস্ত বড় বাদক টিপ সই করেন। তা তুমি কি তার মতো বাজনা বাজাতে পারবে?

তারপর আমার দিকে চেয়ে আবার বললেন—কি পঙ্কজ, তোমাদের একজন গায়ক বা তরজা-শিল্পীকে কি গ্র্যাজুয়েট বা ম্যাট্রিকুলেট হতেই হবে?·· দেখো, আমার মতে এগুলো বাজে যুক্তি। শিল্পীর শিল্পগত দিকটা দেখে নিলেই হবে। আবার কী!

এই কথা বলেই তিনি প্রসঙ্গটি শেষ করে দিলেন। চীফ সেক্রেটারীও আর বাক্যব্যয় করলেন না। ডাঃ রায়ের কথাই, বলা বাহুল্য, চূড়ান্ত হয়ে গেল। আমি যা চেয়েছিলাম, আমি বলার আগেই ডাঃ রায়ের কথায় তা দাঁড়িয়ে গেল। আমি যে মনে মনে ডাঃ রায়ের এই উদার, বাস্তব ও যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্তে পুলকিত ও শ্রদ্ধান্বিত হলাম, তা আশা করি বলার অপেক্ষা রাখে না।

আর একবার আর একটি ঘটনা দেখে ডাঃ রায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বহুগুণ বর্ধিত হয়েছিল।

সেদিনও আমি রাইটার্স বিলডিংস্-এ ডাঃ রায়ের ঘরে বসে আছি। ডাঃ রায় ফাইলের কাজ করছেন, মাঝে মাঝে কথা বলছেন। এমনি চলতে চলতে একটি ফাইল খুলে দেখেন যে, কোনো একজন বিভাগীয় সেক্রেটারী তাঁর অফিসের জনৈক কেরানীকে সাসপেণ্ড করার সুপারিশ করেছেন। অভিযোগ এই যে কেরানীটিকে অন্য এক বিভাগ থেকে আনা হয়েছে একটু বেশি দায়িত্বের কাজে বসানো হয়েছে, কিন্তু ছ'মাস গত হতে চলল, কেরানীটি নতুন কাজে মোটেই রপ্ত হতে পারেনি। অতএব সে সাস্পেনসন্-এর যোগ্য।

ডাঃ রায় তাঁর পি, এ, কে ডাকলেন। বললেন—অমুক সেক্রেটারীকে ডাকো। বলো, সে তার বিভাগের একটি কেরানীকে সাসপেণ্ড করার জন্য যে ,নোট' দিয়েছে সেই বিষয়ে ডেকেছি।

একটু থেমে ডাঃ রায় পি, এ, কে আবার বললেন—বল তো কী বলবে ? পি, এ, তখন যা যা বলতে হবে তাই গড় গড় করে বলে গেলেন। ডাঃ রায় বললেন—ঠিক আছে, যাও।

অল্পকালের মধ্যেই সেই সেক্রেটারী মহোদয় ডাঃ রায়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ডাঃ রায় ওঁকে নিরীক্ষণ করে বললেন—তোমাকে কী বিষয়ে ডেকেছি, শুনেছ তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কই সে বিষয়ের সমস্ত ফাইল-পত্র তবে সঙ্গে আনোনি কেন ? বিষয়টা বলে দেওয়া সত্ত্বেও সেগুলো আনোনি ?

—আজ্ঞে স্যার এখুনি আনছি।

—অর্থাৎ তোমার জন্য চীফ্ মিনিষ্টার সময় নষ্ট করে বসে থাকবে। তুমি একটা ডিপার্টমেণ্টাল সেক্রেটারী হয়ে এটুকু জানো না? এটা কাজের ভুল নয়? আর তুমিই কি না একটা কেরানীর কাজের ভুলের জন্য সাসপেনসনের সুপারিশ করেছ। একটা গরীবের ছেলের চাকরি খেতে চাইছ?

সেই বাতানুকূল কামরার মধ্যেই মান্যবর সেক্রেটারী তখন দরদর করে ঘামছেন। মুখখানা শাদা হয়ে গেছে। ফাইলটা ফিরিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় ডাঃ রায় বললেন—যাও, তোমায় সুপারিশ আমি নাকচ করে দিলাম।

সেক্রেটারী সাহেব তখন ফাইলটা নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন!

২৩

সংগীতশিল্পীর কাজ শুধু গান গাওয়াই নয়, গান শোনানোও বটে। আর, সেই গান শোনানোর আয়োজনটা যদি প্রকৃত সমঝদার ও রসজ্ঞের সামনে ঘটে, শ্রোতার মতো শ্রোতা যদি পাওয়া যায় তবেই শিল্পীর পরিতৃপ্তি পূর্ণতার আস্বাদন পায়। কবি বলেছেন—'একজন গাবে ছাড়িয়া গলা, আর জন গাবে মনে'। মনে গাইতে পারে এমন জন-সমাবেশ যখন ঘটে, তখনই শিল্পীর আনন্দ-বেদনা সার্থকতা লাভ করে।

আমার জীবনে যে শ্রোতৃকুলকে গান শোনাবার সুযোগ আমি পেয়েছি, তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী। বেতারে সংগীত-পরিবেশন ও সংগীত-শিক্ষার আসরের মাধ্যমে এবং চলচ্চিত্রের ও ডিস্‌ক্‌ রেকর্ডের মাধ্যমে গান শুনিয়েছি সংগীত প্রিয় বাঙালীকে। প্রতিদানে অর্ধশতাব্দী ধরে তাঁদের প্রীতি আমার ক্ষুদ্র জীবনকে মহিমান্বিত করেছে।

এই বাংলাদেশে বা কলকাতা শহরের বুকেই আমার জীবনের সবুজ দিনগুলিতে যে কত অনুষ্ঠানে, কত জনসমাবেশে গান গেয়েছি, তার হিসাব তো রাখিনি, কিন্তু সংখ্যায় তারা বহু। বাঙালীসমাজ আজও হয়তো সেসব কথা স্মরণে রেখেছেন। সেদিন যা দিতে পারতাম, আজ তা পারিনা দিতে। কণ্ঠ অপারগ, মনে পড়ে যায়—

'আজ এনে দিলে, হয়তো দিবে না কাল
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল…'

কিন্তু, তার পরক্ষণেই নিজেকে খুঁজে পাই, মনে ভাবি, ওই একই গানে কবি তো আরও বলেছেন—

'এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতি-স্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী
বহি তব সম্মান

আমার সে যুগের দরদী শ্রোতাদের বিস্মরণের স্রোত বেয়ে আমার গানের স্মৃতি তাঁদেরই সম্মান বহন করে হয়তো বা আনে আজও, আমি তাই বিনতির সঙ্গে তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই!

বাঙালীসমাজ আমায় ভালবেসেছিলেন, এই স্মৃতি আমায় পুলক দেয়। কিন্তু বাংলার সীমান্তগর্ত এই প্রীতি একদিন ভারত ও তার বাইরেও কিছুটা প্রসারিত হয়েছিল, সেই কথা রোমন্থন করার আজ বাসনা জাগছে।

রবীন্দ্রনাথের গান ও বিভিন্ন কবির রচিত বাংলা গানের পাশাপাশি হিন্দী গীত, গজল, ভজন ইত্যাদি গেয়ে বহির্বঙ্গে তখন আমি সুপরিচিত হয়ে গেছি। রবীন্দ্রনাথের গান হিন্দী এবং অন্যান্য কিছু কিছু ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে গেয়ে অবাঙালী সমাজকে আনন্দ প্রদান করতে পেরেছি। নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী ছবিগুলির মাধ্যমে কণ্ঠশিল্পী হিসাবে আমি ও কুন্দনলাল তখন সর্বভারতীয় জনপ্রিয় শিল্পী হিসাবে আদৃত। তাছাড়া সঙ্গীত পরিচালক ও সুরকার হিসাবে আমার অন্য একটা পরিচিতি তো ছিলই।

এই সময়ে একদিন, ১৯৩৩ সালে, মহীশূর রাজপ্রাসাদে দশেরা উৎসব উপলক্ষে মহীশূর রাজ কর্তৃক আমি হিন্দী সংগীত পরিবেশন করার জন্য আমন্ত্রিত হই। সে আমন্ত্রণ, বলা বাহুল্য, পরমানন্দে শিরোধার্য করে আমি মহীশূর গিয়েছিলাম। আমার দুই ভ্রাতা (পরলোকগত অম্বুজকুমার মল্লিক ও শ্রী অব্জকুমার মল্লিক) এবং দশ বারোজন সহযোগী যন্ত্রশিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে। প্রসঙ্গত বলে রাখি আমার এই মহীশূর ভ্রমণে ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগীত পরিক্রমায় আমার তবলাবাদক ছিলেন অবনী রায়চৌধুরী মহাশয়। তাঁর তবলা সংগত আমার কণ্ঠসংগীতের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। তাঁর নিপুণ ও সুমিষ্ট হাতের বাদন আমার কণ্ঠসংগীতকে অবশ্যই অলঙ্কৃত করেছিল, একথা আমার আজ বিশেষ ভাবে মনে পড়ে।

এই সাংগীতিক সফরের একটি বিশেষ ঘটনা আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

মহীশূরে বৃন্দাবন গার্ডেনস্ নামক একটি বিশ্ববিখ্যাত মনোরম উদ্যান আছে। সমগ্র ভারতে মনুষ্যসৃষ্ট এমন অপরূপ নন্দনকানন আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। মহীশূর রাজপ্রাসাদের নিকট একটি মনোরম আবাসে আমরা অতিথি হয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছে সেদিনই রাত্রে আমরা

বৃন্দাবন গার্ডেনস্ দেখার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মোটরযানে করে রাজ-প্রাসাদ থেকে উদ্যানে পৌঁছেছিলাম আমরা অনেক বিলম্বে। বস্তুত, রওনা দিতেই আমাদের দেরি হয়েছিল। আমরা পৌঁছালাম যখন, তখন রাত পৌনে দশটা পার হয়ে গেছে। এই উদ্যানে সন্ধ্যাবেলায় যেটা দর্শনীয় ও পরম উপভোগ্য বস্তু তা হচ্ছে এর সায়ংকালীন আলোক-সজ্জা। বহুবর্ণরঞ্জিত বিদ্যুৎমালায় উদ্ভাসিত হয়ে এই উদ্যান এক অপার্থিব সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল রচনা করে। প্রত্যহ সূর্যাস্ত থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এই আলোকসজ্জার নির্ধারিত সময়-সীমা।

আমরা সেদিন গাড়ি থেকে নেমে যে মুহূর্তে উদ্যানের প্রবেশদ্বারে পদার্পণ করতে যাচ্ছি, তৎক্ষণাৎ আলোকমালা নির্বাপিত হলো। আমরা গভীর হতাশায় পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলাম। যে ভদ্রলোক আমাদের রাজপ্রাসাদ থেকে উদ্যানে নিয়ে এসেছিলেন. তিনি অবিলম্বে কাকে যেন টেলিফোন করলেন এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঐ উদ্যানের সমস্ত তরুলতা কাননবীথি, পুষ্পসম্ভার ও ভাস্কর্যমালা বিচিত্র বর্ণালীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল! অদৃষ্টের কী প্রসন্নতা! ভদ্রলোকটি এবং উদ্যানেরই একজন গাইড উভয়ে তখন আমাদের সঙ্গে নিয়ে নিপুণ প্রযত্নে উদ্যানটির যাবতীয় সম্ভার ও আয়োজন দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিলেন। আমাদের নয়ন-মন সার্থক হলো। অমরাবতী-দর্শনের পরমানন্দ লাভ করলাম সেদিন।

পরে শুনেছিলাম যে মহীশূর রাজ্যের মহামান্য দেওয়ানজী মহাশয়ের আদেশেই এই নিয়ম-বহির্ভূত. বিশেষ দীপান্বিতা ঘটানো হয়েছিল সেই রাত্রে, দশটার পরেও। শুনেছিলাম, দেওয়ানজী আমার মতো ক্ষুদ্র এক সংগীত-সেবীর সম্মানার্থে এই আদেশ দিয়েছিলেন। শুনে গর্ব অনুভব করেছিলাম, স্মৃতিটুকুও গর্বের সঙ্গেই লালন করে আসছি, একথা সলজ্জ ভাবে প্রকাশ করছি। পাঠক আমায় মার্জনা করবেন, আমি ক্ষুদ্র বলেই এই গৌরবের প্রকাশ। বস্তুত, মহীশূর রাজপ্রাসাদ আমাকে এই সম্মান দেখিয়ে যে রাজকীয় সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার মহিমা আমার ব্যক্তিগত গর্বের চাইতে অনেক বেশি।

সেবার মহীশূর রাজপ্রাসাদের সংগীতানুষ্ঠানে বহু গান গেয়ে শুনিয়ে-ছিলাম। তা ছাড়া, বাঙ্গালোর শহরে একটি সুবিশাল ও প্রশস্ত প্রেক্ষাগৃহে একক শিল্পী হিসাবে আমি সংগীত পরিবেশনও করেছিলাম। সেই উপলক্ষে মহীশূর-

রাজপ্রদত্ত একটি চন্দনকাষ্ঠের সুদৃশ্য ক্ষুদ্রাকৃতি সৌধ (কাঁচের আধারে) আজও আমার অন্যতম সঞ্চয় হিসাবে রক্ষা করে রেখেছি।

১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ এই সুদীর্ঘ সতের বছর ছিল আমার ভারত পরিভ্রমণের সুবর্ণময় যুগ। একক কণ্ঠশিল্পী হিসাবে আমি তখন দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ব্যাপক ভাবে পরিভ্রমণ করেছি বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে ও পূর্ব-আয়োজন অনুসারে। লোকরঞ্জন শাখার প্রধান হিসাবে বাংলার বাইরে, বিশেষত দিল্লীতে, যে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছি, সে কথা স্থানান্তরে বলেছি। বর্তমান বিষয় হচ্ছে একক কণ্ঠসংগীত শিল্পী হিসাবে আমার ভারত পরিভ্রমণ। অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যে আমার এই পরিভ্রমণের সুযোগ অনেক বার ঘটেছিল।

আজকাল, অর্থাৎ আমার বা আমার সমসাময়িকদের পরবর্তীকালে, একক সংগীত-অনুষ্ঠানের খুবই প্রচলন হয়েছে, দেখতে পাই। এই কলকাতা শহরেই বিভিন্ন ধরণের গানের বিশিষ্ট শিল্পীরা একক সংগীত-অনুষ্ঠান প্রায়শই করে থাকেন। ঠিক এই ধরণের প্রথার প্রচলন আমরা আমাদের শিল্পীজীবনের প্রারম্ভিক কালে অথবা মধ্যপর্বেও বড়ো একটা দেখিনি। তবে আমার শিল্পী জীবনের শেষ পর্বে, অর্থাৎ যে সময়ের কথা এখন বলছি, এই ধরণের একক অনুষ্ঠানের প্রথার সূত্রপাত ঘটে এবং আমার জীবনেই তা প্রথম এসেছিল এই সফরগুলির মাধ্যমে। কলকাতায় বা বাংলায় নয়, উল্লেখিত প্রদেশগুলিতে। বোম্বাই, নাগপুর, গুজরাটের বিভিন্ন স্থানে এবং উপরোক্ত অন্যান্য প্রত্যেক রাজ্যে আড়াই তিন ঘন্টাব্যাপী একক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন উদ্যোক্তারা। মাঝে দশ/পনের মিনিটের বিরাম। বিচিত্র আনন্দ-ঘন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতাম সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে! সর্বত্রই অতি সভ্য ও শিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দকে গান শোনাবার সুযোগ ঘটেছে। গানের মাঝেই তাঁরা ছোট ছোট চিরকুটে হিন্দী বা ইংরেজিতে বিভিন্ন অনুরোধ মঞ্চের উপর পাঠিয়ে দিতেন, আমি যথাসাধ্য তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করার প্রয়াস পেতাম। অধিকন্তু তাঁদের অনুরোধ আসতো রবীন্দ্রসংগীতের বিষয়ে। ইংরেজি বা হিন্দীতে অনূদিত (অথবা কদাচিৎ অন্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত) রবীন্দ্রসংগীত তো তাঁদের শোনাতে হতোই, উপরন্তু, বিস্ময়ের কথা, তাঁরা বার বার মূল বাংলায় মহাকবির সংগীতসুধা শ্রবণ করে ধন্য হতে চাইতেন। আমি ইংরেজিতে

যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা বা ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে মূল বাংলায় সঙ্গীতটি পরিবেশন করতাম। কাব্যের বা গীতিকাব্যের এমন কি সাহিত্যের কোনো বিভাগেই, অনুবাদ কখনোই মূল রসটিকে বহন করে আনতে পারে না, একথার মর্ম তখন বুঝতাম। বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দ বুঝতেন যে তাঁদের জানা কোনো ভাষায় অনুবাদিত হয়ে সঙ্গীতটি তাঁদের কাছে পরিবেশন করা হলেও তাঁরা আসল রস থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই বাংলায় শুনতে চাইতেন তাঁরা, বাংলা বুঝুন বা না-ই বুঝুন, তবু তো তা মূল ভাষা—যা সোজাসুজি মহা-গীতিকারের লেখনী থেকে বেরিয়েছে! না বুঝলেও সে ভাষার অনুরণনটুকুই হয়তো তাঁদের শ্রবণকে পুণ্য ও ধন্য করতো, রসভোক্তা হিসাবে তাঁরা সান্ত্বনা পেতেন এই ভেবে যে 'মূল' শ্রবণের সুযোগ তাঁরা পাচ্ছেন। আমি বুঝতাম, ভাষা, যদি তা মহাকবির লেখনী-নিঃসৃত হয়, জানা অজানার বিভাজন-রেখাকে অতিক্রম করে যাবার ক্ষমতা রাখে, তার ধ্বনিসম্পদই তাকে অর্থবহ করে তোলে।...

কেউ কেউ বেশ মজার প্রশ্ন করতেন। বলতেন আচ্ছা কবিগুরু কি মূল হিন্দী ভাষায় বা মূল ইংরেজি ভাষায় কোনো গান রচনা করেননি?

আমি বলতাম—আমি যতদূর জানি, করেননি। অতঃপর কিঞ্চিৎ মুদ্রা ব্যবহার করে ও ইংরেজিতে সামান্য ভূমিকা রচনা করে মূল বাংলায় গেয়ে উঠতাম। নিবিষ্ট হয়ে তাঁরা শুনতেন, ঘন ঘন উচ্ছ্বসিত করতালিতে আমার গৌরববর্ধন করতেন। বিশ্বকবির দীন প্রচারক আমি ধন্য হয়ে যেতাম।

ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ বিষয়ে বলতে গিয়ে বিশেষ করে মনে পড়ে যে বোম্বাই শহরে বহুবার ব্যাপক আকারে একক অনুষ্ঠান করার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাছাড়া সমগ্র গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে যে গভীর শ্রদ্ধা ও নিবিড় প্রীতি আমি পেয়েছি তা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। আমার বহু গুজরাটী বন্ধু আজো আমার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে থাকেন, কুশল বিনিময় করেন এবং আমার গৃহে পদার্পণ করেন।

এই প্রসঙ্গে আমার শ্রীবিরিঞ্চিভাই ত্রিবেদীর নাম উল্লেখ করতে বিশেষভাবে ইচ্ছা হয। এঁ'র প্রীতি ও সহৃদয়তা আমাকে এঁ'র সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সৌহার্দ্যের বন্ধনে বেঁধে রেখেছে!

আর একজনকে মনে পড়ে, তিনি শ্রীবসন্তভাই পারিখ। এঁ'র সঙ্গে আমার

পরিচয় যে ভাবে হয়েছিল, তা মনে পড়লে পরমানন্দ লাভ করি। কৃতজ্ঞতা-বোধও আমায় আপ্লুত করে দেয়। একবার আমি বোম্বাই শহরে একটি হোটেলে অবস্থান করছিলাম। বসন্তভাই তখন কী কারণে যেন ওই হোটেলে এসেছিলেন। আমায় দেখে চিনতে পেরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। কথা বলতে গিয়ে তিনি লক্ষ করেছিলেন যে আমার শ্রবণশক্তি তখন বেশ কমে গেছে। প্রকৃতপক্ষে আমার একটি কান তখন বেশ দুর্বল হতে আরম্ভ করেছে। তিনি আলাপান্তে জানতে চাইলেন, কানের চিকিৎসা আমি করিয়েছি কিনা। এই ভাবেই সেদিনের পরিচয় শেষ হয়েছিল।

এর কয়েক মাস পরেই আমার কাছে এক বিস্ময় এসে উপস্থিত! হঠাৎ একদিন সুইজারল্যাণ্ড থেকে এক পার্শেল এল, তার ভিতরে দামী ও সর্বাধুনিক একটি 'হিয়ারিং এড্'। উপহারটি সেই দেশ থেকে পাঠিয়েছেন যিনি, তাঁর নাম 'বসন্তভাই পারিখ'!

২৪

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ গানের হিন্দী অনুবাদ করার আবশ্যকতা আমি অনেকদিন ধরেই অনুভব করেছিলাম। খুবই প্রসন্ন ছিল আমার ভাগ্য, এই ধরণের ভাবনা যখন আমায় পেয়ে বসেছে, সেই সময়ে একদিন কলকাতায় আকাশবাণী ভবনে প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি শ্রীহংসকুমার তেওয়ারী মহাশয় আমাকে তাঁর স্বকৃত একটি পুস্তক উপহার দিলেন। গ্রন্থটি বিশ্বকবির 'গীতাঞ্জলি'র হিন্দী অনুবাদ। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে তা গ্রহণ করেই, দেরি না করে, তাঁর কলকাতায় অবস্থানের সময়টুকুর সুযোগ নিয়ে, তাঁকে দিয়ে কবির আরো বেশ কয়েকটি গানের সুষ্ঠু অনুবাদ করিয়ে নিলাম। (এই তেওয়ারী মহাশয় পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার জন্য শ্রীমন্মথ রায় রচিত 'মহাভারতী' নাটকের হিন্দী অনুবাদ করেন এবং লোকরঞ্জনের জন্য আরও কয়েকটি নাটক অনুবাদ করে দিয়েছিলেন)।

নিউ থিয়েটার্স কর্তৃক 'চিত্রাঙ্গদা' চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় কবি 'উদয়' (শ্রীউদয় খান্না) চিত্রনাট্যের লেখক এবং গীতিকাররূপে এসেছিলেন। আমি ছিলাম সঙ্গীত পরিচালক, ফলে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমার অনুরোধে তিনি রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গীতরচনার হিন্দী অনুবাদ করেছেন। (তিনি লোকরঞ্জনের জন্যও দুখানি নৃত্যনাট্যের হিন্দী অনুবাদ করেছেন)। দক্ষিণ ভারত, গুজরাট, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে সঙ্গীতানুষ্ঠানকালে আমি তেওয়ারী মহাশয় ও 'উদয়'-এর অনুবাদগুলির থেকেই হিন্দীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছিলাম।

১৯৫৩ সালে বিশ্বকবির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বোম্বাই শহরে ভারতীয় বিদ্যাভবনের সুযোগ্য প্রতিনিধিদ্বয়—সুগায়ক শ্রীমান অজিত শেঠ এবং তাঁর সহধর্মিণী সুগায়িকা শ্রীমতী নিরুপমা শেঠ 'গীতবিতান' থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের বেশ কিছু গান সঙ্কলিত করে হিন্দী অনুবাদের জন্য আয়োজন-উদ্যোগ করেছিলেন এবং সেই উদ্যোগে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য আমাকে এবং কয়েকজন প্রথিতযশা হিন্দী কবিকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমরা সকলেই

আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলাম এবং সেই উদ্যোগে একটি সার্থক সংকলন রচনা করা হয়েছিল, হিন্দী অনুবাদসহ।

অতঃপর একদিন ভারতীয় বিদ্যাভবনের আয়োজনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংগ হিসাবে বহু গুণিজনসমাবেশে রবীন্দ্রনাথের ঐ সঙ্কলিত গানগুলি মূল বাংলায় ও অনুবাদকৃত হিন্দীতে পরিবেশন করেছিলাম। ভারতীয় বিদ্যাভবনের কলাকেন্দ্র, সুগম সংগীত ইউনিট ও টেগোর সোসাইটি তাঁদের যুক্ত উদ্যোগে এই উপলক্ষে আমার সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের প্রদত্ত সম্মানের যোগ্যতা আমার ছিল না, সুতরাং অভিভূত হয়েছিলাম। এজন্য সাধারণভাবে তাঁদের কাছে, এবং বিশেষভাবে শ্রীমান্ অজিত ও শ্রীমতী নিরুপমা শেঠের কাছে, আমি কৃতজ্ঞ।

রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত গান সেই উদ্যোগে হিন্দীতে অনূদিত হয়েছিল, সেগুলি, অন্যান্য আরও কিছু কিছু বিষয়ের সংগে, উক্ত পুস্তিকাতে সংগ্রথিত হয়েছিল। গানগুলি—

শ্রীহংসকুমার তেওয়ারী কর্তৃক অনূদিত— 'হে মোর দেবতা', 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে', 'কেন আমায় পাগল করে যাস', 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী', 'নাই নাই ভয়', 'এসো হে বৈশাখ' 'এসো শ্যামল সুন্দর', 'আজি বারি ঝরে ঝর ঝর', 'সঘন গহন রাত্রি', 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার', 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' এবং 'রোদনভরা এ বসন্ত'।

শ্রীউদয় খান্না কর্তৃক অনূদিত—'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী', 'আমার মিলন লাগি,' 'লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি,' 'আর রেখো না আঁধারে আমায়' এবং 'নিবিড় ঘন আঁধারে'।

পণ্ডিত ভূষণ অনূদিত—'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়,' 'মনে রবে কি না রবে আমারে'।

শ্রীভরতভূষণ আগরওয়ালা অনূদিত—'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ'।

শ্রীসত্য রায় অনূদিত—'খর বায়ু বয় বেগে'।

এছাড়া ছিল বাণীকুমার কর্তৃক সংস্কৃতে রচিত ও মৎকর্তৃক সুরারোপিত কবি প্রশস্তি ও কবি প্রণাম।

বহির্ভারতের নানা স্থান থেকে বারবার সংগীত পরিবেশনের আমন্ত্রণ আমি পেয়েছিলাম। আমাদের যুগে অবশ্য একালকার মতো এতো আমন্ত্রণের ঘটা বা

জানিয়েছিলেন। বস্তুত, বেতারের জন্মক্ষণ থেকে যাঁরা বেতারের সংগে জড়িত তাঁরাই এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। আমি এই অনুষ্ঠানে বলেছিলাম—'A short account of my experience with A. I. R. since its incepton in Calcutta in 1927'।

* * *

১৯৫৭ সালের ৫ আগষ্ট তারিখে ভাগলপুর শহরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সংগীত বিষয়ে ভাষণ দেবার জন্য আবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। আমন্ত্রণ এসেছিল বনফুল বা স্বনামখ্যাত শ্রদ্ধেয় বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। সেবারে মূল সভাপতি ছিলেন প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। কলকাতা থেকে বলাইদার আহ্বানে তাঁরই গৃহে আতিথ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি ও তারাশঙ্করবাবু একই ট্রেণে রওনা হয়েছিলাম। পূর্ব পরিচয় থাকলেও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ আমরা এই প্রথম পেয়েছিলাম। শরৎচন্দ্রোত্তর বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল তারাশঙ্করকে সেই থেকে সুহৃদরূপে পেয়েছিলাম।

আর বলাইদার কথা কী আর বলব? তাঁর আবাসে আমরা যেমন যত্ন পেয়েছি, তেমন আন্তরিকতা। বলাইদা ও বউদি হয়তো নিজেদের সৌজন্যের কথা ভুলে বসে আছেন, আমি কিন্তু ভুলিনি। বউদির পাক-প্রণালীর যে কতো বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা—সাদা মাটা বাঙালী গৃহস্থালীর নিরামিষ রন্ধন থেকে সুরু করে মোগলাই ও পশ্চিম ভারতীয় রাজসিক রন্ধনের কারিগরী—সেই রসনাবিনোদনের অপর সাক্ষীটি অর্থাৎ বলাইদার সতীর্থ তারাশঙ্কর আজ আর নেই। থাকলে অন্তত তিনি আমার সপক্ষে দুটো কথা বলতে পারতেন। কারণ, আমার ভয় হয়, বলাইদা ও বউদি তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের বশে আমার এই উক্তিকে অতিরঞ্জনদোষদুষ্ট বলে প্রতিবাদ করতে পারেন।

সেই কয়েকটা দিন কেবল অতিশয় পরিপাটি ভোজনেই কাটেনি, অতিভোজনেও ভারাক্রান্ত হয়েছে। বউদি কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত হননি। কলকাতায় ফেরার সময় তিনি কৌটো ভর্তি করে অপূর্ব সুস্বাদু, রসনা ও বাসনা-রুচিকর বড়া ও নানা ধরণের স্বহস্ত প্রস্তুত মিষ্টান্ন দিয়ে দিয়েছিলেন। তারাশঙ্করবাবু ও আমি ডাউন ট্রেণে সর্বক্ষণই সেগুলির সদ্গতি করেছিলাম। এর ফলে চলন্ত ট্রেনে আমাদের সাহিত্য ও সংগীত আলোচনায় আগ্রহ যে প্রচুর পরিমাণে উবে গিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না!

সে যাই হোক, ভাগলপুরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে আমার ভাষণের বিষয় ছিল—'সঙ্গীতের আত্মিক ও ব্যবহারিক রূপ'। বন্ধুবর তারাশঙ্কর এইটি শোনার পর আমার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ও ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন।

বলাইদার প্রসঙ্গে একটা অন্য কথা মনে পড়ে গেল। এক সময়ে তাঁর লেখা একটি গানে সুর দিয়ে গেয়েছিলাম। শরৎচন্দ্রের ৯৬ তম জন্মদিবস উপলক্ষে রচিত তাঁর গানটির সুরু ছিল—

শরতের নীলাকাশে হে পূর্ণ চাঁদ—
পড়িয়াছে মনোমাঝে কী মোহিনী ফাঁদ!

এছাড়া বলাইদার রচিত বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্যাসাগর প্রণাম'-এ ('কচু আর ঘেঁচুবন আছিল যেথায়') সুরারোপ করে গেয়েছি এক সময়ে।

ছোট ছোট আরও দু'একটি ঘটনা এই উপলক্ষে স্মরণ করে আনন্দ পাই। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময়, মনে পড়ে, একবার তেল্লিচেরি থেকে অন্য এক স্থানে যাচ্ছিলাম। রাত্রে তেল্লিচেরিতেই অবস্থান করেছি, পরদিন সকালে উঠে প্রস্তুত হয়ে সদলে স্টেশনে গিয়েছি। ট্রেণ সশব্দে এসে যেতেই খেয়াল হল যে আর সবই এসেছে, কিন্তু আমার হারমোনিয়মটিই হোটেলে ফেলে এসেছি। স্টেশন মাস্টার মহাশয়কে সে কথা জানাতে এবং পরিচয় দিতেই তিনি বললেন—'কেউ একজন এখুনি গিয়ে ওটা নিয়ে আসুন। ট্রেণ দাঁড় করিয়ে রেখে দেব।'

আমাদের মধ্যে একজন তাড়াহুড়ো করে দৌড়ালেন হারমোনিয়াম আনতে। তিনি পড়ি-কি-মরি করে ছুটলেন এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরে এলেন হারমোনিয়াম নিয়ে। হলে 'হবে কি, তার মধ্যেই অতিরিক্ত প্রায় কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। স্টেশন মাস্টার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে তখনো ট্রেণ দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। আমরা দলবল মিলে ওঠার পর তবে ট্রেণ ছাড়ল। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে স্টেশন মাষ্টার মহাশয় যে সৌজন্য ও সহযোগিতা করেছিলেন সেদিন, তার কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না।

আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। যতদূর স্মরণ করতে পারি, সেটা পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি। নাগপুরে গেছি তখন এক সংগীতানুষ্ঠানে, শিল্পী হিসাবে। আমি ছাড়া সেখানে উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন পরম প্রীতি-ভাজন শিল্পী-প্রবর অনুজপ্রতিম শ্রীযুক্ত মুকেশ এবং প্রতিভাময়ী কণ্ঠশিল্পী কল্যাণীয়া শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকার। শ্রীমতী লতা তখন তাঁর 'হিট্' গান 'আয়েগা, আয়েগা'-এর জন্য ভারতবিখ্যাত হয়ে গেছেন। মুকেশও তখন প্রতিভায় মুখর।

যাই হোক, সেই সন্ধ্যায় উদ্যোক্তারা প্রবল ভীড় ও উচ্ছ্বাস সামাল দিতে পারেন নি। শীঘ্রই প্রচণ্ড কোলাহল ধাক্কাধাক্কি, কমলালেবু নিক্ষেপ প্রভৃতি নানান্ অশালীন আচরণ সুরু হয়ে গেল। সেই জনতরঙ্গকে ঠেকাবার মতো আয়োজন উদ্যোক্তাদের ছিল না, পুলিশও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। আমার

স্ত্রী-কন্যা প্রভৃতি দর্শকের আসন থেকে উঠে বেরিয়ে গিয়ে কোনমতে নিরাপত্তা রক্ষা করেছিলেন।

যাই হোক, এ-হেন অবস্থায় আমি আমার কণ্ঠ দিয়ে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে চেষ্টা করেছিলাম। আমার প্রাণের সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়ে গান সুরু করে দিয়েছিলাম। তাতে বেশ ফল হয়েছিল, মনে পড়ে।

কিন্তু এই প্রচণ্ড কোলাহলে যথেষ্ট ক্ষতি আগেই হয়ে গিয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে জানতে পেরেছিলাম বহু নারী-পুরুষ ভীড়ের চাপে আহত হয়েছেন, অনেককেই হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে।

পরদিন সকালে স্ত্রী-কন্যা সমভিব্যাহারে ফল-মিষ্টান্ন হাতে নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে সেই সব আহত অনুরক্ত শ্রোতাদের প্রত্যেকের সংগে দেখা করি ও শুভকামনা জানাই। তাঁদের বিষণ্ন মুখচ্ছবি আজো আমার স্মৃতিতে আঁকা রয়েছে। মনে পড়ে আমি তাঁদের কাছে যেতেই করুণ মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেবারের অনুষ্ঠানে এইটেই ছিল আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

নাগপুরের এই অনুষ্ঠানের পর শ্রীমতী লতা আমাকে একটি আবেগময় পত্র লিখে তাঁর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন। সংগীতক্ষেত্রে অগ্রজ হিসাবে তাঁর ও তাঁর সহোদরা, অসাধারণ কণ্ঠশক্তির অধিকারিণী শ্রীমতী আশা ভোসলের সংস্পর্শে এসেছি অনেকবার। প্রতিভা ও বিনয়গুণে দুজনেই আজ সুউচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিতা। অগ্রজ হিসবে আমি তাঁদের চির আশীর্বাদক।

সেই অনুষ্ঠানে অপর শিল্পী, আমার স্নেহভাজন অনুজপ্রতিম 'মুকেশ' আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। অকালপ্রয়াত তিনি, কিছুদিন আগে বিদেশে ভ্রমণরত অবস্থায় পরলোকগমন করেছেন। তাঁর কণ্ঠপ্রতিভা ছিল দেব-দত্ত। তাঁর সংগে আমার ছিল নিবিড় প্রীতি ও শ্রদ্ধার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। তাঁর মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগেও তাঁর কাছ থেকে প্রীতি-সিক্ত ও আনন্দদায়ী এক সুন্দর চিঠি পেয়েছিলাম। সংবাদপত্রে তাঁর চির-বিদায়ের খবর পড়ে যে কী মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলাম তা আমি জানি। তাঁর বিখ্যাত একটি গানের প্রথম কলিটি বার বার মনে পড়ছিল—'দিল্ জ্বল্তা হৈ তো জ্বল্নে দো…'

* * * *

১৯৫৩ সালে নেপাল-রাজপরিবারের আমন্ত্রণে নেপাল পরিভ্রমণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তদানীন্তন নেপাল-রাজ (রাজা মহেন্দ্র) কাব্য ও সংগীতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজে হিন্দীতেও সুকবি ছিলেন। একদিন সংগীতানুষ্ঠানের মধ্যেই তিনি তাঁর একটি হিন্দী গীত-রচনা আমার হাতে দেন ও সুরারোপ করে গাইতে অনুরোধ করেন। আমি তৎক্ষণাৎ সেইখানে বসেই সুরসংযোজনা করে সেটি সংগীত হিসাবে পরিবেশন করি। এতে তিনি যারপরনাই পুলকিত হন। নেপাল ভ্রমণের এই একটি ঘটনা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে। রাজ-অতিথি হিসাবে যে সৌজন্য ও সমাদর লাভ করেছিলাম তাও ভুলতে পারি না।

কিন্তু সেকথা থাক। আজ এই প্রসঙ্গে ১৯৫৩ সালের বাংলাদেশ ভ্রমণের কথা গভীর বেদনার সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আমন্ত্রণে আমরা কয়েকজন সংগীতশিল্পী বাংলাদেশ গিয়েছিলাম। বাংলাদেশে তখন মুক্তির জয়োল্লাস শত-তরঙ্গভঙ্গেউচ্ছ্বসিত। ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গেও তার জোয়ার এসে লেগেছে। 'আমার সোনার বাংলা', 'বাংলার মাটি বাংলার জল' প্রভৃতি গানে তখন 'আকাশ গেল পুরে'। সেই সময়ে স্বাধীন বাংলা দেশে আমরা কয়েকজন আমন্ত্রিত শিল্পী হিসাবে গিয়েছিলাম সাংস্কৃতিক পুনর্মিলনে অংশ গ্রহণ করতে।

আমাদের এই ভ্রমণ ছিল বড় আনন্দের, বড় আবেগের। কিন্তু কী পরিহাস এই অদৃষ্টের! আজ সেই আনন্দময় পরিভ্রমণের স্মৃতি বেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতিবিদ্ হিসাবে মুজিব কত বড়, তাঁর নায়কত্বের দোষগুণ কী —এসব ব্যাপার বিচার করবেন ঐতিহাসিক-রাজনীতিবেত্তা-সাংবাদিকরা। আমি কিন্তু দেখেছিলাম এক প্রাণখোলা, উদার ও উদাত্ত প্রকৃতির মানুষকে— যে মানুষটি ছিলেন যথার্থই বঙ্গভাষা, সাহিত্য ও সংগীতপ্রেমী। আমি ও ভ্রমণরত অন্যান্য রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরা (শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়) তাঁকে গান শুনিয়েছি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও গেয়েছি। তাঁর সঙ্গে অনেক গল্প করেছি। প্রীতির উত্তাপ দিয়ে মানুষকে কাছে টেনে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ,

সুরসিক অথচ দুঃসাহসিক বাঙালী। আমার মতো বহু মানুষের মনেই আজ তাঁর স্মৃতি শোকে ম্লান হয়ে আছে। নির্মম রাজনৈতিক বর্বরতায় তিনি প্রায় সপরিবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন এ সংবাদ যখন পেলাম তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি।

মুজিবকে আমি আমার সুরাশ্রিত কবিগুরুর দুটি রচনা গেয়ে টেপ্ করে উপহার রূপে প্রদান করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। সে দুটি ছিল— 'ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে' এবং 'রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে দুয়ার ভেদিয়া'। জানতাম এ দুটিই বিদ্রোহী নেতা মুজিবের অত্যন্ত প্রিয়। মুজিব আবেগের সঙ্গে সেই টেপ্ গ্রহণ করেছিলেন।

এর কিছুদিন আগে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কলকাতায় ডাঃ মুরারি মুখোপাধ্যায় প্রমুখের উদ্যোগে বাংলাদেশের জন্য টাকা তোলার উদ্দেশ্যে পি, জি, হাসপাতালে, রবীন্দ্রসদনে ও শ্রীশিক্ষায়তন হল্-এ চ্যারিটি অনুষ্ঠানের যে আয়োজন হয় তাতে কণ্ঠশিল্পী ছিলাম আমি। এভাবে যে টাকা উঠেছিল তা মুক্তিকামী বাংলাদেশকে পাঠানো হয়েছিল। মুজিব সে কথা জানতেন। তিনি নিজের থেকেই আবেগাপ্লুত কণ্ঠে একথার উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন।

তাঁর মতো ব্যক্তিত্বময় পুরুষের সান্নিধ্যে আসতে পেরে সুগভীর আনন্দ লাভ করেছিলাম। আজ সেই আনন্দ বিষাদমিশ্রিত হয়ে অন্তরে এক বিচিত্র বেদনাময় পুলকের সৃষ্টি করে।

২৬

সিনেমা সংগীতে প্লে-ব্যাক পদ্ধতির জন্মবৃত্তান্ত আগেই আমি বলেছি। এই প্রসঙ্গে বলি, আমার নিজের সংগীত পরিচালনার ক্ষেত্রে আমার প্রিয় ও নির্ভরযোগ্য প্লে-ব্যাক গায়ক-গায়িকা অনেকেই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক-জনের নাম করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় শ্রীমতী সুপ্রভা ঘোষ (সরকার) ও শ্রীমতী পারুল চৌধুরী (ঘোষ) প্রমুখের কথা। পরবর্তী যুগের শ্রীমতী শৈল দেবী, শ্রীমতী ইলা ঘোষ (মিত্র), শ্রীমতী সুধা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী উৎপলা সেন, শ্রীতরুণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীদের নিয়ে সিনেমায় প্লে-ব্যাক-এর কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। শ্রীমতী পারুল চৌধুরীর কথায় মনে পড়ে গেল সংগীতযন্ত্রী পান্নালাল ঘোষের কথা। আমার অনুজপ্রতিম এই বন্ধুটিই পরবর্তী কালের ভারতবিখ্যাত বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষ। প্রথম যুগের প্লে-ব্যাক শিল্পী শ্রীমতী পারুল চৌধুরী এঁরই সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' অবলম্বনে হিন্দী চিত্র 'জলজলা'য় ('জার্মান পরিচালক পল্ জিল্স্-এর ছবি) সংগীত পরিচালক ছিলাম আমি। সুকণ্ঠী গায়িকা শ্রীমতী গীতা রায় (পরবর্তী কালে গীতা দত্ত, অভিনেতা ও ফিল্ম্ প্রযোজক গুরু দত্তের সহধর্মিনী) সেই ফিল্মে কিছু প্লে-ব্যাক করেছিল। শ্রীমতী গীতার সুমধুর কণ্ঠস্বর আজও যখন শুনি, তার অকালমৃত্যুর বেদনা আমাকে অধীর করে তোলে। আগেই বলেছি, 'জল্জলা'র গানগুলি শিখে নেবার জন্য সে দিনের পর দিন আমার বাসভবনে এসেছে, আমিও তাকে শিখিয়ে গভীর আনন্দ লাভ করেছি।

প্লে-ব্যাক পদ্ধতির প্রসঙ্গে স্বভাবতই ডাবিং-এর কথা মনে পড়ে। আর, ডাবিং-এর প্রসঙ্গে বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালক সুবোধ মিত্র মহাশয়ের উল্লেখ সর্বাগ্রে করতে হয়। সে যুগের জনপ্রিয় বাংলা ছবি (ফণী মজুমদার পরিচালিত) 'ডাক্তার'-এর হিন্দী রূপান্তরেরতিনিই ছিলেন পরিচালক। মিত্তিরমশাই একটি

বিশেষ নামে সিনেমামহলে পরিচিত ছিলেন—তাঁকে সকলে 'কচিবাবু' বলে ডাকতেন।

অভিনেতা হিসাবে আমি কোন দিনই পটু ছিলাম না। তথাপি, নিউ থিয়েটার্স-এর অনেক ছবিতে আমাকে নামানো হয়েছিল, আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও এড়াতে পারিনি। ডাক্তার ছবির নায়কের ভূমিকায় আমাকে অভিনয় করতে হয়েছিল। নায়িকা ছিলেন শ্রীমতী পান্না। এই ছবিতে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গান—'কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি/আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে বাঁশরী উঠিছে বাজি'—আমি গেয়েছিলাম। এ ছাড়া গেয়েছিলাম বন্ধুবর অজয় ভট্টাচার্য রচিত এবং মৎকর্তৃক সুরারোপিত (সংগীত পরিচালক আমিই ছিলাম) কয়েকটি গান—'এই বয়সের এই আমি, এই বয়সেই থাকব', 'যবে কণ্টকপথে হবে রক্তিম পদতল', 'ওরে চঞ্চল, ওরে চঞ্চল / এ পথে এই যাওয়া / এ সুরে এই গাওয়া / শেষ নয়, শেষ নয়, সে কথাটি বল' এবং 'চৈত্র দিনের ঝরা পাতার পথে / দিনগুলি মোর কোথায় গেল / বেলাশেষের শেষ আলোকের রথে'। হিন্দী 'ডাক্তার'-এর গান ছিল 'চলে পবন কী চাল' এবং 'গুজর গয়া উয়ো জমানা' ইত্যাদি। গানগুলিকে সে যুগের মানুষ পরম আনন্দ ও মমতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

সে যাই হোক, কচিবাবু যে শুধু সফল চিত্র পরিচালক ও এডিটারই ছিলেন তাই নয়। 'ডাবিং'-এর কাজে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'ডাক্তার' ছবির হিন্দী রূপান্তর করা হয়েছিল, কিন্তু পৃথক ভাবে ছবি আর তোলা হয়নি। অপূর্ব ডাবিং করেছিলেন কচিবাবু।

যে ঠোঁটগুলিতে বাংলা ভাষায় সংলাপ আন্দোলিত হয়েছিল, তাতেই তিনি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে হিন্দী সংলাপকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, ধরে ফেলার কোনো উপায় ছিল না বললেই হয়। মনে রাখতে হবে, তখনকার দিনে এ ছিল এক অবাক হবার মতোই ঘটনা।

টোনা রায় নামক সে যুগের এক অভিনেতা 'ডাক্তার' ছবির অন্যতম ভূমিকায় ছিলেন। বাংলা ডাক্তার যখন হিন্দীতে রূপান্তরিত হলো, তার আগেই টোনা রায় মহাশয় পরলোকগত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই তিনিই কচিবাবুর ডাবিং-এর যাদুতে আগাগোড়া হিন্দী সংলাপ বললেন হিন্দী 'ডাক্তার'-এ।

তখনকার দর্শকসাধারণ এই ঘটনায় প্রচুর বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করেছিলেন।

* * *

সিনেমায় সর্বপ্রথম সার্থকভাবে সংগীত পরিবেশিত হয়েছিল, আমার যতদূর মনে পড়ে, দেবকীবাবুর 'চণ্ডীদাস' ছবিতে। কণ্ঠসংগীত পরিবেশিত হয়েছিল কেষ্টদার গলায়, অর্থাৎ সে যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের কণ্ঠে। চণ্ডীদাসের পদ ছাড়াও, সৌরীনদার (সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়) রচিত সেকালের এক বিখ্যাত গান। তখনকার দিনে যে গান বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তিনি গেয়েছিলেন গানটি—

ফিরে চল আপন ঘরে,
চাওয়া পাওয়ার হিসাব মিছে, আনন্দ আজ আনন্দ রে।
আকাশে পাখি কহিছে গাহি—
মরণ নাহি মরণ নাহি।···

প্রসংগত বলে রাখি, এ-গানটির জন্ম কিন্তু সিনেমাটির অনেক আগেই হয়েছিল। 'স্বয়ম্বরা' বলে একটি মঞ্চসফল নাটকে অভিনেত্রী রাজলক্ষ্মী (বড়) গানটি আগেই গেয়েছিলেন আমার সুরে। সেই গানই কেষ্টবাবু গাইলেন চণ্ডীদাসে।

চন্ডীদাসে আর একটি গান তিনি আমার সুরে গেয়েছিলেন—'সেই যে বাঁশি বাজিয়েছিলে যমুনার তীরে।' এ গানের সুর দিয়েছিলাম পুরবীতে—কিন্তু এখন বুঝি, অল্পবয়সে এমন ভুল করেছিলাম। এ-গানের যা মুড তাতে পুরবী সুর খাপ খায় না।

যাই হোক, মনে পড়ে, চিত্রা সিনেমার (শ্যামবাজারে, এখন যার নাম 'মিত্রা') কাছে সৌরীনদার বাড়িতে বসে একদিন এই গানে সুর দিয়েছিলাম।

* * *

টুকরো টুকরো এমন কত প্রসংগই না আজ মনের মধ্যে ওঠাপড়া করে। মনে পড়ে, সিনেমার ব্যাকগ্রাউণ্ড বা আটমসফেরিক মিউজিক অর্থাৎ আবহ-সংগীতের গোড়ার কথা। সিনেমায় এই 'আবহ সংগীত' ব্যাপারটির জন্মদাতা ছিলেন দেবকীকুমার বসু। ভারতীয় সিনেমা এই বিষয়ে, শুধু এই বিষয়েই বা কেন, ইনটারলিংকিং মিউজিকের প্রয়োগেও দেবকীকুমারের কাছে চিরঋণে

আবদ্ধ। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি বলি যে এই ইনটারলিংকিং মিউজিক জিনিসটিকে কণ্ঠশিল্পী ও সংগীত পরিচালক হিসাবে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধাররূপে ব্যবহার করেছি ডিস্ক্-রেকর্ড ও সিনেমায়।

আবহ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যেমন প্রথম কৃতিত্বের অধিকারী দেবকীকুমার বসু, ঠিক তেমনই ভারতীয় সিনেমায় ব্যাক প্রজেক্শন্ ব্যাপারটির উদ্গাতা হলেন প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। সিনেমার পর্দায় চলমান যানের 'ইলিউশান' সৃষ্টি করার জন্য বড়ুয়া সাহেবই প্রথম 'ব্যাক প্রজেকশন্' পদ্ধতির প্রয়োগ করেন।

যেমন ধরা যাক চলন্ত রেলগাড়ীর ভিতরের দৃশ্য দেখাতে হবে। এর জন্য সত্যিকারের ট্রেণের ভিতরে গিয়ে 'সুটিং' করার যে প্রয়োজন নেই তা বড়ুয়া সাহেবই প্রথম দেখালেন। স্টুডিওর মধ্যেই রেলগাড়ির কামরা প্রস্তুত করা হলো এবং তার দুদিকের জানালার কিছুটা বাইরে ক্যানভাসের পর্দা রাখা হলো। ক্যানভাসের উপরে ধাবমান ট্রেণের দুপাশের নৈসর্গিক চিত্রাবলী আঁকা রয়েছে। এমন ব্যবস্থা রাখা হলো যাতে ট্রেণের গতিপথের বিপরীতে ঐ চিত্রিত ক্যান্ভাস যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে সম-গতিতে চলতে থাকে। কামরার ভিতরে বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করছেন, চলচ্চিত্রে তা তোলা হচ্ছে, বাইরে বিপরীতগামী অপসৃয়মান নিসর্গ-চিত্র—চলমান রেলগাড়ীর দুপাশের পরিচিত দৃশ্য।

এর সঙ্গে আছে শব্দ-চাতুর্য! তার সাহায্যে চলন্ত রেলগাড়ীর কামরা স্বাভাবিক ও সন্দেহাতীত হয়ে উঠ্ত।

আজকের দৃষ্টিতে যা-ই হোক না কেন, সে যুগের নিরিখে এই পদ্ধতি ছিল একটি অসাধারণ উদ্ভাবন যার মূল কৃতিত্বের অধিকারী প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া।

সেকালের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক এবং আধুনিক বাস্তবমুখীন উপন্যাস-সাহিত্যের অগ্রপথিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সিনেমা শিল্পের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন, একথা আজ হয়তো অনেকেই জানেন না। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা চিত্রপরিচালনার কাজে কখনো না কখনো সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। এঁদের মধ্যে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বা বুড়োদার কথা আগেই বলেছি। প্রেমেন্দ্রবাবু অবশ্য নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

শৈলজানন্দ প্রথম জীবনে ছিলেন নীতীন বসু মহাশয়ের সহকারী। পরে স্বাধীনভাবে অন্য প্রতিষ্ঠানে চিত্র পরিচালনার কাজে হাত দেন।

প্রতিভাধর এই পুরুষ কথাশিল্পে যতখানি বড় ছিলেন, চলচ্চিত্র-শিল্পে হয়তো ততখানি ছিলেন না। তথাপি, তাঁর সামগ্রিক শিল্পীসত্তা আমার চোখে ছিল পরম শ্রদ্ধেয়। চিত্রজগতে তিনি আমার অগ্রজপ্রতিম, তাঁকে আজ আনত চিত্তে স্মরণ করি।

* * *

যে সমস্ত ছায়াচিত্রে আমি সংগীত পরিচালনা করেছি, সেগুলির নামোল্লেখ করা এই প্রসঙ্গে হয়তো অবান্তর হবে না। ছবিগুলি যতদূর স্মরণ করতে পারছি, হচ্ছে—

প্রেমাংকুর আতর্থীর পরিচালনায়—দেনাপাওনা, য়াহুদীকী লড়কী, সুবহ-কী সিতারা, কপালকুণ্ডলা, মর্যাদা।

দেবকী বসুর পরিচালনায়—চণ্ডীদাস, নর্তকী।

সৌরেন সেনের পরিচালনায়—রূপকথা, রূপকহানী (হিন্দী)।

প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনা—মুক্তি (বাংলা ও হিন্দী), দেবদাস, জিন্দগী মায়া (বাংলা ও হিন্দী), রূপলেখা, গৃহদাহ, মনজিল, অধিকার (শেষ দুটি ছবিতে কেবল আমার গাওয়া গানগুলির সুররচনা আমার)।

নীতিন বসুর পরিচালনায়—ভাগ্যচক্র (এবং এর হিন্দী ধূপছাঁও) জীবনমরণ, দুষ্মন, দেশের মাটি, ধরতী মাতা (হিন্দী) কাশীনাথ (বাংলা ও হিন্দী)। ডাকু মনসুর (হিন্দী), দিদি (বাংলা ও হিন্দী)।

অমর মল্লিকের পরিচালনায়—বড়দিদি (বাংলা ও হিন্দী)।

ফণী মজুমদারের পরিচালনায়- ডাক্তার ও কপালকুণ্ডলা (হিন্দী)।

সুবোধ মিত্রের পরিচালনায়—ডাক্তার (হিন্দী), মেরী বহেন (My Sister), নার্স সি সি, প্রতিবাদ, উঁচ্-নীচ্, দুই পুরুষ, রাইকমল।

প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায়—অভিজ্ঞান।

কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায়—মহাপ্রস্থানের পথে, যাত্রিক (হিন্দী)।

ভোলানাথের পরিচালনায়—দিকশূল।

দীনেশ দাশের পরিচালনায়—আলোছায়া।

মধু বসুর পরিচালনায়—মীনাক্ষী (বাংলা ও হিন্দী)।

ইন্দর সেনের পরিচালনায়—চিত্রাঙ্গদা (বাংলা ও হিন্দী)।

তপন সিংহের পরিচালনায়—লৌহকপাট।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়—আহ্বান।

হীরেন নাগের পরিচালনায়—বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা।

পল্ জিল্‌স্ -এর পরিচালনায়—জলজলা (রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'-এর হিন্দী)।

জ্ঞান মুখোপাধ্যায়-এর পরিচালনায়—সম্রাট।

* * *

পাছে ভুলে যাই তাই এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশেষ নাম স্মরণ করি।

নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজিত বাংলা ও হিন্দী-উর্দু ছবিতে যে সমস্ত কবিদের গীতরচনা গ্রহণ করা হতো তাঁদের নাম আজ বিশেষভাবে মনে পড়ছে। বাঙালি কবিরা ছিলেন—বাণীকুমার, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রলাল রায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হিন্দী ও উর্দু কবিরা ছিলেন—আসগর হোসেন শোর, আরজু লখ্‌নৌবী, পণ্ডিত ভূষণ, পণ্ডিত সুদর্শন ও রমেশ পাণ্ডে।

বলা বাহুল্য, সর্বোপরি ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, যাঁর দয়া দিয়ে আমরা আমাদের জীবন বার বার ধুয়ে নিয়ে ধন্য হতাম।

" ' স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে টুকরো টুকরো অনেক কথা আজ মনে পড়ছে। সব কিছু হয়তো ঠিক মত সাজিয়ে বলা যাবে না, তবু কিছু বলে নিই, নতুবা তারা না-বলাই থেকে যাবে। আগেই উল্লেখ করেছি যে ১৯৩১ সালে বিশ্ব-কবিকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল তাঁর সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে। সেই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দুখানি গ্রন্থ তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত হয়েছিল। একটি বাংলা—'জয়ন্তী উৎসর্গ', অপরটি ইংরেজি—Golden Book of Tagore। কবির সম্পর্কে আলোচনার ও প্রশস্তির দিক থেকে এ দুটির মতো উপাদেয় সংকলন খুব কমই হয়েছে আজ পর্যন্ত। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থ দুখানি আজ আর ছাপা হয় না।

এই বিপুল অনুষ্ঠানে তাঁরই গানের নৈবেদ্য দিয়ে কবিকে যে সঙ্গীতাঞ্জলি দেওয়া হয়, সে-অনুষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন, স্বভাবতই, স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যতদূর মনে পড়ে এই উৎসব সমিতির (রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পরিষদ্?) অঙ্গীভূত সঙ্গীত ও অভিনয় ব্যবস্থা উপসমিতির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। উৎসব পরিষদের তরফ থেকে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেই এই সব তথ্য সন্নিবিষ্ট ছিল (পরলোকগত শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম বন্ধুবর অমল হোম মহাশয়ের সম্পাদনা)। সে যাই হোক, সঙ্গীত ও অভিনয় উপসমিতির অন্যান্য সভ্যরা ছিলেন, যদি আমি ভুল না করি,—সরলা দেবী, অরুন্ধতী দেবী, মৃণালিনী দেবী, ব্রহ্ম-কুমারী দেবী, প্রমদা দেবী, সুরমা দেবী, নলিনী দেবী, মন্মথমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ কর ও প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ।

এই প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ (আমার বুলাদা), হচ্ছেন স্বনামধন্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রসঙ্গ মনে হলেই আমি সত্যই প্রচুর প্রফুল্লতা বোধ করি। তাঁর স্নেহ ও সৌহার্দ্যের স্মৃতি আমার এই অকৃতী জীবনে পরম গৌরবের বিষয়। বড়ো সুন্দর বাঁশি বাজাতেন তখন বুলাদা। চৌরঙ্গী অঞ্চলে ছিল সে-যুগের বিখ্যাত সঙ্গীতযন্ত্র ও সঙ্গীত-

দ্রব্যাদি বিষয়ক দোকান—"কার মহলানবীশ এণ্ড্ কোম্পানী"। বুলাদা ছিলেন এই দোকানের কর্তৃপক্ষের একজন। সদা প্রফুল্ল এই মানুষটির সুমিষ্ট বংশী-বাদন আমার কাছে ছিল একটি বিশেষ আকর্ষণ। বুলাদাও আমায় ও আমার গানকে ভালবাসতেন। মনে পড়ে, জীবনের নানান্ অধ্যায়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমা হেন ক্ষুদ্র মানুষের যোগসূত্র অনেকবার রচনা করে দিয়েছেন।

যাই হোক, জয়ন্তী-উৎসর্গের কথায় ফিরে আসি। দিনেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীর যুগ্ম-সম্পাদনায় এবং প্রথম জনের সঙ্গীত পরিচালনায়, যতদূর মনে পড়ে, নিম্নোক্ত শিল্পীরা সেই বিরাট রবীন্দ্র সঙ্গীতাঞ্জলি-অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পুরুষ শিল্পীগণ ছিলেন—

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজকুমার মল্লিক, উমাপদ ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত, অনাদিকুমার দস্তিদার, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, পশুপতি ভট্টাচার্য, অনিলভূষণ বাগচী, সুশীলকুমার বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, কাননকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিপদ রায়, রবি বসু, শশীকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়, সাগর লাহিড়ী, বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ, শক্তীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নির্মল-চন্দ্র বড়াল, দীপক চৌধুরী, অজিত মল্লিক, অশোক মিত্র, শান্তিময় ঘোষ, সুধীর কর, পিনাকিন্ ও শৈলেশ হোম।।

মহিলা শিল্পীগণ—অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, মালতী বসু, কনক দাশ, রমা কর, সাবিত্রী গোবিন্দ, জে, বেগম, লতিকা রায়, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, বাণী চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, অমিয়া ঠাকুর, অমিতা সেন, পূর্ণিমা চৌধরী, দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়, সরস্বতী দত্ত, অরুন্ধতী ঘোষ, উমা চট্টোপাধ্যায়, রমা চট্টোপাধ্যায়, শেফালিকা পালিত, সুলেখা ঘোষ, অঞ্জলি দাস, গীতা দাস, লীলা মিত্র, ইলারাণী ঘোষ, অমিয়মুকুল চৌধুরী, করুণা চৌধুরী, অমলা দত্ত, মনিকা ধর, গীতা রায়, ললিতা সেন, কল্যাণী সরকার, মন্দিরা গুপ্ত, সুধা দাস, অনুভা ঠাকুর, অরুণা সেন, রমা চট্টোপাধ্যায় ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়, মালা দাস, সংযুক্তা সেন, গায়ত্রী বাগচী, রুবি চট্টোপাধ্যায়, শিবানী সরকার, মঞ্জু বসু, হাসি বসু, উষা মজুমদার ও আভা চন্দ্র।

আমাদের প্রথম জীবনে রবীন্দ্রসম্বর্ধনার এই ঐতিহাসিক আয়োজনে শিল্পী হিসাবে অংশগ্রহণ করতে পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিলাম। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই উৎসবের সহশিল্পীদের নাম তাই একবার অন্তত উল্লেখ না করে পারলাম না।

প্রসংগত বলি, জয়ন্তী উৎসবের এই সংগীতানুষ্ঠানের রিহার্সাল হতো প্রথমে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে, পরে সমবায় ম্যানসনে। রিহার্সালের জন্য ঐ দুই স্থানেই আমি অক্ষয় সরকার মহাশয়কে নিয়ে রিক্সা করে তবলা, খোল, পাখোয়াজ প্রভৃতি সংগে নিয়ে যেতাম, বিভিন্ন প্রকার গানের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রে তাল সংগতের জন্য।

সমবেত সংগীতপরিবেশনার বাইরে, একক সংগীতের দিক থেকে আমি নিজে উৎসবে গেয়েছিলাম—'চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে'—গানটি। তখন অবশ্য গানটি সুরু করা হতো 'উতল পবনে' দিয়ে। ··

* * *

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে রবীন্দ্র-তিরোভাবের কিছুদিন পরের একটি দুঃখজনক ঘটনার কথা আজ মনে পড়ে। কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দু'খানি গান রেকর্ড করেছিলাম রেকর্ড কোম্পানীর অনুরোধে। গান দুটি—'তুমি মোর পাও নাই পরিচয়' এবং 'যাও যাও যদি যাও তবে, তোমায় ফিরিতে হবে'। মিউজিক ছিল শুধু মাত্র অর্গানের। আগেই বলেছি, কবি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর স্নেহ, স্বীকৃতি ও অনুমোদন থেকে বঞ্চিত হইনি। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা ছিল না। শান্তি-নিকেতনের যে গোষ্ঠীটি প্রধানত পংকজ-বিরোধিতাকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুদ্ধতা রক্ষার অব্যর্থ উপায় বলে মনে করতেন তখন, তাঁরা ওই রেকর্ডখানির অনু-মোদনে বাগড়া দিলেন। কারণ দেখানো হলো যে—অর্কেস্ট্রা না কি বড় বেশি হেভী!

আঘাতটা লেগেছিল খুব। বন্ধু অজয়কে (অজয় ভটাচার্য) দিয়ে তখন একই ছন্দে দুটি গান লিখিয়ে নিয়েছিলাম -'আমি আজ নিয়ে যাই পরাজয়' এবং 'নাও মালা নাও গন্ধে'। এই রেকর্ডটিকে অবশ্য ওই গোষ্ঠী ঠেকাতে পারেননি- তাঁদের এক্তিয়ারের বাইরে ছিল এটি।

* * *

দিনেন্দ্রনাথ 'রস' এর কথা আলোচনা করতে বসলেই একটি সুন্দর কথা প্রায়ই বলতেন। কথাটা কবিতার পাদপূরণ বিষয়ক। কবিতার পাদপূরণের মাধ্যমে কৌশল ও রসসৃষ্টির ক্ষমতার প্রদর্শন প্রাচীন যুগ থেকে প্রাগাধুনিক যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। যেমন কবিওয়ালাদের যুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালা হরুঠাকুর কৃষ্ণনগরের রাজসভায় একটি অপূর্ব পাদপূরণ করেছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল একটি কবিতা মুখে মুখে রচনা করতে যার শেষ চরণটি হবে—"বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে"। হরুঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলেন--

একদিন শ্রীহরি
মৃত্তিকা ভোজন করি
ধূলায় লুটায়ে বড় কান্দে
জননী অঙ্গুলি বাঁকায়ে ধীরে
মৃত্তিকা বাহির করে
বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে ॥

ঠিক তেমনই প্রাচীন যুগে, অর্থাৎ কালিদাস ভবভূতির যুগে নাকি মা সরস্বতী ক্ষমতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ষোড়শী বালিকার বেশে দেখা দিয়ে একটি চরণ উচ্চারণ করে পাদপূরণ ভিক্ষা করেছিলেন কালিদাস ও ভবভূতির কাছে। বালিকা অশ্রুমোচন করতে করতে এই ভিক্ষা চেয়েছিলেন, কারণ এই পাদপূরণ করতে তাঁর পিতা আদিষ্ট হয়েও অক্ষম, সুতরাং রাজার নিকট হতে ভর্ৎসনা অনিবার্য। বালিকা-বেশী বীণাপানি বাগ্‌দেবীর উচ্চারিত চরণটি ছিল— "নাধরে জায়তে রাগঃ নানুরাগঃ পয়োধরে।"

ভবভূতি বলেছিলেন—

"বিনা খদিরসারেন হারেন চ মৃগীদিশান্
নাধরে জায়তে রাগঃ নানুরাগঃ পয়োধরে।"

কালিদাস বলেছিলেন

"যাবন্ন ষোড়শীবালা সন্তপ্তা মদনানলে
নাধরে জায়তে রাগঃ নানুরাগঃ পয়োধরে।"

বলা বাহুল্য, রসিক কবি হিসাবে কালিদাস যে শ্রেষ্ঠ এই কথাটাই এই কাহিনীর প্রতিপাদ্য।

* * *

আনন্দ পরিষদের একটি পুরানো কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এ'দের উদ্যোগে পরিষদ-সদস্য লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্রের পরিচালনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের নাট্যরূপান্তর করিন্থিয়ান থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল। সময়টা ১৯২৭/২৮ খ্রীষ্টাব্দ। বিশ্বকবি আনন্দ পরিষদের সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে অভিনয় দেখতেও এসেছিলেন। আমাকে এক উদাসী গায়কের চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছিল এবং নাটকটির এক বিশেষ দৃশ্যের জন্য বিশ্বকবির—'কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে'—গানটি পরিবেশনার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু মূল সুরের নৃত্যময় রূপটির একটি পরিবর্তিত শান্ত রূপের পরিবেশনই দৃশ্যটির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে বলে লক্ষ্মীদার ধারণার হয়েছিল। তিনি আমায় একটি সুর দিতে বললেন। আমি সমস্যায় পড়লাম, তথাপি রচনাটিতে একটি সুরারোপ করে প্রথমেই কর্তব্যের খাতিরে দিনুবাবুর সঙ্গে দেখা করে ও তাঁকে বুঝিয়ে আমার দেওয়া সুরটি শোনালাম। তিনি অবশ্য কোনোরূপ ক্ষোভ প্রকাশ না করেই স্বয়ং সস্নেহে অনুমোদন জানালেন এবং কবির পক্ষ থেকেও অনুমতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু আমি মনে মনে খুবই অস্থির হয়েছিলাম। তাই অভিনয়ের কয়েকদিন পরে দিনুবাবুর সঙ্গে দেখা করে ও জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম যে এই সুরারোপ হেতু কবিও কোনোরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করেননি।

গুজরাট ভ্রমণকালে কবি দেখেছিলেন যে একটি মেয়ে তার দুই হাতে করতাল নিয়ে গান গাইছে। ঐ দৃশ্যটিই ছিল তাঁর এই গীতরচনার প্রেরণা। কবির নিজের দেওয়া সুরটি অতুলনীয়। তাকে অনুকরণ করা বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুরসৃষ্টি করা আর কোনো সুরকারের পক্ষে সম্ভব কিনা আমার জানা নেই। তাই, কবি কোনোরূপ ক্ষোভ প্রকাশ না করলেও একটু বয়স বাড়তেই মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলাম যে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করাই উচিত ছিল।

* * *

২৮

আঁধার আলোর পারে
খেয়া দিই বারে বারে
নিজেরে হারায়ে খংুজি
দংুলি সেই দোলে দোলে···

চিত্রজগতে আমার অগ্রজপ্রতিম, শ্রদ্ধেয় অভিনেতা পরলোকগত অহীন্দ্র চৌধংুরী মহাশয় তাঁর স্মৃতিকথা রচনা করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন—'নিজেরে হারায়ে খংুজি'। বড়ো সংুন্দর ও উপযংুক্ত নাম তিনি বেছে নিয়েছিলেন। বাস্তবিক, স্মৃতি চয়ন করার অর্থই তো হচ্ছে যে—যে-আমি অতীতের চির-অস্ত অন্ধকারে হারিয়ে গেছে সেই আমিকে খংুজে পাওয়ার প্রয়াস! আমরা সকলেই সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে কখনো না কখনো হারিয়ে যাওয়া সত্তাকে খংুজে ফিরি— স্মৃতিকথা রচনা করি বা নাই করি। আজ স্মৃতির কুসংুমগংুলিকে চয়ন করতে বসে বার বার এই সত্যটিকেই আমি উপলব্ধি করছি।

'সে তো আজকে নয়', সে আজ চল্লিশ বছর পংুর্বের কথা যখন রবীন্দ্রনাথের 'মরণের মংুখে রেখে দংুরে যাও চলে/আবার ব্যথার টানে নিকটে ফিরাবে বলে।' এই গানটি আমি গেয়েছিলাম, রেকর্ড হয়েছিল। স্বরবিতান ২য় খণ্ডে গানটির দ্বিতীয় লাইনটি গাইবার নির্দেশ আছে মাত্র একবার, আমি কিন্তু দংুবার গেয়েছি, প্রথমবারের সঙ্গে স্বরলিপির কোনোরংুপ মিল নাই, কিন্তু দ্বিতীয়বারের সঙ্গে 'আবার ব্যথার' এই দংুটি শব্দের সংুরে সামান্য ব্যতিক্রম করে সংুরটির ভাব-মাধংুর্য ক্ষংুণ্ণ না করেই গাইবার প্রয়াসী হই। আমার এই গানেরই আভোগ অংশের দ্বিতীয় লাইনের 'কভংু অপমানে' এই দংুটি শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর ভংু অক্ষরটির মংুল স্বর কোমল ধৈবতের স্থানে শংুদ্ধ ধৈবত লাগিয়েছিলাম। কবিগংুরংুর চরণে প্রণতি নিবেদন করে বংুঝিয়েছিলাম যে এই সামান্য সংুরের ব্যতিক্রমে গানটির সংুরের গভীর ভাব-মাধংুর্য কোনোরংুপ ক্ষংুণ্ণ হবে না। ভাগ্যক্রমে কবির সস্নেহ কৃপায় এই সামান্য ব্যতিক্রমটংুকুকে আমি তাঁর আশীর্বাদসহ অনংুমোদন লাভ করেছিলাম। এই গানেরই অংশ 'নিজেরে হারায়ে খংুজি'র উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই সংুদংুর অতীতের এই ঘটনাটি মনে

পড়ে গেল। বুলাদা(প্রফুল্ল মহলানবীশ) বলেছিলেন—বেশ মজা পেয়েছেন তো ? কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির কাছ থেকে অনুমতি আনিয়ে দিয়েছিলেন।

আজকাল অনেকেই যথার্থ রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করছেন না, অথচ তা স্বীকার করতে তাঁরা নারাজ। আমি সেই সুদূর অতীতে কবির সুরে এই যে ছোট্ট পরিবর্তনটুকু করেছিলাম তাতে যদিও কবির অনুমতি ছিল, তথাপি স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আমি অন্যায় করেছিলাম। গাইতে গিয়ে অনেক সময় একটু এদিক ওদিক হলেও হতে পারে, কিন্তু সজ্ঞানে এরূপ করা শুধু অন্যায় নয় অপরাধ-ও।

রবীন্দ্রসংগীত তথা ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি, পাশ্চাত্য স্বরলিপি, বা "স্টাফ্ নোটেশন"—এর মতো নয়। ওদের গায়কের যা কিছু করণীয়, অর্থাৎ সঙ্গীতের লয়, ছন্দ, মীড়, মূর্চ্ছনা, গমক সবই নোটেশনের মধ্যে বেশ ভালভাবে উল্লেখ করা থাকে। ওদের স্বরলিপি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু আমাদের স্বরলিপি নিতান্তই স্বরলিপি, স্বরের লিপি। আর কিছু নেই তাতে। কাজেই বাণীর অংশটুকু পড়ে ও অর্থ বুঝে গানের লয় ও ভাব ঠিক করে গায়ককে সে গান পরিবেশন করতে হয়। স্বরলিপি শুধুই কাঠামো। রূপে রসে, বর্ণে, ছন্দে সঙ্গীতের অপরূপ প্রতিমারচনার ভার সম্পূর্ণরূপে গায়কের।

কবির ভাষায় 'ইংরাজী গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজী সংগীত লোকনাথের সঙ্গীত আর আমাদের সংগীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট, অনির্বচনীয় বিষাদের সঙ্গীত।'

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গসংগীতে শুধুই 'সুরের আগুন' জ্বলে। বাণী সেখানে হরিজন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সর্বদাই বাণী ও সুরের হরগৌরী মিলন, শিব ও শিবানীর অলোছায়াময় লীলা। কাজেই বাণী, অন্তর্নিহিত ভাব ও লয় না বুঝে এ-গান পরিবেশনের ফল মারাত্মক।

একটা উদাহরণ দিই। দেশমাতার বরপুত্র আত্মত্যাগের প্রতীক শহীদ যতীন দাসের লাহোর জেলে অনশনজনিত মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ব্যথা-জর্জরিত কবি রচনা করেছিলেন—

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ
হে ভৈরব শক্তি দাও, ভক্ত পানে চাহ।

এ-গানটি অনেকে উদাত্ত জোরালো গলায় দ্রুতলয়ে গেয়ে থাকেন এবং 'শক্তি দাও' শব্দ দুটিকে এমনভাবে বলেন যার মধ্যে মিনতি বা প্রার্থনার ভাব কিঞ্চিন্মাত্র পরিস্ফুট হয় না। শুনতে শুনতে মনে হয় ভৈরব শক্তি না দিলে বোধহয় জোর করে তা কেড়ে নেওয়া হবে। চপলতা বা নাটকীয়তা সস্তা বাহবা এনে দেয় সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের অন্তর্নিহিত গভীরতা এতে অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিন্তু কী কথার থেকে কিসে এসে পড়লাম। নিজের অতীতের ভুল স্বীকার করতে গিয়ে, বর্তমান কালের সমালোচনায় বসলাম!

পরম পূজ্যপাদ দিনেন্দ্রনাথ আমাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন কিনা জানিনা। কিন্তু আমিই যে তাঁর শিষ্যত্ব আদায় করেছিলাম একথা জানি। তাঁর কাছেই জেনেছিলাম যে নিজের খেয়াল খুশি মতো গাইলে এ সুন্দর সৃষ্টি একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তাতে ক্ষতি আমাদেরই। কবিগুরু তাঁর সঙ্গীতের ভাণ্ডার উজাড় করে সব আমাদের দিয়েছেন, অথচ আমরা যদি তা রাখতে না পারি তাহলে উত্তরসুরীদের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেব?

* * *

কবিগুরুর জন্মশতবর্ষে নিমন্ত্রণ পেয়ে চলে গিয়েছিলাম দেরাদুনে, কবিপুত্রের গৃহে। শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজপ্রতিম রথীন্দ্রনাথ সেখানে বাবামশাই-এর জন্মশতবর্ষ পালন করছিলেন। আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র আমন্ত্রিত কণ্ঠশিল্পী। একথার উল্লেখ আগেই একবার করেছি।

মনে পড়ে, যে-কদিন ছিলাম সে-কদিনই এই প্রচারবিমুখ প্রতিভাটির সংস্পর্শে বিস্মিত হয়েছিলাম। বাবামশাই-এর পুত্র, জন্মলগ্ন থেকেই রবিচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত। যে যত বড়ো মনীষার অধিকারী হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথের পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে রাতের সব তারাকেই দিনের আলোর গভীরে অনিবার্য ভাবেই মিলিয়ে যেতে হতো। তা ছাড়া রথীবাবু তো একেবারেই প্রচার-বিমুখ ছিলেন। অথচ বাংলা ও ইংরেজি দু ভাষাতেই তাঁর লেখনী ছিল সুপটু। উদ্ভিদ ও উদ্যান বিদ্যায় তিনি ছিলেন অসাধারণ। বিচিত্র ও বহুবিস্তৃত ছিল তাঁর হাতের কাজ ও কারুকর্মের ক্ষমতা—এসবই নিজের চোখে দিনের পর দিন দেখেছি। 'বাবা মশাই'-এর গানের কথা ও সেই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর অনেক কথাই তিনি বলতেন -বুঝতাম পিতৃদেবের সঙ্গীত সম্পর্কেও

তাঁর কতো গভীর অনুশীলন ছিল। সেইগান যূথবন্ধ বা গোষ্ঠীবন্ধ হয়ে বাণিজ্য-কতায় পর্যবসিত হোক বা দু একজন 'বস্'-এর অধীনস্থ হয়ে থাক এ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। কিন্তু হায়, অনেক ব্যাপারেই তিনি নিরুপায় ছিলেন।

প্রায়ই বলতেন 'বাবা মশাই' এর গান বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে গীত এবং প্রচারিত হোক। ঠিক 'বাবামশাই' এর মতোই, তাঁরও এ-গানের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে কোনো গোঁড়ামি ছিল না। তিনিওএ বিষয় যথার্থ মুক্ত মন ও কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। আমার গানকে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী যে চোখেই দেখে থাকুন না কেন, রথীন্দ্রনাথের স্বতঃপ্রণোদিত প্রীতি ও প্রশংসা থেকে তা কখনো বঞ্চিত হয়নি। ২০.৯।৫৭ তারিখে তিনি অযাচিতভাবে আমাকে একটি ব্যক্তিগত পত্রে লিখেছিলেন—'গত শনিবার এখানে বসে National Program-এ আপনার গান শুনে অত্যন্ত প্রীতি হলুম। আমার পিতার গান যেরকম প্রাণ দিয়ে গাওয়া উচিত, আপনি তাই গেয়েছিলেন। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলুম। এত ভালো লেগেছিল যে আপনাকে সে কথা না জানিয়ে থাকতে পারলুম না। আপনার গলা সেদিন অপূর্ব শুনিয়েছিল।'

দেরাদুনে পাহাড়ের গায়ে বর্ষা নেমেছে, আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি। বপ্রক্রীড়ারত গজেরা মেঘমাশ্লিষ্ট সানুতে দৃশ্যমান। রথীবাবু আদেশ করলেন, 'বর্ষার গান করুন'।

মনে পড়ে, আমার জীবনে, বেতারে বা রেকর্ডে, বোধকরি এমন প্রাণ-ঢালা বর্ষার গান আর কখনো গাইনি। একের পর এক নিবেদন করে গেছি তাঁর উদ্দেশে, তাঁরই আত্মজের পাশে দাঁড়িয়ে। রথীবাবু বিহ্বল উল্লাসে আমাকে প্রায়ই জড়িয়ে ধরছিলেন এই সব স্মৃতি আমার আজকের বার্ধক্যের দিনে, গলায় যখন সুর ফুরোতে বসেছে, পরম সঞ্চয়।

২৯

গায়ক ও সুরকার হিসাবে বেতার, সিনেমা ও গ্রামোফোন রেকর্ডিং-এর সঙ্গে সঙ্গে আমার সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সাথে। সঙ্গীত পরিচালকরূপে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেন আমার শ্রদ্ধেয় সৌরীনদা—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়। প্রথম জীবনে এমন একটা সময় গিয়েছে যখন সৌরীনদার সঙ্গে আমার ও বাণীকুমারের প্রীতির বন্ধন অবিচ্ছেদ্য ছিল। সৌরীনদা-রচিত নানান্ গানের সুরকার ছিলাম আমি—সৌরীনদার শ্যামবাজার অঞ্চলের বাসগৃহে বসেই তাঁর গীতরচনায় সুর-সংযোজনা করেছি একাধিকবার। তখন অগ্রজের সঙ্গে অনুজের প্রাণ সুরের বাঁধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল।

যতদূর মনে পড়ে ১৯৩০ সালে সৌরীনদার 'স্বয়ম্বরা' নাটকের গানগুলিতে আমিই সুরারোপ করি। বঙ্গরঙ্গালয়ের সঙ্গে সেই প্রথম আমার আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল। সৌরীনদার মাধ্যমেই পরিচিত হয়েছিলাম সে-যুগের নাট্য-লোকের দিকপাল অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে—অপরেশচন্দ্র, অর্থাৎ স্টার থিয়েটারের অধিকর্তা, শ্রদ্ধাস্পদ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সৌরীনদা এবং অপরেশ-বাবু উভয়েই অবশেষে অনুরোধ করেছিলেন সামগ্রিকভাবে নাটকটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে। বলা বাহুল্য, সে দায়িত্ব আমি উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম।

নাটকটির অন্যতম চরিত্রে ছিলেন সে যুগের স্বনামখ্যাতা শিল্পী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী। তাঁর গানেরও গলা ছিল। ওই নাটকে তিনি গেয়েছিলেন 'ফিরে চলো, ফিরে চলো, ফিরে চলো, আপন ঘরে।' আমার দেওয়া সুরটি দর্শকসাধারণ সমাদরের সঙ্গে নিয়েছিলেন।

সে যুগের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক দেবকীকুমার বসু মহাশয় একদিন এই গানটি সৌরীনদার বাড়ীতে বসে শুনেছিলেন। গানটি তাঁর এত পছন্দ হয়ে গিয়েছিল যে তিনি শীঘ্রই তাঁর সবাক চিত্র 'চণ্ডীদাস'এ এটি ব্যবহার করতে উদ্যোগী হলেন। শেষ পর্যন্ত গানটির সামান্য কিছু পরিবর্তন করে

তিনি তাঁর ছায়াছবিতে প্রয়োগ করলেন। কণ্ঠ দিলেন সে-যুগের কণ্ঠ-সংগীত-সম্রাট কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়—আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় কেষ্টদা। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন যথার্থই একজন বিরাট পুরুষ, অন্যত্র সেকথা বলেছি।

কিন্তু, কথা হচ্ছিল রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে আমার সংস্রব নিয়ে। সেই কথাতেই ফিরি। কিছুকাল পরে উত্তর কলকাতার আর একটি রঙ্গমঞ্চ রঙমহলের সংস্পর্শে আসি। সেখানে অভিনীত নাটকটির নাম ছিল 'সন্তান'—সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের নাট্যরূপান্তর—রচয়িতা ছিলেন বন্ধুবর বাণীকুমার। এই নাটকে প্রস্তাবনা-গীত 'মুক্তির বন্দনা গাহ' এবং 'বন্দেমাতরম' গান দুটিতে সুরারোপ করি, অন্যান্য গান গুলিতে তো বটেই! জনৈক সন্তানের চরিত্রে অভিনয় করতেন সেযুগের সর্বজনসমাদৃত, মুক্তকণ্ঠ গায়ক মৃণাল-কান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ। তিনিই আমার সুরে 'বন্দেমাতরম্ গানটি মঞ্চে গাইতেন। আমার সুরে বন্দেমাতরম্ গাইতেন মৃণালকান্তি—আনন্দে আমার বুক ভরে উঠত। সময়টা ছিল আমাদের স্বাধীনতা-লাভের কিছু পূর্বের।

সমসাময়িক একটি ঘটনা প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ছে। কলকাতা বেতারে সরকারী আদেশবলে এই সময়ে অকস্মাৎ 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটির প্রচার ও পরিবেশন নিষিদ্ধ করা হয়। কলকাতার সমগ্র শিল্পীমহল এতে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সাময়িকভাবে বেতারকেন্দ্র অচল হয়ে গিয়েছিল। বেতার শিল্পীদের একজন হিসাবে আমিও আজ এই কথা স্মরণ করে গর্ব অনুভব করি যে সাহিত্যকুলগুরু রচিত দেশমাতৃকার এই মহান বন্দনাগীতের অবমাননার প্রতিবাদে আমিও শিল্পী ভ্রাতাভগিনীদের সামিল হয়েছিলাম।

Artistes' Association-এর পক্ষ থেকে অবশেষে প্রসিদ্ধ আইনজীবী নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় (যিনি আবার নিজেও একনিষ্ঠ দেশকর্মী ও সাহিত্যরসিক ছিলেন এবং অমর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের স্নেহধন্য ছিলেন) সরকার পক্ষের সঙ্গে আলোচনা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে এই অচলাবস্থার অবসান ঘটান। তাঁর আবাসেই এই মধ্যস্থতার আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়েরই পুত্র বিশিষ্ট সুপণ্ডিত দেশনেতা ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র আমার পরম প্রীতিভাজন অনুজপ্রতিম।

* * *

১৯৫৪ সালে কলকাতা আকাশবাণীতে প্রথম জাতীয় অনুষ্ঠান বা ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব আমার উপরেই ন্যস্ত হয়েছিল। ইংরেজি নামাংকিত এই প্রোগ্রামে বংকিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, বাণীকুমার প্রভৃতির গান সংকলিত হয়েছিল। পরিচালনা ছাড়াও, শিল্পী হিসাবে আমি অন্যান্য গানের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের 'নিঠুর কাছে 'নচু হতে শিখ'ল নারে মন' গানটি গেয়েছিলাম মনে পড়ে।

* * *

আর একটি বিশেষ ঘটনা স্মরণ করে আনন্দ পাই। ১৯৫৬-এর প্রথম দিকে, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের জাতীয় প্রদর্শনীতে গান গাইবার জন্য আমি আমন্ত্রিত হই। মনে পড়ে আমার কণ্ঠের সমস্ত শক্তি নিঃশোষিত করে আমি গেয়েছিলাম—'নাই নাই ভয়/হবে হবে জয় / খুলে যাবে এই দ্বার' 'ঝর বায়ু বয় বেগে/চারিদিক ছায় মেঘে/ওগো নেয়ে নাওখানি বাইও' এবং 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা'। রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি উদ্দীপক ও দেশাত্মবোধক গান ছাড়াও গেয়েছিলাম অতুলপ্রসাদের 'হও ধরমেতে ধীর/হও করমেতে বীর/হও উন্নতশির/নাহি ভয়।'

সেই অনুষ্ঠানে সেদিন যাঁরা বক্তা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়কে। জ্ঞানাঞ্জনবাবুর বক্তৃতা শোনা তখনকার দিনে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল। প্রবীণেরা নিশ্চয় আমার একথা সমর্থন করবেন।

এই অনুষ্ঠানে আমার গান ক'খানি, বিনয় বা ভণিতা না করেই বলি, বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিপুল উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। শিল্পী হিসাবে সেদিন নিজেকে সার্থক জ্ঞান করেছিলাম।

* * *

ঠিক একই রকম আনন্দ ও গৌরব অনুভব করেছিলাম আজাদ হিন্দ ফৌজের দুটি বিখ্যাত গান রেকর্ডিং করার সুযোগ পেয়ে। পরম শ্রদ্ধাভাজন শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় ছিলেন এই উদ্যোগের মূলে। তিনি আমাকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মুক্তিবাহিনীর এই মন্ত্রসঙ্গীত দুটিকে রেকর্ডিং করার ব্যবস্থা

করতে বলেছিলেন। গান দুটি—'কদম কদম বঢ়ায়ে জা' এবং 'সুভ সুখ চৈন্ কী বরখা বর্ষে'। প্রথমটি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মার্চিং সং—

কদম কদম বঢ়ায়ে জা, খুসিসে গীত গায়ে জা,
ইয়ে জিন্দ্গী হৈ কৌমকী তো কৌম পর লুটায়ে জা ··

দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথের গান (বর্তমানে যা আমাদের জাতীয় সংগীত) 'জনগনমন অধিনায়ক জয় হে'-এর আদলে সৃষ্ট। নিউ থিয়েটার্স কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতেই আমি সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রীদের দিয়ে সমবেতকণ্ঠে গান দুটি ডিস্ক রেকর্ড করাই। যতদূর মনে পড়ে, শরচ্চন্দ্রের পুত্র ডাঃ শিশির বসু তখন যুবক এবং নেতাজীর অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী বেলা বসু (পরে শ্রীহরিদাস মিত্রের স্ত্রী) তখন কিশোরী। এঁরাও অন্যান্যদের সঙ্গে সেই কোরাসে ছিলেন। নিউ থিয়েটার্সের লেবেলে হিন্দুস্থানের রেকর্ড হিসাবে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই রেকর্ডিং অনুষ্ঠানে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে আমার ঘরে শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং শাহ নওয়াজ খান মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

* * *

১৫ আগষ্ট, ১৯৪৭। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে সব চাইতে স্মরণীয় দিবস। ১৪ আগষ্ট দিবসটির অবসানে মধ্যরাত্রের ঠিক পরেই যখন ১৫ আগষ্টের সুরু হলো, তখন রাষ্ট্রক্ষমতা জাতীয় নেতৃবর্গের নিকট হস্তান্তরিত হলো।

এই উপলক্ষে কলকাতা বেতারকেন্দ্র মধ্যযামিনীতে এক স্মরণীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের অংগ হিসাবে বাণী-কুমারের পরিকল্পিত এক 'বিচিত্রা' বেতারস্থ হয়েছিল। এর জন্য বাণীকুমার যে গীতরচনাগুলি করেছিলেন ('মুক্তির বন্দনা গাহ', 'তব কীর্তির কেতন উড়িছে অম্বরে অয়ি ভারতজননী', 'মহাশক্তিরূপে তুমি রাজ ভবে' প্রভৃতি) সেগুলিতে আমি সুরারোপ করি এবং সেই মধ্যযামেই সেগুলি ব্রডকাসট্ করা হয়।

* * *

চার তুকের গান বা ধ্রুপদ কাঠামোর গান উত্তর ভারতের প্রচলিত গান। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় এই চার তুকের গান প্রবর্তিত করেছিলেন স্বীয় সংগীত

সৃষ্টির মাধ্যমে। ধ্রুপদাঙ্গের গানের এই চার তুক-এর চারটি বিভাগ — স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। কবিগুরু তাঁর নিজের গানে এই কাঠামোটি প্রয়োগ করে বাংলা গানকে এক অভূতপূর্ব সৌষ্ঠব দান করেছিলেন।

আমাদের সমসাময়িক যুগে প্রচলিত হিন্দী-উর্দু লঘু সংগীতে এই চার তুক-এর আঙ্গিকটির ব্যবহার ছিল না। অথচ ছবির ফ্রেমের মতোই এই চার তুকের বাঁধুনি গানের সৌন্দর্যসাধনের জন্য অপরিহার্য।

সুরকার ও সংগীত-পরিচালক হিসাবে এই কথাটি আমাকে প্রবলভাবে ভাবিয়ে তোলে এবং সেই ভাবনার পরিণতি ঘটে মৎ-কর্তৃক ডিসক রেকর্ড ও হিন্দী-গীতে চার তুকের রীতির প্রবর্তনে।

আমার নিজের সুরারোপিত এই ধরণের অনেক গানের মধ্যে অল্প কয়েকটির উদাহরণ দিই।

(১) অ্যায় কাতিবে তকদীর।

(২) তেরে মন্দির কাঁহু দীপক জ্বল্ রহা।

(৩) গুজর গয়া বো জমানা।

(৪) তু ঢুঁড়তা হৈ জিসকো বস্তীমেঁ।

খুবই আনন্দের বিষয় এই যে, পরবর্তী যুগে আমার অনুজ গীতিকার-সুরকারগণ হিন্দী গানে এই রীতিই সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন।

৩৫

আমার এই স্মৃতিচয়ন অপূর্ণ থেকে যাবে যদি আমি পরলোকগত বন্ধুবর শচীন দেববর্মণের কথা বিশেষভাবে আজ স্মরণ না করি। শচীন আমার এমন এক বন্ধু যার কথায় আমার অন্তর যুগপৎ গৌরব ও শোকাবেগে মথিত হয়ে ওঠে। গৌরব এই জন্য যে তার মতো মহৎ সংগীতসাধককে আমি সমসাময়িক সুহৃদরূপে পেয়েছি। আর শোকের কারণ তো সহজেই অনুমেয়। সমবয়সী সংগীতশিল্পী আমরা, একই সংগে যাত্রা সুরু করেছিলাম। কিন্তু আজ বাংলা লোকসঙ্গীতের বিরাট ভাণ্ডারী, যে ছিল মার্গসংগীতেও পারঙ্গম এক অনুপম সুরস্রষ্টা, তার সংগীতমুখর পার্থিব যাত্রাকে সংবরণ করে চলে গেছে সেই অবাঙমনসগোচর পথে—'যে পথে অনন্তলোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে'।

শচীন আমার ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্, কিন্তু বোধকরি সে ঘনিষ্ঠতর ছিল আমাদের অপর এক সুহৃদ্ কবি-গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের সংগে। শচীনের সংগে আমার বন্ধুতার সূত্রপাত যৌবনে। কিন্তু অজয়ের সে বাল্যবন্ধু, তারা ছিল সহপাঠী। ভারতীয় সংগীত ও সিনেমাকে শচীন যা দিয়ে গেছে, তার পরিমাপ করা কঠিন। বিশেষত বোম্বাই-কেন্দ্রিক হিন্দী চিত্রজগৎকে শচীন যে কী পরিমাণে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে গেছে তা বলার নয়। বোম্বাই ছেড়ে রাই চলে এসেছিল, আমি ডাক পেয়েও যাইনি, কিন্তু শচীন সেখানে গেছে, স্থায়ীভাবে থেকে গেছে এবং বাংলা ও ভারতীয়, তথা বিশ্বের লোকগীতির ভাণ্ডার থেকে সুর আহরণ করে এবং ভারতীয় মার্গসংগীতকে আপন সুররুচির জারক-রসে জারিত করে নিয়ে সে হিন্দী সিনেমা-সংগীতকে অমূল্য সম্পদে সমৃদ্ধ করেছে।

হিন্দী উর্দু ফিলমের এই সার্থক সংগীত পরিচালকের প্রথম জীবনের একটি কৌতুকপ্রদ কাহিনী মনে পড়ছে আজ।

১৯৩৩ সালে নিউ থিয়েটার্স সে-যুগের বিখ্যাত উর্দু ছায়াচিত্র "য়াহুদী-কী-লড়কী' তুলেছিল। কাহিনীর লেখক ছিলেন আগা হসার কাশ্মীরী। পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সংগীত পরিচালক আমি। এই ছবি নির্মাণকালে

তিনখানি গান আমি বন্ধুবরকে এক ফকিরের চরিত্রে নামিয়ে গাইয়েছিলাম। কিন্তু বন্ধুবর ছিলেন পূর্ববঙ্গের মানুষ, ত্রিপুরা রাজপরিবারের তনয়। তাঁর উচ্চারণে তখন পূর্ববঙ্গীয় প্রভাব রীতিমতো আধিপত্য করছে। সুতরাং তাঁর উর্দু-উচ্চারণ চিত্র-কাহিনীকার পছন্দ করলেন না। অতএব তাঁর গানগুলি শেষপর্যন্ত পরিত্যক্ত হলো।

(প্রসঙ্গত বলি, এ-ছবিতে অবশেষে ফকিরের চরিত্রে নামিয়ে গান গাওয়ানো হয়েছিল পাহাড়ী সান্যালকে দিয়ে—যে পাহাড়ী সান্যাল ছিলেন লখ্নৌ-এর ছেলে, হিন্দী-উর্দু উচ্চারণে নিখুঁত এবং সঙ্গীতেও পারদর্শী)।

আজ ভাবতে কৌতুক লাগে যে, যে-শচীন পরবর্তী জীবনে হিন্দী চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার হিসাবে আপন প্রতিভায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিল, সেই শচীনের গান এককালে হিন্দী-উর্দু উচ্চারণে ত্রুটির কারণে গৃহীত হয়নি! শুনেছি, কোনো এক শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ নাকি তাঁর ছাত্রজীবনে অংকে কাঁচা বলে ভর্ৎসিত হতেন।

শচীনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধের স্মৃতি পুরোপুরি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কত কথা বলব? যতদিন সে কলকাতার মানুষ ছিল, ততদিন, তখনকার সমস্ত সঙ্গীত অনুষ্ঠানে আমরা দুজনেই আমন্ত্রিত হতাম। আজ সে ছুটি নিয়েছে, আর আমি সেই নানা রঙের দিনগুলির স্মৃতির কুসুম একলা বসে চয়ন করছি।···

আমার স্মৃতিচারণের সব কথাই একটি কথার মূল সূত্রে বাঁধা পড়ে আছে, তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান। এ আমার দোষই হোক বা গুণই হোক এই আমার জীবনের ধ্রুবপদ। যে-বনস্পতির ছায়ায় আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঘোরাফেরা করেছি, সেখানে ক্ষুদ্রাকৃতি পাদপ ও তৃণগুল্মও তো কম ছিল না। তবু, যদি বাংলা কাব্যগীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে 'thou art free' বলে বাদ দিয়ে ভাবি, তাহলেও প্রতিভাবান গীতিকার সে যুগে বিরল ছিলেন না। বন্ধুবর পরলোকগত বাণীকুমার যে গীতিকার হিসাবে ও অন্যান্য নানাবিধ ক্ষেত্রে কত গুণে অলংকৃত ছিলেন তা আগেই বলেছি। সৌরীন্দ্রমোহনের কথাও বলেছি। অন্যান্য যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি তাঁদের কথাও ইতিপূর্বেই স্মরণ করেছি। এঁদের সকলের মধ্যে আজ বিশেষভাবে মনে পড়ছে অকালপ্রয়াত কবি-বন্ধু অজয় ভট্টাচার্যের কথা। সঙ্গীত-জীবনের সহযাত্রী শচীন দেববর্মণের প্রসঙ্গে অজয়ের

উল্লেখ করেছি। আমার মনে হয়, নানা কারণেই অজয়ের বিষয়ে আমার আরো দু'একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে।

অজয়ের কয়েকটি গানের একটি লং প্লেয়িং রেকর্ডের কভারের জন্য গ্রামোফোন কোম্পানীর অনুরোধে অজয় সম্পর্কে দু'চারটি কথা কিছুদিন আগে লিখে দিয়েছিলাম। যা লিখেছিলাম তারই সারাংশটুকু এখানে পুনরুদ্ধার করি।

নিউ থিয়েটার্সের অঙ্গনেই বন্ধুবরের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সূচনা ঘটে। অল্পকালের মধ্যেই এই বন্ধুত্ব প্রগাঢ় সৌহার্দ্যে পরিণত হয় এবং আমাদের পারস্পরিক সম্বোধন 'আপনি' থেকে 'তুমি' তে চলে আসে। বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন দৃশ্যের আত্তপ্রয়োজনীয় অংশে, বিভিন্ন চরিত্রে, বিচিত্র রসাশ্রয়ী সঙ্গত ও সুরুচিপূর্ণ অনবদ্য গীতিরচনায় অজয় ছিল সিদ্ধহস্ত। তার গীতরচনায় আমার আকাঙ্ক্ষিত সুরারোপ আমাদের মৈত্রীবন্ধনকে সুদৃঢ় করেছিল। কিন্তু হায়, তার প্রৌঢ়ত্বের সূচনাতেই মহাকাল তাকে ছিনিয়ে নিলেন, সৌহার্দ্যের স্মৃতিটুকু নিয়ে আমি রয়ে গেলাম এতকাল পরে তার কথা বলব বলে।

তার গীতরচনা ছিল রূপে রূপে অপরূপ। আনন্দ, অনুরাগ, প্রেম, সোহাগ, প্রীতি, স্মৃতি, ভক্তি, দেশপ্রেম প্রভৃতি যে সমস্তভাব মানব-মানবীর অন্তরের ভাবসমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গ রচনা করে, সে সব ভাবেরই সার্থক সাধক ছিল অজয়।

বৈষ্ণব মহাজনদের এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চরণকমলে প্রণতি জানিয়ে আমার বার বার বলতে ইচ্ছা হয় যে রসতত্ত্বের যুক্তিপূর্ণ বিচারে অজয়ের গীতি-কবিতায় উৎপ্রেক্ষালঙ্কারের যে যথার্থ সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে তা অন্যত্র বাস্তবিকই বিরল। চণ্ডীদাস লিখেছেন—'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু, ঐখানে থাক / মুকুর লইয়া চাঁদমুখখানি দেখো'। 'নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে, কালোর উপরে কালো/প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ হেরিনু, দিন যাবে মোর ভালো।'

বিশ্বকবি লিখেছেন—"কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারি ঘায়ে,
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।"

অজয় লিখেছে— 'শেষ হলো তোর অভিযান / হীরা ফলে সোনার গাছে, হরিৎসাগর ভুলায় প্রাণ।' কিংবা—'লোহার লাঙ্গল পরশপাথর ধুলায় সোনা গড়ে।"

এমন যে অজয়, একে ভুলে যাওয়া বাঙালী সংস্কৃতির পক্ষে অগৌরবের লক্ষণ।

তথাপি আনন্দ হয় যখন জীবনসায়াহ্নে দেখি এ-দেশের গ্রামোফোন কোম্পানী তার স্মৃতিকে পুনরুদ্ধার করছেন নতুন করে তার গীত-সম্ভারকে সুকণ্ঠে ডিস্ক্রেকর্ডের মাধ্যমে পরিবেশিত করিয়ে। আনন্দের সঙ্গে তাই উচ্চারণ করতে ইচ্ছা হয়—'আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্‌বিভাতি।' কবিগুরুর ভাষায় সরব হতে বাসনা হয় এই বলে—

"তাহার আনন্দ দিকে দিকে দেশে দেশে,
প্রকাশ পেতেছে কত রূপে কত বেশে।"

* * *

আমার পরমপ্রীতিভাজন, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ বিমলভূষণের নাম আমি আগেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছি! কিন্তু শুধু উল্লেখেই তাঁর প্রতি আমার কর্তব্য সম্পন্ন হবে না। তাঁর নানা গুণালঙ্কারের কথা আর একটু না বললে আমার কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে।

বাংলা কাব্যসঙ্গীতে বিমলভূষণ নতুনকরে পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। রবীন্দ্রনাথের গানের তিনি প্রবীণ সেবক, নজরুল ও অন্যান্য নানান্ বাংলা গীতিতেও তাঁর বিশেষ অধিকার।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমার অনুজপ্রতিম, দীর্ঘকালের বন্ধু। বেতারের একজন বিশিষ্ট কর্মী ও সঙ্গীত-শিল্পী হিসাবে তিনি সুর-রচনা, স্বরলিপি-নির্মাণ এবং সংগীত পরিচালনার ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আজ বিশেষ করে মনে পড়ে উপনিষদের শ্লোকাবলী থেকে যখন সঙ্গীতানুষ্ঠান করেছি, তখন তিনি কী অকৃপণভাবেই না আমাকে সাহায্য করেছেন! তাঁর একনিষ্ঠ প্রীতি ও নিঃস্বার্থ অনুরক্তি আমাকে চিরদিন মুগ্ধ করেছে!

* * *

স্বরলিপি-রচনার কথায় একজন অকালপ্রয়াত বিশিষ্ট বন্ধুর কথা আজ আপনিই মনে পড়ে গেল। সাঙ্গীতিক প্রতিভার এক বিপুল প্রতিশ্রুতি নিয়ে তিনি এসেছিলেন। আধুনিক বাংলা গানের সুরকার হিসাবে অভিনবত্বের জন্য তিনি আমাদের সবার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছেন। তিনি ছিলেন

অজয়ের (অজয় ভট্টাচার্য) ঘনিষ্ঠ বন্ধু—আমাদের সমবয়সীই ছিলেন তিনি। তাঁর নাম হিমাংশু দত্ত। সংগীতরসিক বাঙালীর কাছে একটি প্রিয় নাম।

১৯২৩-২৪ সালের কথা। বয়স তখন বড় জোর উনিশ। গান গাই, সুর লাগাই, হারমোনিয়মেও তুখোড়, কিন্তু স্বরলিপি রচনার কাজ ঠিকমতো করে উঠতে পারি না তখনো, এলোমেলো হয়ে যায়। ঠিক কী উপলক্ষে হিমাংশুর সংগে তখন যোগাযোগ হলো মনে নেই। তিনি তখন থাকতেন বিবেকানন্দ রোড় কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের জংশনে গুরুদাস চাটুয্যের দোকানের বিপরীতে এক গলির মধ্যে মেস-বাড়িতে। সেইখানে একদিনে তাঁর তক্তপোষে বসে মাত্র দশ/পনের মিনিটের মধ্যে স্বরলিপি নির্মাণের পদ্ধতি এত সুন্দর করে প্রাঞ্জল-ভাবে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কী বলব। সেই বয়সে বিষয়টাকে আমার খুবই কঠিন মনে হত। কিন্তু যে কোন গানকে গলায় গেয়ে আস্তে আস্তে তার পর্ব-বিভাগ ঠিক করে নিয়ে কেমন করে অতি সহজে তার স্বরলিপিটি লিখে ফেলা যায় তার কৌশল হিমাংশু আমায় অনায়াসে ওই অল্প সময়েই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আজ আনন্দের সংগে এই কথা স্মরণ করি যে এই স্বল্পায়ু সংগীত-প্রতিভা কেবল আমার তরুণ দিনে বন্ধুই ছিলেন না, একটি বিষয়ে আমার শিক্ষকও হয়েছিলেন।

* * *

সুরসাধনায় যিনি সিদ্ধ হয়েছিলেন সেই ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কথাও আজ আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি। বয়সে আমার চাইতে একটু ছোট হলেও কর্মক্ষেত্রে সমসাময়িক ছিলেন তিনি। শাস্ত্রীয় সংগীতজগতের মানুষ তিনি ছিলেন, আমি তা নই। তবে চলচ্চিত্র-সঙ্গীতে তিনি সংশ্লিষ্ট হবার ফলে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। মনে পড়ে, অনেক দিন আমরা টালীগঞ্জ থেকে একই ট্রামে ফিরেছি পাশাপাশি বসে, গল্প করতে করতে, সুরারোপের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে করতে। আমরা একই পথের পথিক ছিলাম, কাছাকাছি পাড়ার বাসিন্দা—উনি চোরবাগানের, আমি চালতাবাগানের। ভীষ্মদেব আমার কনিষ্ঠ, কিন্তু আমি তাঁকে সমস্ত অন্তর দিয়ে অগ্রজের সম্মান দিই। তাঁর কণ্ঠ-সাধনা অনেক উচ্চস্তরের, তা ছিল দেবতার আশীর্বাদপুত। তাঁর তুল্য কণ্ঠ-সম্পদ্ আমার সুদীর্ঘ জীবনে অন্য কারুর মধ্যে দেখেছি বলে মনে হয়না।

স্বরসপ্তকে প্রত্যেক কণ্ঠশিল্পীর একটা নিজস্ব রেঞ্জ বা বিস্তার থাকে। আমার একটা ছিল। তাঁরও একটা ছিল। সেই রেঞ্জ-এর ব্যাপকতা হয়তো তাঁর চাইতে আমার কম ছিল না। কিন্তু তাঁর রেঞ্জ-এর সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠ-চালনায় যে অনায়াস সাবলীলতা ছিল তা শুধু আমার কেন, আমার জানা যে-কোন কণ্ঠশিল্পীর আয়ত্তের অতীত! বুকের ভিতরের কার্ডিওগ্রাফ্ যেমন করে নেওয়া হয়, কণ্ঠের ওঠা-নামার কোনো গ্রাফ নেবার তেমন উপায় যদি থাকত তাহলে দেখা যেত ভীষ্মদেবের কণ্ঠের গ্রাফ্ আগাগোড়াই যৎসামান্য উঁচুনীচু রেখায় অর্থাৎ প্রায় সরলরেখায়, চলাচল করছে। তাঁর রেঞ্জ-এর মধ্যে কণ্ঠ যত চড়াতেই থাক্ কোথাও কোনো বিকার নেই। তুলনা করলে দেখা যাবে তাঁর তুলনায় আমাদের নিজ নিজ রেঞ্জ-এর গ্রাফ্-এ উত্থান-পতন কত বেশি!

এইখানেই ভীষ্মদেব অ-সাধারণ। শচীন ভীষ্মদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও তাঁকে গুরু মেনেছিল। শাস্ত্রীয় সংগীতে ও কণ্ঠনৈপুণ্যে ভীষ্মদেব আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন সংগীতগুরু। তাঁর তুলনা আমি কোথাও পাইনি।

* * *

একজন গুণী মানুষের প্রসঙ্গ থেকে অপর একজনের কথা আপনি এসে যায়। সেযুগের প্রখ্যাত পল্লীগীতি বিশারদ্ আব্বাসউদ্দীন আহমদ মহাশয়ের কথা একবার স্মরণ করা কর্তব্য মনে করি। শিল্পী যতই প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন হোন না কেন প্রতিষ্ঠালাভের পথ বড়ই কঠিন। নিজের জীবনে তা দেখেছি। প্রথম জীবনে কোন অনুষ্ঠানে গাইতে গেলে সেখানে কেষ্টদার (কৃষ্ণচন্দ্র দে) উপস্থিতি আমাকে বা অন্যান্য অনেককেই সংকুচিত করে দিত। আমার একটু পরবর্তী যুগের (প্রায় সমসাময়িক) শিল্পী আব্বাসউদ্দীন তাঁর স্মৃতিকথায় এক জায়গায় লিখেছেন যে তাঁর প্রথম জীবনে কলকাতার কোন এক সংগীতানুষ্ঠানে এসে তিনি যখন দেখলেন গায়কদের মধ্যে আমি এবং অন্যান্য কেউ কেউ উপস্থিত রয়েছি, তখন তিনি নার্ভাস বোধ করেছিলেন।

পরবর্তী কালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পল্লীগীতি-শিল্পীর লেখা এই কথা পড়ে কৌতুক অনুভব করেছিলাম। সংগীত-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সংস্পর্শে এসে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। বাংলা লোকগীতির জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ছিলেন তিনি। দেশবিভাগের কিছু পরে তিনি যখন অন্য দিকে চলে যান তখন মর্মান্তিক কষ্ট পেয়েছিলাম।

৩১

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল কাব্যসৃষ্টিতে কোন্ কোন্ উৎস থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন, তা নিয়ে বিদগ্ধ সমালোচকদের বিভিন্ন মতামত আছে। কিন্তু যতদূর মনে হয়, একটা বিষয়ে সবলে একমত যে উপনিষদ-সাহিত্যের মহান্ আদর্শ, আউল-বাউল-সুফী মরমিয়াদের উদার জীবনদৃষ্টি এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যের সুমধুর প্রেম-নিষিক্ত রসধারা অবশ্যই কবির সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণাদায়িনী শক্তিগুলির মধ্যে ছিল।

আমার একবার বাসনা হয়েছিল বৈষ্ণব-সাহিত্যের শ্রীশ্রীপদ-কল্পতরুর ধাঁচে রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে ভাবরসের দিক থেকে সাযুজ্য রেখে, একটি সুপরিকল্পিত, শ্রেণীবদ্ধ রচনা করি, যার নাম হবে 'শ্রীরবীন্দ্রপদকল্পতরু'। এখানে স্মরণ করি, একদা পূজ্যপাদ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সর্বপ্রথম এ-বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। একবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি অনুষ্ঠানে আমি কয়েকখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছিলাম। তখন সুনীতিকুমার এক একটি গান শুনে তন্ময় হয়ে তারিফ করতে থাকেন এবং বিশেষ বিশেষ বৈষ্ণবপদের সঙ্গে আমার সেদিনের গাওয়া গানগুলির ভাব-মাধুর্যের তুলনা করতে থাকেন। তাঁর এই রসগ্রহণভঙ্গি ও তুলনাত্মক মন্তব্য আমরা মধ্যে এই বাসনাকে উদ্রিক্ত করে। এরপর এ-বিষয়ে আমি সাধ্যমতো পরিশ্রম করে যে তুলনাত্মক রচনাটি করেছিলেন, তা অকপটেই বলি, আমার বড় প্রিয় বস্তু। জন্মসূত্রে আমি বৈষ্ণব ভক্তি ও বিনয়-রসের অবহাওয়ায় পুষ্ট। তদুপরি, রবীন্দ্রনাথের দাসত্ব গ্রহণ করেছি সেদিন থেকে যেদিন কৈশোর অতিক্রম করে তাঁর কবিতা ও গানকে কিঞ্চিন্মাত্র বোঝার ক্ষমতা অর্জন করেছি। তাই পদকল্পতরুর বিভিন্ন বিভাগানুসারে বৈষ্ণব মহাজনদের যে পদগুলি আছে, সেগুলির সঙ্গে ভাবসঙ্গতি রেখে বিশ্বকবির তুলনীয় গানগুলির শ্রেণীবিভাগ করে আমি বৈষ্ণব পদাবলী ও রবীন্দ্রনাথের গান, এই দুই এরই কথঞ্চিৎ সেবা করার তৃপ্তি লাভ করেছি। আমার সেই পরিশ্রম অসম্পূর্ণ থেকে গেছে এই অর্থে যে তা পাঠক ও রসপিপাসু সমাজের

সামনে অপ্রকাশিতই রয়েছে এবং তা একটা পূর্ণাঙ্গ সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠান হিসাবে পরিবেশিত হবার সুযোগ পায় নি।

এখন এই সুযোগে আমার সেই কর্মের সামান্য কিছু পরিচয় পাঠকের সামনে প্রকাশ করার আনন্দলাভ করতে চাই।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে বিপ্রলম্ভ বিভাগে পূর্বরাগের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন-শ্রবণাদিজা।

তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে।। (উজ্জ্বল নীলমণি)

[যে রতি মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণাদির দ্বারা উৎপন্ন হইয়া নায়ক-নায়িকা উভয়ের হৃদয়কে উন্মীলিত করে, তাহারই নাম পূর্বরাগ।]।

পূর্বরাগের বিভিন্ন পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব পদগুলি ও তুলনীয় রবীন্দ্র-গীতরচনাগুলিকে নীচে সাজিয়ে দিচ্ছি—

মুরলীধ্বনি শ্রবণ ও রূপানুরাগ—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার··· —চণ্ডীদাস।

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে··· —যদুনন্দন।

বিপিনে গোবিন্দ বাঁশি পুরে ·· —কৃষ্ণদাস।

ঐ বাজে গো ঐ বাজে——গোবিন্দদাস।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশি শুনেছি।

ওগো শোনো কে বাজায়।

মরিলো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।

সখি, ঐ বুঝি বাঁশি বাজে।

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।

সখীমুখে শ্রবণেচ্ছা বা শ্রবণ—

দেখে এলাম তারে সখী——জ্ঞানদাস

অতি শীতল মলয়ানিল——শশিশেখর।

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম——যদুনন্দন।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

বল সখি বল তার নাম।

সাক্ষাৎ দর্শন—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায় ——গোবিন্দদাস।

কী রূপ হেরিনু মধুর মূরতি——দ্বিজ ভীম।

কী মোহিনী জান বন্ধু——চণ্ডীদাস।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।

কী রাগিনী বাজালে হৃদয়ে মোহন।

চিত্রপটে দর্শন—

এমন মূরতি কেমন করি——রাধামোহন দাস।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ —

ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে/বহু পূর্বস্মৃতিসম হেরি ওকে।

বিপ্রলম্ভ (মান) বিভাগ —

শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

স্নেহস্তুৎকৃষ্টতা ব্যাপ্তা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।

যো ধারয়ত্য পাক্ষিণ্যং স মান কীর্ত্যতে॥ (উজ্জ্বলনীলমণি)

পরস্পর অনুরক্ত ও একত্রে অবস্থিত নায়িক-নায়িকার দর্শন আলিঙ্গনাদি নবোধক মান। পৃথক অবস্থানেও মান সম্ভব হয়। যেখানে প্রণয়, সেখানে মান।]

বিভিন্ন পর্যায়—

অভিসার—

গগনে অবঘন মেহ দারুণ——রায়শেখর।

চাঁদ বদনী ধনী চলু অভিসার—অনন্তদাস।

অম্বরে ডম্বরু ভরা নব মেহ—গোবিন্দদাস।

কি বলিব আর বঁধু, কি বলিব আর—যদুনাথ দাস।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারি ঘায়ে।

শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা।

বাসকসজ্জা—

সাজল কুসুম সেজ পুন সাজই—গোবিন্দদাস।

সুন্দরী ঝট করহ মনোহর বেশ— ঐ ।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

সজনী সজনী রাধিকা লো।

প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে।

উৎকণ্ঠিতা—

দিবস রজনী গনি গনি—চণ্ডীদাস।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।

বিপ্রলব্ধা—

বঁধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙায়িব সই—নরোত্তম দাস।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে।

কলহান্তরিতা—

সো হেন রসিক নাগরের সনে—গোবিন্দদাস।

গোরায় জাগাই শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

সখী আমারি দুয়ারে কেন আসিল।

বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না।

প্রোষিত-ভর্তৃকা—

অবিরল বাদর বরিখত ঝর ঝর—জগদানন্দ।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে।

স্বাধীনভর্তৃকা—

ললিতা উল্লাস প্রাণী—গোবিন্দদাস।

তুলনীয় রবীন্দ্র-পদ—

তোমার সাজাব যতনে কুসুম রতনে।

বিপ্রলম্ভ (প্রেমবৈচিত্র্য) বিভাগ—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥ (উজ্জ্বল নীলমণি)

[প্রেমের নিকটে রহে প্রেমের স্বভাবে/প্রেমবৈচিত্র্যহেতু বিরহ করি ভাবে।]

বিভিন্ন পর্যায়—

আক্ষেপ—

রাজার ঝিয়ারি কলের বৌহারী—বলরামদাস।

তুলনীয় রবীন্দ্র-পদ—

সখিরে পীরিত বুঝবে কে।

ক্ষুব্ধা—

চরণনখরমণিরঞ্জন ছাঁদ—বিদ্যাপতি।

তুলনীয় রবীন্দ্র-পদ—

কাছে যবে ছিল পাশে হলো না যাওয়া।

খেদযুক্তা—

পরান বন্ধুকে স্বপনে দেখিলু—চণ্ডীদাস।

তুলনীয় রবীন্দ্র পদ—

সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি।

বিপ্রলম্ভ (প্রবাস) বিভাগ—

পূর্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরা দিভিঃ।
ব্যবধানস্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ প্রবাস ইতির্যতে ॥ (উজ্জ্বল নীলমণি)

[পূর্বসম্মিলিত নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে দেশ-গ্রাম-বনাদি স্থানান্তরে ব্যবধান, পণ্ডিতগণ তাহাকেই প্রবাস বলেন।]

বিভিন্ন পর্যায়—

সুদূর প্রবাস—

বল নারে সখী কহ নারে সখী—বিদ্যাপতি।
হরি গেও মধুপুরে……
ফুটল কুসুম সকল বন অন্ত… —(গোবিন্দ দাস)
নিবান্ধব হইল পুরী রাখিতে নারিলাম হরি—(গোবিন্দ দাস)
এই না মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া—

তুলনীয় রবীন্দ্র-পদ—

শুনলো শুনলো বালিকা রাখ কুসুম মালিকা।

বসন্ত আওল রে।

শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর।

সখি লো, নিকরুণ মাধব।

নির্বন্ধা—

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব—বিদ্যাপতি।

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল—

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

ওগো এত প্রেম-আশা প্রাণের পিয়াসা।

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে।

সম্ভোগ বিভাগ—

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।

যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্ষ্যতে॥

[দর্শন ও আলিঙ্গনাদির অনুকূল্য হেতু নায়ক নায়িকার যে ভাবোল্লাস তাহারই নাম সম্ভোগ।]

বিভিন্ন পর্যায়—

রূপানুরাগ—

রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর · —জ্ঞানদাস।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি··· ।

কুঞ্জবিলাস—

ব্রজনারীগণ হেরি হরষিত মন···—জ্ঞানদাস।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

ওগো কিশোর আজি তোমারি দ্বারে পরাণ মম জাগে।

কুঞ্জভঙ্গ—

নিজ নিজ মন্দিরে যাইতে পুন পুন—মাধব ঘোষ।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে।

অভিসারান্তে—

এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনী—জ্ঞানদাস।

কৈছনে তেজলি গেহ—গোবিন্দদাস।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

সতিমির রজনী সচকিত সজনী।

বাদর বরখন নীরদ গরজন।

ওহে জীবনবল্লভ।

জলক্রীড়া—

নাহি উঠল দোঁহে কুন্তক তীর—গোবিন্দদাস।

ডুবিল ডুবিল ছলনা করি—মাধবদাস।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে।

ভাবসম্মেলন—

বঁধু কি আর বলিব আমি—চণ্ডীদাস।

তোমার গরবে গরবিনি হম——জ্ঞানদাস।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

এসো এসো ফিরে এসো।

আমার মন মানে না।

ভাবোল্লাস—

এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বোস—— চণ্ডীদাস।

শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে—— ,, ।

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ——বিদ্যাপতি।

তুলনীয় রবীন্দ্রপদ—

আমারে কর তোমার বীণা।

আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে।

আমার সকল রসের ধারা।

আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ।

শ্রীরবীন্দ্রপদকল্পতরু বিষয়ে আমি আপাতত এইখানেই থামছি, অধিক বিস্তারে বর্তমান গ্রন্থের পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা। আমার মনে হয়,

বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলীর সঙ্গে তুলনাত্মকভাবে রবীন্দ্রনাথের গানের এরূপ একটি গ্রন্থনাকে ব্যাপক আকার দেওয়া যেতে পারে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সুমিষ্ট সমন্বয়কে পরিবেশন করা যেতে পারে। বয়সের ভার আজ আমার নিজস্ব উদ্যোগের পথে বাধা। রবীন্দ্রানুরাগী ও বৈষ্ণব পদাবলী-রস-পিপাসু কোনো অনুজ শিল্পী বা শিল্পীগোষ্ঠী এ-বিষয়ে যদি ভবিষ্যতে কোনো পরিকল্পনা করেন তাহলে আমার এই ভাবনাকে সার্থক জ্ঞান করব।

* * *

সংস্কৃত শ্লোকাবলী এবং রবীন্দ্রনাথের গানকে সংস্কৃতে অনুবাদ করে, সুরারোপ করে গাওয়ার ব্যাপারে বাণীকুমার ও আমি চিরদিনই বিশেষ উৎসাহী ছিলাম। এ ব্যাপারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিমলভূষণও আমাদের উদ্যোগী সহকর্মী ছিলেন।

বাণীকুমার কর্তৃক সংকলিত ও মৎকর্তৃক সুরারোপিত এবং আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিভিন্ন সংস্কৃত সঙ্গীতের কয়েকটি উল্লেখ করতে প্রলুব্ধ হচ্ছি। যেমন—

অভিপ্রিয়ানি পবতে চনোহিতো—(সামবেদ)।
পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে—(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা)।
সোমং রাজানং—(তৈত্তীরিয় উপনিষদ্)।
অগ্নিমীলে পুরোহিতং——(বেদগান)।

মম মূর্ধানমানময় তব (আমার মাথা নত করে দাও)।
ত্বং কথঙ্কারং গায়সি (তুমি কেমন করে গান কর)
বিপদো মাং গোপায়তু (বিপদে মোরে রক্ষা কর)।
অন্তরং মে বিকাশয়তু (অন্তর মম বিকশিত কর)।
অয়ি ভুবনমনোমোহিনি।

এগুলির মধ্য থেকে একটি গান সম্পূর্ণ উৎকলন করছি—

(আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে)